মনোবিদের ডায়েরি

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিভাস
কলকাতা

প্রকাশ : ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য্য

প্রতিভাস-এর পক্ষে ধীরেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা—৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, মধুমঙ্গল পাঁজা কর্তৃক নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস ১৩, মার্কাস লেন, কলকাতা—৭ থেকে মুদ্রিত।

উর্মি গঙ্গোপাধ্যায়
কল্যাণীয়াসু

□ সূচীপত্র □

ভূমিকা

মন কথাটি আমরা নানা অর্থে নানাভাবে ব্যবহার করি। 'ভুলো না মনে রেখো', 'মন দিয়ে পড়লে ঠিক পাশ করবে', 'মনটা আজ ভাল নেই', 'যদি কিছু মনে না করেন', 'চিতার আগুন নিভবে বটে কিন্তু মনের আগুন নিভবে না',—মনের আলাদা অর্থ, আলাদা তাৎপর্যের নমুনা। কমলাকান্তের মন চুরির কাহিনীতে মন আবার কিছুটা স্বতন্ত্র অর্থবহ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পিত ভক্তের মন আর কাঙ্ক্ষিতের করকমলে অর্পিত প্রেমিকার 'মন' কি এক? মন কি? এই প্রশ্নের অন্তত আঠারো রকমের উত্তর পাবেন। মনের অবস্থান কোথায়? যাত্রা থিয়েটারে অভিনেতারা ডান হাতটা বাঁদিকের বুকে ঠেকিয়ে মনের অবস্থান নির্দেশ করেন। তা থেকে অনেকের ধারণা মনের অবস্থান বুকের খাঁচার মধ্যে কোনো এক জায়গায়—হয়ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। মস্তিষ্কে অবস্থিত একটা ছোট গ্রন্থিকে (পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড) এক সময় মনের আধার ভাবা হত। আজকাল মনস্তাত্ত্বিকদের একদলের মতে মস্তিষ্কই মনের বস্তুগত অধঃস্তর, আবার একদল বলেন—মনের অবস্থান নির্ণয় নিরর্থক, তার প্রকোষ্ঠভিত্তিক সংগঠন জানলেই মানসিকতার ব্যাখ্যা করা যায়। এইসব তত্ত্বগত কচকচির মধ্যে না গিয়ে আমরা মনের, বিশেষ করে অস্বাভাবিক মনের কিছু কিছু কার্যকলাপের বিবরণের ভিতর দিয়ে মনের বৈচিত্র্য ও রহস্য বোঝার চেষ্টা করব; বলে রাখা উচিত—বিবরণগুলো কল্পকাহিনী নয়, বাস্তব জীবনের ঘটনা। ঘটনার পাত্রপাত্রীরা অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছিলেন। কাহিনীগুলো 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তত্ত্ব-পিপাসুদের জন্য নয়, গল্প-পিপাসুদের জন্য। তাই সাধ্যমত অলঙ্করণের চেষ্টা এবং এমনভাবে লেখা যাতে কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় গোপন থাকে, তাঁদের একান্ত আপনজনও যাতে চিনতে না পারেন।

কিছু কাহিনী প্রধানত দাম্পত্যজীবনের প্রেমভালবাসা সংক্রান্ত। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির দরুন অনেক সময় এক পক্ষের মনের অসুখ দেখা দিতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আজকের পৃথিবীতে প্রেম ভালবাসার মত সদর্থক প্রক্ষোভ ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। ঘৃণা-বিদ্বেষ হিংসার মত নঙর্থক প্রক্ষোভের প্রসার ও তীব্রতা বাড়ছে। প্রেম আর ভূতপ্রেত সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়, অনেক কিছু লেখা হয় বটে, কিন্তু খাঁটি প্রেম ভূতের মতই দুর্লভ। কথাগুলো বলেছেন একজন প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক। এঁদের মতে পুরো পুরি সায় না দিয়েও বলা চলে, প্রক্ষোভসমস্যা নিশ্চয়ই এক গুরুতর সমস্যা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রক্ষোভ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যৎসামান্য। সদর্থক, নঙর্থক—দুই জাতীয় প্রক্ষোভ সম্পর্কে ঐ একই কথা। প্রেম শ্রেষ্ঠ সদর্থক প্রক্ষোভ। জৈব প্রয়োজন মেটাবার পরই ব্যক্তিমাত্রেই চায় নিরাপত্তা ও ভালবাসা। এই ভালবাসা সম্পর্কে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব কমই হয়েছে। প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? 'প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে'—বাইবেলের-এই অনুশাসন কিভাবে কার্যকর করা যায়? তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, তার সঙ্গে ভাববিনিময় করে? তার অভাব অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করে? অভাব দূর করার মত সঙ্গতি আমার যদি না থাকে, তবে কিভাবে তাকে বোঝাবো যে আমি তাকে ভালবাসি। অভাব অভিযোগ মিটিয়েও কি বিদ্যাসাগর মশাই বোঝাতে পেরেছিলেন যে তিনি প্রতিবেশীদের ভালবাসেন? অনেক স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি যে তাঁদের মনেও এই ধরনের চিন্তা: কি করে বোঝাবো যে আমি তাকে ভালবাসি। স্বামীরা ভাবেন নিয়মিত শাড়ী গয়না দেওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর মনের নাগাল পাচ্ছেন না; আর স্ত্রীরা মনে করেন, সব ব্যাপারে স্বামীর মতে মত দিয়ে, মন জুগিয়ে চলেও স্বামীর ভালবাসা পাচ্ছেন না। সন্তান ও মাতাপিতার ভালবাসার ব্যাপারেও ঐ একই সমস্যা। অনেক বাপ-মা ছেলেমেয়েদের জন্যে সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের সবরকম ব্যবস্থা করেও তাদের বোঝাতে পারেন না যে তাঁরা তাদের ভালবাসেন। তারা ভালবাসার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে এবং অনেক সময় এর ফলে তাদের বিদ্বিষ্ট মন ক্রমশ খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে। গরীবের ঘরের শিশু জামাকাপড় খাবারদাবার খেলনা দরকারমত পায় না বলে ভাবতে পারে বাবা মা ভালবাসে না। কিন্তু যে শিশু চাওয়ার আগেই সব কিছু হাতের কাছে পায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কিছু পায়—সে কেন মনে করে বাবামা ভালবাসে না? এই 'কেন'র উত্তরে আপাতত একটা কথা বলে রাখি। ভালবাসা ও আনুষঙ্গিক সবরকমের প্রক্ষোভ সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ করেছি প্রধানত ধর্মীয় অনুশাসন, গল্প উপন্যাস. লোকগীতি ও রূপকথা থেকে। আজকাল অবশ্য সিনেমা, রেডিও, সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন আমাদের প্রধান শিক্ষক। বলা বাহুল্য, এদের কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য শিক্ষার উৎস নয়। প্রক্ষোভ সম্পর্কে মামুলি ধারনা পরিবেশন করে আজকের এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার যুগে, এই দ্রুত-পরিবর্তনশীল সমাজে দাম্পত্য-সমস্যা মিটবে না, শিশুদের সুস্থ ও শান্ত রাখা যাবে না, প্রক্ষোভ সমস্যার সমাধান হবে না। প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে যা বললাম, অন্যান্য প্রক্ষোভ সম্পর্কেও অনায়াসে তাই বলা চলে। মনের রোগের চিকিৎসকদের প্রাথমিক কর্তব্য প্রেম-ভালবাসা সম্বন্ধে রোগীদের সঠিক শিক্ষা দেওয়া ও তাদের মনে যুগোপযোগী ধ্যানধারণা গড়ে তোলা।

অসুস্থ দাম্পত্যজীবন, মাতাপিতা ও শিশুদের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস—বলতে গেলে বেশির ভাগ অস্বভাবী মানসিকতা বিস্তারের মূলে রয়েছে সামাজিক অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ববিরোধের ক্রমবৃদ্ধি। ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক বিশৃংখলার ছায়াপাত হবেই। মনের অসুখ সারাতে হলে বা বিস্তার রোধ করতে হলে ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কে, নরনারী সম্পর্ক এবং পিতামাতা ও শিশুর সম্পর্কের বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনা প্রয়োজন।

ঐতিহ্য অনুস্মৃতিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে কালধর্মানুযায়ী সামাজিক সম্পর্কের নতুন বিন্যাস ও নতুন মূল্যবোধকে স্বকৃতি দেওয়ার আশু প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে হবে। যদিও বাস্তবজীবনের এই কাহিনীগুলো মূলত গল্পপিপাসুদের জন্যে লেখা, তবুও আশা করছি পাঠকদের মনে কাহিনীগুলো প্রশ্ন জাগাবে।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মনের রোগ সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ কথা

মনের রোগ নিয়ে জ্ঞানী-গুণীজন যে উঁচুদরের আলোচনা করেছেন এবং করবেন তার জন্য তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাধারণ মানুষের রোগ সম্পর্কে ধারণা কিন্তু কেতাবী তত্ত্বের সঙ্গে অনেক সময়েই মেলে না। আমার কাছে সাধারণ মানুষের ধারণা যেভাবে ধরা পড়েছে, তারই কিছু বিবরণ এখানে দিচ্ছি।

এমন এক সময় ছিল একথা আপনারা সকলেই জানেন-মনের রোগকে শয়তান বা প্রেতাত্মা প্রভাবিত বলে মনে করা হত। তখন তাদের যে চিকিৎসা হত তাও আমাদের সবার জানা। তবুও পুনরুল্লেখ করছি। তাদের পা বেঁধে মাথা নীচুর দিকে করে ঘরের ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হত এবং মাঝে মাঝে তাদের নগ্ন দেহের উপর আঘাত করে প্রেতাত্মা বা শয়তানকে শাস্তি দেওয়া হত। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহৃতি পরেই এই উন্মাদাগারগুলির অধ্যক্ষ, এক চিকিৎসক, প্রথম উন্মাদদের প্রতি অমানবিক আচরণের অবসান ঘটান। সেই থেকে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই 'বাতুলতা' একটি রোগ বলে গণ্য হয়। বিজ্ঞান অনুমোদিত চিকিৎসায় দেহের রোগের মতন মনের রোগেও উপশম ঘটতে পারে এই বিশ্বাস সকলেই পোষণ করতে লাগলেন। তারপর অনেকদিন গেছে। চিকিৎসারও অনেক উন্নতি হয়েছে। আশু উপশমের ব্যবস্থা সবক্ষেত্রে না হোক অনেক ক্ষেত্রে আমাদের করায়ত্ত। কিন্তু জটিল ও গুরুতর মনোরোগ যথা স্কিজোফ্রেনিয়া, ম্যানিকডিপ্রেসিভ্-সাইকোসিস ইত্যাদির পুনরাক্রমণ রোধ করা যাচ্ছে না।

আমার আলোচনা কিন্তু চিকিৎসা-সংক্রান্ত নয়। সাধারণ মানুষ তাঁদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও সংস্কৃতি-অনুযায়ী মনোরোগ সম্পর্কে যে ধারনা এই বিশ শতকের শেষ দশকের কাছে এসেও পোষণ করছেন, তাই নিয়েই দু'চার কথা বলব। কিছুদিন আগে মানবমনে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে মুসলমানদের নমাজ পাঠ সম্পর্কে যিনি পুরোপুরি অনভিজ্ঞ, তিনি কোনও রাস্তা বা কোনও মাঠের একপাশে একখানা গামছার ওপরে এক ব্যক্তির নমাজ পাঠের সময়কার অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করলে নিশ্চয়ই মনে করবেন লোকটি অস্বাভাবিক বা উন্মাদের মত আচরণ করছে। অন্য গ্রহবাসী কেউ যদি দারুণ শীতের ভোরে গঙ্গাসাগরে স্নানরত বৃদ্ধবৃদ্ধাদের দেখেন, তাঁর নিশ্চয়ই মনে হবে এরা অস্বাভাবিক-অবশ্য যদি তাঁর

স্বাভাবিক—অস্বাভাবিক সম্পর্কে ধারণা আমাদের মত হয়। কিছুদিন আগেও আদিবাসীদের দু'একটি সম্প্রদায় মুণ্ডমালা গলায় ধারণ করে গর্ব বোধ করত: সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ছিল শৌর্যসূচক একটি মহৎ কাজ—আমাদের কাছে যা বর্বরতা অথবা উন্মত্ত হিংসাত্মক আচরণের নিদর্শন। এই কম্পিউটারের যুগে শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার রোগীর আত্মীয়রাও অনেক সময় বলেন যে এক বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রিবেলায় চা খাবার পর থেকে ভদ্রলোকের রোগ লক্ষণ দেখা দিয়েছে; চায়ের সঙ্গে তারা কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল, নিশ্চয়. তুকতাক্ মারণউচাটন ইত্যাদি কথাগুলো শুধু যে প্রচলিত তাই নয় অনেকের মধ্যেই এই বিশ্বাসগুলি জাগ্রত এবং মনের রোগের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনেকেই স্বীকার করেন। অবশ্য সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব ধ্যান ধারণা, তাঁদের বিশ্বাস এবং সংস্কারকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সব ডাক্তারই জানেন যে শতকরা পঞ্চাশ-জন রোগী ঝাড়্‌ফুক, কালীবাড়ি, পীর ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদির দ্বারা চিকিৎসিত হয়ে তারপর তাঁদের কাছে আসেন। রোগ ততদিনে প্রায় চিকিৎসার বাইরে চলে যায়।

এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, দেড়শো বছর আগেকার ধারণা এখনও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পুত্রের হাতে যখন অসুখ সারাবার মাদুলী বা তাবিজ দেখতে পাই, আঙুলে হাজার টাকা দামের রত্ন ঝক্‌মক্ করে, তখন বুঝতে পারি মনোরোগের সংজ্ঞা, তত্ত্ব এবং শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোথাও বোধহয় গোলমাল আছে যার জন্য মনোরোগ সম্পর্কিত প্রাচীন ধারনায় এখনও জনসাধারণ আচ্ছন্ন।

কোনও আধুনিক মনোরোগ বিদ্যার বই খুললে দেখতে পাই বিশেষজ্ঞরা মনোরোগের তত্ত্ব এবং কারণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মত পোষণ করেন যা অনেক সময় একেবারে বিপরীত ধর্মী। তরুণ চিকিৎসকরা বিভ্রান্ত বোধ করেন নিশ্চয়ই। রোগের শ্রেণীবিভাগ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে (রোগের কারণ, রোগের উপরে রোগের প্রভাব ইত্যাদি) তাঁদের এই মতভেদ মনোরোগকে অন্য রোগের মত সহজে ও সঠিকভাবে চিহ্নিত করার পরিপন্থী। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ যদি মনোরোগ-বিদ্যার বই-এর পাতা ওলটান, তিনি নিশ্চয়ই চিকিৎসকদের থেকেও বেশী বিভ্রান্ত বোধ করবেন।

মনের সংজ্ঞা এবং মন সম্পর্কে সঠিক ধারণা এখনও মনস্তাত্ত্বিক বা মনোরোগ-বিদ্‌দের মধ্যে গড়ে ওঠেনি—এখানেই গণ্ডগোলের উৎস। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়শতাব্দীর ভাববাদ ও জড়বাদের দ্বন্দ্ব এখনও চলছে। অনেকে মনে করেন ভাববাদীদের প্রভাব বিশেষজ্ঞদের বেশীমাত্রায় অভিভূত করেছে। কাজেই মনকে মস্তিষ্কাশ্রিত মনে না করে তারা ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান অবদমন ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে মন ও মানসিকতার ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেই ব্যাখ্যা আমাদের দেশের জ্ঞানী

গুণীদের মুখে ও লেখায় প্রকাশ পায় এবং এই নিরালম্ব, নিরাশ্রয় মন সম্পর্কিত ধারণা ভারতীয় ঐতিহ্য, আত্মা-পরমাত্মা ইত্যাদির ধারণাকে পরোক্ষভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাই আমাদের দেশে মন ও মনোরোগবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বে ও তথ্যে ভাববাদাশ্রিত ধারণা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। আমাদের দেশ কেন! ফ্রয়েডীয় প্রভাব যুক্তরাষ্ট্র থেকে বর্তমানে বিলীয়মান তবুও কূট এবং জটিল কোন বিশ্লেষণের ব্যাপারে এখনও দেখতে পাই সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের ইগো, সুপার-ইগো এবং ইদের উল্লেখ। প্রসঙ্গত এখানেই বলা উচিত যে, রোগতত্ত্ব নির্ণয় ও তার চিকিৎসায় এখন স্কিনারের পরিমার্জিত ব্যবহারবাদীতত্ত্বটাই প্রচলিত। এই তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে পুরোপুরি জড়বাদী। শুধু আচরণ দিয়ে মানুষের মনোভাব নির্ণয় সম্ভব নয় তাই স্কিনারপন্থীদের অভিধানে মন কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সাধারণ মানুষ দ্বয়বাদী ধারণাপুষ্ট ; দেহ-মন সমান্তরালবাদ আমাদের কাছে খুব সহজেই গ্রহণীয় এবং বোধগম্য। দেহ এবং মন আলাদা কিন্তু পরস্পরকে সমান্তরাল ভাবে প্রভাবিত করে এই প্রচলিত ধারণাকে আরও পরিপুষ্ট করেছেন আধুনিক কালের চিকিৎসকেরা! তাঁরা ট্রাঙ্কুলাইসার, অ্যান্টি ডিপ্রেসণ্ট এবং অন্যান্য মস্তিক প্রভাবকারী ওষুধ ব্যবহার করেছেন আবার ফল না পেলে রোগীকে মনের চিকিৎসার জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের কাছে পাঠাচ্ছেন। এই চিকিৎসা কিছুদিন আগেও পুরোপুরি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে আমাদের এখানে প্রচলিত ছিল।

আমরা জড়বাদী বা ভাববাদী এই দুই ধারণারই বিরোধী। মনকে বস্তু মনে করা যায় না, আবার মনকে মস্তিষ্ক নামক বস্তুর প্রভাব থেকে মুক্ত বলে ভাবাও চলে না। মস্তিষ্কই মন ও মানসিকতার অধঃস্তর (infra structure)। মস্তিষ্কের উত্তেজনা, নিস্তেজনা, গতিময়তা মন এবং দেহে নানাভাবে অভিব্যক্ত। যেমন, মস্তিষ্কের উত্তেজনা প্রবাহের অকস্মাৎ আধিক্যে একদিকে মনে প্রক্ষোভের সঞ্চার হয়, অন্যদিকে অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদির দ্বারা সেই প্রক্ষোভ প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। মস্তিকে নিস্তেজনার আধিক্য ঘটলে ঐ ভাবেই সেটা প্রকাশ পাবে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ব্যক্তি যেমন, বিভিন্ন মনও তেমনি ব্যক্তি বিশেষ স্বতন্ত্র। তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য, মস্তিষ্কের টাইপ ; এবং পরিবেশ প্রভাবে গঠিত শর্তাধীন পরাবর্ত ইত্যাদির ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে ওঠে মানসিকতা। এই সবের ওপরেই বর্তমানের মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিস্তেজনা তার প্রতিক্রিয়া নির্ভরশীল।

একই উদ্দীপক বিভিন্ন মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। যে কথায় একজন ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে পারে সেই কথাতেই অপর একজন মৃদু হাসির সঙ্গে প্রতিপক্ষের ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারে।

এতক্ষণ আমরা যা বললাম তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মনোরোগ সম্পর্কে চিকিৎসকদের যদি একটি সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব থাকতো এবং মন ও

মানসিকতার বিভিন্নতা ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতো তাহলে সাধারণ মানুষ মধ্যযুগীয় ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারতো। অবশ্য সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা এবং সাধারণ অজ্ঞতা—যার উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে—সেগুলো বোধহয় থেকেই যেত।

মন ও মানসিকতার অধঃস্তর মস্তিষ্ক—এই তত্ত্বটি সিদ্ধ ও প্রমানিত। কিন্তু এখনও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এই তত্ত্বটিকে স্বীকার করে নিয়ে মনোরোগ ও তার শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আমরা এবার আলোচনা করতে চাই। একজন অল্পকথায় রেগে গিয়ে গৃহস্থের অন্যান্যদের গালাগালি দিচ্ছেন, তার বকবকানি বা খেয়ালী-পনায় বাধা দিলে উত্তেজনা আরও বাড়ছে, হয়তো বাধাদানকারীকে আঘাত করতে উদ্যত হচ্ছেন ; এই মানসিক অবস্থা মস্তিষ্কের বিশেষ কোন কিছু কোষের উত্তেজনা-বৃদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। সাধারণতঃ মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনা ও নিস্তেজনা—এই পরস্পর বিরোধী স্বাভাবিক ধর্ম সমমাত্রিক হয়ে থাকে। কোনও একটি অপ্রীতিকর কথায় আমার রাগ হ'ল—মস্তিষ্কের কোষের উত্তেজনা বাড়ল, এই উত্তেজনা আশেপাশের কোষগুলোতে প্রতিক্রিয়াজাত আবেশনের ফলে নিস্তেজনার আধিক্য ঘটল ; ফলে আমার উত্তেজনা, নিস্তেজনা-তরঙ্গের দ্বারা প্রতিহত হল। যদি কারও মস্তিষ্ককোষের নিস্তেজনাধর্ম স্বভাবতঃ কম থাকে অথবা উত্তেজনাধর্ম বেশী থাকে তাহলে উপযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় সে ঐরকম ম্যানিক্যাল (manical) হয়ে উঠবে। উত্তেজনার আধিক্য ও নিস্তেজনার স্বল্পতা যেসব মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য তাদের কোলেরিক (choleric) বলে অভিহিত করা হয়। কোলেরিক টাইপের লোকই যে শুধু ম্যানিক্যাল হয়ে উগ্রমূর্তি ধারণ করবে একথা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। উত্তেজনা নিস্তেজনাধর্ম যাদের মস্তিষ্কে সমমাত্রিক তারাও বিশেষ ক্রোধ-উৎপাদনকারী উদ্দীপকের প্রভাবে অভিভূত হয়ে একই রকম রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে পারে। আমার কাছে সব থেকে যা মূল্যবান তাই নিয়ে যদি কেউ আমাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে তাহলে সমমাত্রিক হওয়া সত্ত্বেও আমি অস্থির, চঞ্চল এবং অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়তে পারি ! এ ছাড়া অন্য কোন কারণে আমি যখন উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন, আমার স্নায়ুগুলো যখন টেন্‌স্ (tense) হয়ে আছে তখন অতি সামান্য কথায় আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়তে পারে, মস্তিষ্কে উত্তেজনা প্রবাহ আমাকে উন্মাদের মত আচরণ করতে পারে।

আপনারা বিষণ্ণতারোগের (depression) সঙ্গে সকলেই কমবেশী পরিচিত। এখানে নিস্তেজনাধর্ম প্রাধান্য লাভ ক'রে রোগীকে কর্মবিমুখ, হতাশাচ্ছন্ন ও ভীতগ্রস্ত করে তোলে। এই অবস্থায় তাদের কাছে জীবন বিস্বাদ ও অর্থহীন মনে হয়। এখানেও আগের মত তিনটি কারণ এই নিস্তেজনা আধিক্যের মূলে আছে বলে আমরা মনে করি। (১) রোগী নিস্তেজনাধর্মী মস্তিষ্কের অধিকারী (inhibitory type), (২) মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনা নিস্তেজনা সমমাত্রিক, কিন্তু

যে সময় নিস্তেজক উদ্দীপক তার মস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সেই সময় বা তার কিছু আগে সে তার কাছে যা মূল্যবান তা হারিয়ে ম্রিয়মান হয়ে আছে, ব্যর্থতা ও হতাশার জ্বালায় ভুগছে। এই সময় খুব সামান্য নিস্তেজনাকারী উদ্দীপকের প্রভাবে সে ভেঙ্গে পড়ে বিষণ্নতা রোগী বলে চিহ্নিত হতে পারে। (৩) আবার অন্যান্য কারণে তার স্নায়ুগুলো যদি টেন্‌স্ (tense) হয়ে থাকে ঐ ম্যানিক্ রোগীর মতই সে বিষণ্নতা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কোনও ক্ষেত্রেই কিন্তু শৈশব থেকে গড়ে ওঠা শর্তাধীন পরাবর্তগুলির বিবিধ প্রভাবকে ভুললে চলবে না।

সাধারণ মানুষের কাছে এই ধরণের রোগীই প্রথম দিকে রোগী বলে বিবেচিত হয় না। স্বামীর রাগ বেড়ে গেছে, মেজাজ খারাপ হয়েছে এইসব ভেবে স্ত্রী গোপনে চোখের জল মোছেন, আর কোনও বাড়ীর বধূ যদি তার নিয়মিত গার্হস্থ্যকর্ম করতে পারছেন না বা করছেন না দেখা যায় তাহলে শাশুড়ী, ননদ এবং কোন কোন সময় স্বামীও মনে করেন কাজের ভয়ে অসুস্থতার ভান করছেন। এর জন্য এঁদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। এই দুটি রোগই মেজাজের হেরফের, রোগী যখন খুবই উত্তেজিত এবং জিনিসপত্র ভাঙ্গছেন তখনও অসংলগ্ন বা অশ্রাব্য কোনও কথা তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় না। দু'এক ক্ষেত্রে নিজেকে সীজার বা তৈমুর লং মনে করলেও, তাদের মেগালোম্যানিয়াক (megalomaniac) কথাবার্তার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও, স্কিজোফ্রেনিকদের মত তাদের অতিরঞ্জনের ডিল্যুশন (delusion) থাকে না। চিকিৎসকের পক্ষে রোগ নির্ণয় কঠিন হলেও সাধারণের পক্ষে রোগের প্রথমদিকে বিভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক।

বহু আলোচিত এবং বিতর্কমূলক স্কিজোফ্রেনিয়া (schizophrenia) রোগের প্যাথোফিজিওলজি* নিয়ে আলোচনায় আসছি। পাঠ্যপুস্তকে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের মধ্যে অনেক ধরণের রোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়া, ক্যাটটনিক্ স্কিজোফ্রেনিয়া, সিম্পল্ স্কিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি। এই রোগীরা সকলেই প্রায় বাস্তববিমুখ অথবা বাস্তবজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। কারো কারোর কথাবার্তায় প্রথম থেকেই অস্বাভাবিকতা ও বাস্তববিমুখীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। হ্যালুসিনেশান[১] এবং ডিলিউশান[২] যাদের থাকে তাদের সাধারণ মানুষই অস্বাভাবিক এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে উন্মাদ বলে বুঝতে পারে। আবার এখানে নিজ নিজ বুদ্ধি বিশ্বাস ও সংস্কৃতি অনুযায়ী তারা বিশেষ করে বাড়ীর লোকেরা, এই অস্বাভাবিকতাকে একধরণের বৈশিষ্ট্য বলে ভাবতে পারে। আমাকে রোগী যদি বলে 'আমাকে আমার বন্ধু, এক গুণীনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সেই গুণীন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলল! তারপর

---

* শারীরবৃত্তের বিকার

(১) অমূল প্রত্যক্ষ (২) ভ্রান্তি

থেকে তার কণ্ঠস্বর আমি সবসময় শুনতে পাচ্ছি, এইরকম অস্বাবিক কথাবার্তাও রোগীর আত্মীয়-স্বজন কোন কোন সময় স্বাভাবিক বলে মনে করেন, কারণ তারা তুকতাক্ মারণ উচ্চারণ-বশীকরণ ইত্যাদির ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী। আবার দু-এক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন একদিকে রোগীর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অথবা জ্ঞান বাড়ীর লোকেদের বিস্মিত করে; তারা রোগীকে জিনিয়াস্ মনে করে গর্বিত বোধ করেন। খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি এখানে বলি যে বেশ কিছু পণ্ডিতের ধারণা যে জিনিয়াস (genius) এবং উন্মত্তার মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে। এ আলোচনার মধ্যে আমরা বর্তমানে যাচ্ছি না। তবে স্কিজোফ্রেনিক রোগীদের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং অতিসংবেদনশীলদের সংখ্যা বেশী—একথা বললে বোধহয় খুব ভুল করা হবে না। স্কিজোফ্রেনিয়াকে বাংলায় চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বলা হয়। আর আগে যে রোগীদের কথা বলেছি তাদের রোগের নাম খেদোন্মত্ত বাতুলতা।

মস্তিষ্ককোষের অন্যতম ধর্ম গতিময়তা সম্পর্কে কিছু না বললে স্কিজোফ্রেনিয়ার প্যাথোফিজিওলজি বা মস্তিষ্ক ধর্মজনিত প্রক্রিয়া বুঝতে আমাদের অসুবিধা হবে। গতিময়তা উত্তেজনা নিস্তেজনার মতই মস্তিষ্ককোষের আর একটি বিশেষ ধর্ম। বাইরের বা শরীরের ভিতরের উদ্দীপক মস্তিষ্ককোষে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে তার গতিবেগ মস্তিষ্কে একরকম নয়। এই গতিময়তার সঙ্গে মস্তিষ্কের টাইপেরও একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে, অতি সংক্ষেপে সেটা উল্লেখ করছি। উত্তেজনা নিস্তেজনা, যেসব মস্তিষ্কে সমমাত্রিক, তাদের আবার এই গতিময়তার মাত্রা অনুযায়ী দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যাদের গতিময়তা বেশী তারা চটপট অন্যের বক্তব্য বুঝতে পারে এবং অতি সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে পারে। এই টাইপের নাম প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguinous)। আর গতির বেগ যাদের মধ্যে কম, কোনও কিছু শুনলে বা পড়লে তারা বুঝতে বেশী সময় নেয়; সবকিছু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে। একসঙ্গে দু'তিনটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে তারা ভালোবাসে না। সাধারণতঃ সফল রাজনৈতিক নেতা বড়দরে শিল্পপতি অথবা প্রশাসক ইত্যাদি মানুষেরা প্রাণচঞ্চল টাইপের মস্তিষ্কের অধিকারী। আর গবেষক, চিন্তাবিদ জাতীয় লোকেরা ফ্লেগম্যাটিক (phlegmatic) বা আত্মপ্রতিষ্ঠ টাইপ। স্কিজোফ্রেনিয়া সাধারণতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠ টাইপের লোকেদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। তাদের সবকিছু গভীর ভাবে চিন্তা করার বা তলিয়ে বোঝাবার চেষ্টায় যদি বারবার বাধা পড়ে অথবা তাদের সমস্যা যদি তাদের পক্ষে সমাধান-অসাধ্য হয় তা হলে তাদের গতিময়তা আরও কমে যায়, তারা নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তাদের মস্তিষ্কের কার্মিককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদকেন্দ্র (Senscrium) দুই ই ক্রমশঃ শ্লথ, অনড় হতে থাকে। প্রথমে বাইরের জগৎ থেকে, তারপর

পরিবারস্থ মানুষের কাছ থেকে এবং শেষে নিজের সত্তা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চিকিৎসকরা তাকে প্রত্যাহরণ (withdrawl) বলে অভিহিত করেন। কিছু পরে রোগীদের মস্তিষ্ককোষ সঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালন বা পরিবহন করতে পারে না। একটি কোষের সঙ্গে অন্য কোষের সংবাদ আদান প্রদান সম্পর্ক বিকল হতে থাকে। একটি কোষগুচ্ছ স্বাভাবিক অবস্থায় অন্য একটি কোষগুচ্ছের কাছে যে সংবাদ অথবা উদ্দীপনা সংকেত বহন করত, এই অস্বাভাবিক অবস্থায় সেটা সম্ভব হয় না। বাইরের জগতের এবং শরীরের আন্তর যন্ত্র থেকে যে সব উদ্দীপনা সংকেত মস্তিষ্কে পৌছে ব্যক্তিকে সচেতন করত, বাইরের জগতের এবং শরীরে আন্তর যন্ত্রে কী ঘটছে তার সঠিক সংবাদ দিত— তা আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই রোগীর মুখে অসংলগ্ন এবং শ্রোতার পক্ষে দুর্বোধ্য কথাবার্তা শোনা যায়। রোগী শুধু নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তাই নয়, মনে হয় যেন সে অন্য একটি নিজস্ব জগৎ তৈরী করেছে। তার মস্তিষ্কের এই অবস্থাকে বস্তুবাদী চিকিৎসকরা আপাতস্ববিরোধী দশা বলে বর্ণনা করেছেন (paradoxical phase)। তার কথাবার্তায় পরস্পর বিরোধী উক্তি এবং অনেকরকমের অসম্ভব ও অবাস্তব উক্তি শোনা যায়। সে ক্রমশঃ যখন নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন আত্মপরিচয় দেবার ক্ষমতাও চলে যায়; প্রসঙ্গতঃ একটি রোগীর কথা মনে পড়ছে—রোগগ্রস্ত হবার আগে সে একটি সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসক ছিল। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে প্রথমদিকে কোন উত্তর দিত না। শুধু মুচকি হাসত অথবা ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকত। কিছুদিন পরে সে, যে নার্সিং হোমে ছিল সেখানকার পরিচারকের নাম বলত এবং বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে ঐ নার্সিংহোমের ঠিকানা বলত। প্রায় দু'বছর ধরে ঐ একই নার্সিংহোমে সে একটি পরিচারকের তত্ত্বাবধানে দিন কাটাচ্ছিল। তার মস্তিষ্কের কোষগুচ্ছের মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ ও সংবাদ আদান প্রদান ঘটছিল না। দু'বছর আগেকার প্রায় সব ঘটনাই তার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল। তার মস্তিষ্কের গতিময়তা যে খুবই কমে গেছে এবং সে যে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হবে না।

স্কিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই শুধু অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination) এবং ভ্রান্তির (delusion) শারীরবৃত্তিক বিকার (pathophysiology) সম্পর্কে দু'একটি কথা বলছি। চিকিৎসকরা শ্রুতিকেন্দ্রিক অমূল প্রত্যক্ষের (Auditory hallucination) সঙ্গে বেশি-পরিচিত। শুধু স্কিজোফ্রেনিয়া রোগে নয়, অন্যান্য মানসিক রোগেও অমূল প্রত্যক্ষণ ঘটতে পারে। রোগীর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা এই অমূল প্রত্যক্ষকালীন কথাবার্তাকে অলৌকিক ঘটনা (ভর হওয়া, ভূতে পাওয়া) বলে মনে করেন এবং তার ফলে

রোগী হয় নির্যাতিত অথবা দেবতাত্মা বলে পূজিত হতে পারে। যখন রোগী হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বলতে থাকে তোমার সব কথা আমি মেনে চলব মা, আমাকে তোমার শক্তির এককণা দিয়ে সাহায্য করো' তখন তার অধ্যাপক পিতা ভক্তিভরে গদগদ হয়ে কন্যাকে প্রণাম করে বসেন। আবার কোনো স্কিজোফ্রেনিক রোগী যখন নিঃস্তব্ধ দুপুরে তার জানালা দরজা বন্ধ করা ঘরের মধ্যে ভয়ার্ত স্বরে ক্রন্দন করতে থাকে এবং বলে "শুনছ, তোমরা শুনছো ও আমার নামে কী সব বদনাম রটাচ্ছে, কাল যে কথাগুলো বর্ধমানের বাজারে বলেছিল, আজ বাসস্ট্যাণ্ডের ড্রাইভার, কণ্ডাক্টারদের শুনিয়ে শুনিয়ে সেই কথা বলছে, দরজায় ধাক্কা দিলে কি হবে, আমি কিছুতেই খুলবো না। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছো না? মনে করছ আমাকে ভূতে পেয়েছে বলে রোজার হাতে তুলে দেবে?" স্বামী যখন বাইরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন এবং দরজা খোলার জন্য বারবার অনুরোধ জানাচ্ছেন তাঁর পিছনে তখন দু'জন গুণীর ও চার পাঁচ জন প্রতিবেশী। স্ত্রীর ভর কাটাবার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছেন। মানসিক রোগ সম্পর্কে, বিশেষ করে হ্যালুসিনেশন, ডিলিউশন সম্পর্কে, বাস্তবজ্ঞানের অভাবে এদের রোগ আরও জটিল দুরারোগ্য পর্যায়ে পৌছবার সম্ভাবনা। ভ্রান্তি বা delusion সম্পর্কে সাধারণের বিশেষ জ্ঞান না থাকারই কথা। কেউ যদি বলেন পাশের বাড়ীতে একটা যন্ত্র বসিয়ে তার শত্রুপক্ষ তার মনের ভাবনা চিন্তা ইত্যাদি সব জেনে নিচ্ছে কিংবা বিশেষ কোন প্রক্রিয়া দ্বারা তার মনে কুপ্রবৃত্তি আনয়নের চেষ্টা করছে তা হলে আত্মীয়স্বজনেরা বিশেষ খোঁজ খবর না নিয়েই রোগীর কথা সবটা না হোক আংশিক সত্য এটা ভেবে নিতে পারেন।……পাশের বাড়ীতে খোঁজ খবর নিয়ে লাভ নেই। তারা গেলেই তো সেটা গোপন করে ফেলবে আর আজ বিজ্ঞানের যুগে এটা অবাস্তব বলে তাঁরা মনে করেন না। দূর থেকে অন্যের মনকে প্রভাবিত করা যায় এই মধ্যযুগীয় ধারণার পরিপোষক হিসাবে ভুয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্যারাসাইকোলজিষ্টরা খাড়া করে থাকেন। যাতে অন্ধ কুসংস্কার এবং অবাস্তব 'ঘটনা' বিজ্ঞান অনুমোদিত হয়ে মর্যাদা লাভ করতে পারে —এ নিয়ে প্যারাসাইকোলজিষ্টরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সাঁইবাবা, ইউরিগেলার ইত্যাদির অলৌকিক কীর্তিকলাপ অবাস্তব ও বিশ্বাস অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও আমাদের রোগীদের আত্মীয়স্বজনরা এখনও রোগীর মতনই ভ্রান্ত ধারণা সত্য বলে মনে করছেন। কাজেই সাধুসন্তদের, যারা যাদুবিদ্যার প্রভাবে তথাকথিত অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে নিজেদের জাহির করেন, তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা বস্তুবাদী চিকিৎসকদের প্রাথমিক কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। তা সত্বেও কিন্তু রোগীর বক্তব্য ভ্রান্তভিত্তিক না সত্য তা নিরূপণ করা আত্মীয়স্বজন কেন, চিকিৎসকের পক্ষেও অনেক সময় হয় না।

একজন যদি মনে করেন তাঁর স্ত্রী অসতী, তাঁর কোন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর অবৈধ

সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, চিকিৎসক সেই অভিযোগটি প্রথম দিকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। দু'একটি সেশনের পর তিনি যদি বলেন তাঁর আশী বছরের বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত তা হলে চিকিৎসক কেন, যে কোনো সুস্থ মানুষই বুঝতে পারে যে তিনি ভ্রান্তিমূলক মনের অসুখে ভুগছেন। এই রোগীদের রোগকে প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়া (Paranoid Schizophrenia) বলা হয়। ভ্রান্তিমূলক সন্দেহ, অবিশ্বাস ছাড়াও স্কিজোফ্রেনিয়াগ্রস্ত রোগীদের অন্যান্য উপসর্গ এদের মধ্যে দেখা যায়। কিছু কিছু চিকিৎসক প্যারানইয়া (Paranoia) নামে একটি আলাদা রোগের উল্লেখ করে থাকেন। এই রোগীদের ভ্রান্তিমূলক আচরণ বা কথাবার্তা মাত্র একটি বিষয়েই নিবদ্ধ থাকে। অন্যান্য দিক দিয়ে তারা স্বাভাবিক আচরণই করে। তাদের রোগ নির্ণয় কোনো কোনো সময় বেশ অসুবিধের সৃষ্টি করে। অফিসে ঠিকমত কাজ করছে, বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখছে, তাস খেলছে, কিন্তু তার ধারণা তাকে পুলিশের লোক পথে ঘাটে সব সময় অনুসরণ করছে। কিছু লোকের পিছনে গুপ্তচররা লেগে থাকেন আমরা জানি। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল বছর কয়েক আগে তিনি রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত এক বন্ধুকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার নামে সে সময় গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। এরপর তিনি একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সমস্যার সমাধান সহজ ছিল না। তখন বন্ধুকে আশ্রয়দানকালীন ভয় (সেই সময় তার মনে ভয় এবং পলাতক রাজনৈতিক বন্ধুকে আশ্রয়দানের গর্ব দুই-ই যুগপৎ উদিত হয়েছিল) তাকে বিচলিত করল। এইরকম ক্ষেত্রে এই ভয় যে ভ্রান্তিমূলক তা বুঝতে হলে তার অতীত জীবনের ইতিহাস ভালভাবে জানা দরকার।

আমরা দুটি প্রধান এবং গুরুতর উন্মাদরোগের কথা আলোচনা করলাম। মনে হয় রোগীর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এর দ্বারা খানিকটা উপকৃত হলেন। এর মধ্যে অনেক রোগী স্বেচ্ছায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে চায় না। চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে, প্রয়োজন হলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রোগীকে চিকিৎসার জন্যে মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসতে তাঁরা তৎপর হবেন আশা করি। এইসব রোগ অচিকিৎসিত অবস্থায় দু'তিন বছর পড়ে থাকলে পরে চিকিৎসায় সাফল্যলাভ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

—এইবার মৃদু ও সাধারণ মনের রোগের কথা বলা যাক এইসব রোগকে ইংরাজী নিউরেসিস্ (neurosis) এবং বাংলায় উদ্বায়ু বলা হয়। এইসব রোগী আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে, কাজকর্ম ক'রে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা চালাতে পারে এবং আগের দুই প্রধান রোগীদের মত জীবন বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। তাবলে চিকিৎসার ব্যাপারে পরিশ্রম বা সময় কম লাগে তা মনে করবেন না। এরা নিজেরাই তাদের রোগ সম্পর্কে সচেতন এবং

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা সুস্থ মানসিকতা ফিরে পেতে চায়। এই রোগে ভুগছে, কমকরে ধরলেও শতকরা প্রায় পনেরো থেকে কুড়িজন। কয়েকটি নিউরোসিসের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হচ্ছি। তাদের নাম কম্‌পালরিভ্‌ অক্‌সেশনাল নিউরোসিস্ (compulsive obsessional neurosis) বা পীড়নকর আবেগগ্রস্ত অবস্থা, হিস্টিরিয়া (hysteria), উৎকণ্ঠিত বা আতঙ্কিত অবস্থা (anxiety state)।

প্রথমোক্তটিকে সংক্ষেপে আমরা অবসেশন obsession বা আচ্ছন্ন অবস্থা বলে এই প্রবন্ধে অভিহিত করব। আপনারা সকলে শুচিবায়ু কথাটি জানেন এবং শুচিবায়ুগ্রস্ত কথাটি শুনলেই আপনাদের চোখের সামনে যে ছবিটি ভেসে উঠবে সেটা এইরকম :—সাধারণতঃ মধ্যবয়সী কোনো মহিলা বারবার হাত ধুচ্ছেন সাবান দিয়ে, স্নানাগারে গিয়ে একঘণ্টা থেকে থেকে পাচ'ছ ঘণ্টা সময় কাটাচ্ছেন ; ধমকধামক, হিতোপদেশে কোনো কাজ হচ্ছেনা, বাড়ীর সকলেই তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন। শেক্সপিয়রের লেডি ম্যাকবেথের কথাও আপনাদের মনে পড়তে পারে। তিনি হাত থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তখন তাঁর হাতে রক্তের দাগ নেই, কিন্তু অপরাধবোধ তাঁর মনকে আবেশিত বা আচ্ছন্ন করেছে এবং তিনি বারবার হাত ধুতে বাধ্য হচ্ছেন। আমাদের রোগীদের সকলেই যে অতীতের কোনো অপরাধমূলক কাজের জন্য এই বাধ্যকারী শক্তির দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন তা নয়। অনেক সময় অতীতেব কোনো তুচ্ছ ঘটনা যা তার বা চিকিৎসকের নজর এড়িয়ে গেছে এবং যার জন্যে রোগী সচেতনভাবে অপবাধবোধ করছেনা—এই আচ্ছন্ন অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। এই অবস্থার শারীরবৃত্তিক বিকার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন রুশ বিজ্ঞানী পাভলভ। ল্যাবোরেটরীতে ছোট এবং বড় প্রাণীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যে কোনো সংকটজনক অবস্থার প্রাণীটিকে রেখে দিলে এই আচ্ছন্ন রোগ (obsessional neurosis) দেখা দিতে পারে। পরীক্ষা-নিবীক্ষার একটা উদাহরণ দিচ্ছি! একটি বাচ্চা কুকুরকে একটা উঁচু টুলের উপর দাঁড় করিয়ে যদি টুলটিকে ধীরে ধীরে একপাশে কাৎ করা যায় তাহলে পড়ে যাবার ভয়ে কুকুরটি আর্তস্বরে চিৎকার করতে থাকবে এবং নখ দিয়ে টুলটিকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করবে। এইরকম পরীক্ষা কয়েকবার করার পর ঐরকম উঁচু টুলে উঠিয়ে দিয়ে টুলটি না নাড়ালেও কুকুরটি ভয় পাবে, ডাকতে থাকবে এবং নখ দিয়ে টুলটিকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করবে। আত্মরক্ষামূলক প্রবৃত্তি থেকে তার মধ্যে এই আচ্ছন্নতারোগের সৃষ্টি হয়েছে ; আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি মূলক নতুন শর্তাধীর পরাবর্ত গঠিত হয়েছে। পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য ছোটবেলা থেকে যদি কোন বালক বা বালিকাকে অনবরত হিতোপদেশ শোনানো হয় অথবা খেলাধুলোর সময় গায়ে বা কাপড়চোপড়ে ময়লা লাগলে বকুনি দেওয়া হয় বা নির্যাতন করা হয়, তবে তার

মধ্যে এই শুচিবায়ু চলতি কথায় Washing mania—অভ্যাসটি গড়ে উঠতে পারে, অবশ্য যদি রোগী নিস্তেজনাধর্মী মস্তিষ্কের অধিকারী হয়। এই রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কোনো ফ্রয়েডীয় ধারার বিশ্লেষণ শুধু সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুচিবায়ু ছাড়াও অনেকরকমের আচ্ছন্ন অবস্থার (obsessive neurosis) সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। একজন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার তার কাগজপত্র ড্রয়ায়ে ঢুকিয়ে অন্তত পাঁচমিনিট ধরে ডালাটা টানাটানি করে দেখতেন ড্রয়ার ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কিনা তারপর বাইরে কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসতেন কোনো একটা অছিলায়। দারোয়ানকে দিয়ে বাইরের তালা খুলিয়ে আবার তাঁর ড্রয়ার সুরক্ষিত কিনা এটা কয়েক মিনিট ধরে তাঁকে দেখতে হত। ইনিও যে আচ্ছন্ন রোগে (obsession) ভুগছেন একথা নিশ্চয় আপনাদের বলে দিতে হবে না। বর্তমানে আমার চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তি কথা বলতে গিয়ে প্রতিটি বাক্য অন্তত: পাচ-সাতবার উচ্চারণ করেন। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পরে বারবার ধমকানি খাওয়া সত্ত্বেও তিন-চারবার আগে বলা কথার পুনরাবৃত্তি করতে ফিরে আসেন। প্রায় জোর করে তাঁকে নিবৃত্ত করতে হয়। রোগীটি সাম্প্রতিক আমদানী। তার সঙ্গের মেয়েটির মুখে শুনেছি প্রতিসন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে এই এক কথা বার বার বলার জন্যে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া এবং মারামারি প্রায় প্রতিরাত্রেই ঘটে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন যে তাঁর মনে হয় অন্য লোক তাঁকে অবহেলা করছে, তাঁর কথা মন দিয়ে শুনছেনা। তাঁর সন্দেহ শুধু এই ব্যাপারেই নিবদ্ধ নয়। তাতে ডাল মাখতে তাঁর মনে হয় যা খাচ্ছেন সেটা ভাত ও ডাল নয়, অন্য জিনিষ। বারবার এই কথা স্ত্রীকে বলার ফলে তুমুল কাণ্ড ঘটে। সন্দেহ ও অবিশ্বাস এই ধরণের রোগীর একটি বিশেষ ধর্ম। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সঙ্গে প্যারানইয়া (paranoia) রোগের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বড় রকমের পার্থক্য আছে। অবসেশ্‌নের রোগী নিজে জানে যে এই সন্দেহ দুর্বলতা তার স্বভাবধর্ম, সে জানে সে ডাল ভাত খাচ্ছে, সে জানে অন্যলোক একবারেই তার কথার পুনরাবৃত্তি না করে সে থাকতে পারেনা। প্যারানইয়া বা ডিলিউশনের রোগীরা কিন্তু কখনও এরকম মনে করে না। তারা মনে করে তাদের সন্দেহ, অবিশ্বাস পুরোপুরি সত্য এবং এ নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। মস্তিষ্ক কোষের বিকারতত্ত্বের দিক থেকে এই দুই ধরনের রোগীর পার্থক্য এইরকম দুজনেরই মস্তিষ্কের একগুচ্ছ কোষ উত্তেজিত অবস্থায় অনড় হয়ে আছে। তার চারপাশে নিস্তেজনা বলয় সৃষ্টি হয়েছে ; অবসেশনের রোগীর এই বলয়ের গভীরতা কম, তাই অন্যের যুক্তিধর্মী কথা সে বুঝতে পারে এবং স্বীকার করে। অপরদিকে

প্যারানইয়া রোগীর বলয়ের গভীরতা খুব বেশী। যুক্তিতর্ক সেই বলয় লঙ্ঘন করতে পারে না। ভ্রান্তিতে সে অটল ও অবিচল।

এবার হিস্টিরিয়া প্রসঙ্গ। হিস্টিরিয়া কথাটি প্রায় সবারই জানা। তবে তাঁরা প্রায় একধরণের হিস্টিরিয়া সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল। মূর্চ্ছা হচ্ছে, জ্ঞান হলেই রোগী চোখ বড় করে সামনে যাকে দেখছে তাকে তিরস্কার করছে অথবা নেপথ্যে অবস্থিত কোনো দেবদেবীর সঙ্গে আলাপ করছে—এই ধরণের রোগীর দর্শনলাভ সকলের না হলেও এই সম্পর্কে তাঁরা অনেক গল্প শুনেছেন। উনিশ শতকে ইউরোপের সর্বত্রই মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে, এই রোগ দেখা দিত। নাটকে নভেলে নায়িকার মাঝেমাঝে মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা প্রায়ই লেখা হত। শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে নায়িকাদের "সম্বিত হারানোর" একাধিক বিবরণ আছে। আমাদের দেশে এবং অন্য দেশেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভূতে পাওয়া, ভর হওয়া ইত্যাদি কথা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হত। এ সম্পর্কে আমরা এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে উল্লেখ করেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হিস্টিরিয়া সম্পর্কে চিকিৎসকরা নতুন জ্ঞান লাভ করেন। ফ্রান্সে পরিখা কেটে একদিকে জার্মান সৈন্য অন্যদিকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য পরস্পরকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত। পরিখার মধ্যে অবস্থিত এক সৈনিকের দু'পাশে দুই সহযোদ্ধা শত্রুর গুলিতে নিহত হয়েছেন। তাদের রক্তস্রোত জীবিত সৈনিকটিকে মোহাচ্ছন্ন করল। সে অচেতন হয়ে গেল। পরে যখন কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত হাসপাতালে তাকে নিয়ে আসা হ'ল দেখা গেল যে, তার অতীতের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়েছে, অথবা সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে কিংবা তার ডান হাত পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে। এদের নিয়ে গবেষণা শুরু হল এবং দেখা গেল যে এরা সবাই হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। হিস্টিরিয়ার এই পরিবর্তিত রূপকে কন্‌ভ্যারশন্‌ হিস্টিরিয়া (converson hysteria) বলা হয়। রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন বা যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা শুধু দেশদ্রোহিতা নয়, বড়দের নৈতিক অপধাধ বলেও বিবেচিত। পরিখার মধ্যে মৃত সহযোদ্ধাদের দেখে রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের যে ইচ্ছা উপরে উল্লিখিত সৈনিকটির জেগেছিল সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করলে সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হবে এবং কাপুরুষ বলে ঘৃণিত হবে, একথা সে জানত। তাই তার ভয় ও পলায়নের ইচ্ছা রূপান্তরিত হয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই পরীক্ষার আগে (মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক) মনোরোগ চিকিৎসকরা হিস্টিরিক দৃষ্টিহীনতা বা ডান হাতের হিস্টিরিক অসাড়তারকেস পেয়ে থাকেন। শুধু পরীক্ষা নয়, যে কোনো সংকটের মধ্যে দুই বিপরীতধর্মী প্রক্ষোভের সংঘাতে শারীরিক বা দেহের মধ্যেকার যন্ত্রপাতির এইরকম অসাড়তা ঘটে থাকে। হিস্টিরিয়াজনিত বাকরোধ, দৃষ্টিহীনতা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসাড়তা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় প্রচুর তথ্য মনোরোগ চিকিৎসকদের ডায়েরিতে পাওয়া যেতে পারে।

উৎকণ্ঠিত বা আতঙ্কিত অবস্থার রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। আবার এই রোগীদের পুরোপুরি নিরাময় হবার সম্ভাবনা অন্য রোগীদের তুলনায় অনেক বেশী, কিন্তু যদি এই উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ অবসেশনে পরিণত হয় তা হলে চিকিৎসার সময়ও বেড়ে যায় এবং এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাময় হবার সম্ভবনাও কমে যায়। Obsessional fear বা "আবেগ-আতঙ্ক" সম্পর্কে আমবা পরে আলোচনায় আসছি। ভয়ের রোগীদেব কতগুলি উপসর্গ থাকে। বুক ধড়-ফড়ানি (palpitation), নিঃশ্বাসের কষ্ট (breatnlessness) মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, হজমেব গোলমাল, অনিদ্রা, বারবার মলমূত্র তাগিদ, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, গলা শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ বা বোগ-লক্ষণেব কথা প্রায় সকলেই পেশ করেন এবং বেশ কিছু সংখ্যকের মধ্যে মৃত্যুভয়ের অবস্থিতি দেখা যায়। এদের অনেকেই শারীবিক উপসর্গেব জন্য পাবিবাবিক চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ দ্বাবা পূর্বেই চিকিৎসিত হয়েছেন। দেড দু-বছব নানা বকম ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও যখন উপসর্গের উপশম ঘটে না তখনই তারা পাবিবাবিক চিকিৎসকের পবামর্শে অথবা নিজে থেকেই মনোবোগ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। ভদ্রলোক—বছর তিবিশেক বয়স কংকালসাব চেহারা, মুখেচোখে উৎকণ্ঠাব ছাপ স্পষ্ট—এসে জানালেন যে বছব চার-পাঁচ ধরে তাঁর হজম হচ্ছে না, খেতে পাবছেন না। তিনি সবকারী দপ্তরে কেবাণীগিরি করেন। বাড়ীতে পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া আব কেউ নেই। মাঝখানে মাসকয়েক তিনি সাময়িকভাবে বদলি হয়ে অন্য জায়গায় কাজ করেছেন। সেই সময় হজমের ওষুধ ইত্যাদি না খেয়েও তিনি মোটামুটি ভাল ছিলেন। ওজনও প্রায় দেড় কিলো বেড়েছিল। তিনি কলকাতায় ফিরে আসাব পব থেকে আবাব একই অবস্থা হয়েছে। ওষুধে ঘেন্না ধরে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। চিকিৎসকরা তাঁর উপসর্গেব উৎসের সন্ধান না করে উপসর্গ প্রমশনের ব্যবস্থা কবে গেছেন। কাজেই প্রথমদিকে কিছু ফল পেলেও শেষেব দিকে ফল হয়নি। তাঁর জীবন কাহিনী থেকে জানতে পারা গেল যে তাঁর ঐসব শারীরিক উপসর্গের—যাকে ইংবেজীতে 'psycho somatic diforder বলা হয়—কাবণ ভয়। তাঁর দাদা বদরাগী এবং মদ্যপ। বৃদ্ধ পিতার কাছে মাঝে মাঝে মার টাকার জন্য হাত পাতত এবং তিনি টাকা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করনে তর্জন-গর্জন, অশ্রাব্য গালিগালাজ করে তাঁকে অসম্মানিত করত। এইবকম এক রাত্রে বোগী বাবার চিৎকারে ভয় পেয়ে বাবার ঘরে ছুটে যান এবং দাদাকে বাধা দেন। শক্তি এবং সাহস তার দাদার অনেক বেশী ছিল; ভাইকে তিনি তক্ষুনি দু'চার ঘা দিয়ে অভিনন্দিত করেন। দাদার এই তর্জন-গর্জনগুলো প্রায় সাড়ে নটা দশটায় হত রোগী ভয় পেয়ে নটার আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেন। তখন থেকেই তাঁর শারীরিক উপসর্গগুলির সূত্রপাত। বদলি কাজ করার সময় ভয়ের উৎসটি তাঁর কাছে ছিল না, তাই

তিনি অনেকখানি সুস্থ ছিলেন। আমার এবং তাঁর সৌভাগ্যক্রমে, চিকিৎসা শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দাদা কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন। এইরকম কাহিনীই মনোরোগ চিকিৎসকরা সরবরাহ করতে পারেন। এই উৎকণ্ঠা পীড়িত রোগীদের মানসিক উপসর্গের মধ্যে মৃত্যুভয় ছাড়া উন্মাদ হবার ভয়ও দেখা দিতে পারে। কান্নাকাটি বিলাপ তাদের নিত্য নৈমিত্তির চিকিৎসক সম্ভাষণ। ভয়ের সঠিক কারণ নির্ধারণ করতে পারলে এদের রোগমুক্তি সহজ হয়ে যায়। আগেই বলেছি সব মনের অসুখের মধ্যে এই রোগেরই প্রাদুর্ভাব বেশী এবং এই ধরণের রোগীরা আরোগ্যলাভ করেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু উৎকণ্ঠাতাডিত অবস্থায় বেশীদিন থাকলে এই উৎকণ্ঠা ক্রমশ অব শেসনে পরিণত হতে পারে। কোনো বিশেষ অবস্থায়, কোনো বিশেষ কারণে অত্যধিক ভয় পাওয়া রোগীর স্বভাবধর্ম হয়ে ওঠে। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ উৎকণ্ঠা-আচ্ছন্ন এই অবস্থাকে "ফোবিক রিঅ্যাক্‌শন্" (phobic reaction) নামে অভিহিত করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ ভয়ের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। যেমন claustrophobia, agarophobia ইত্যাদি।

আমরা সমাজবদ্ধ জীব। আমাদের নিরাপত্তা সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সমাজে যখন প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্বার্থসংক্রান্ত সংঘাত বেশী থাকে তখন স্বভাবতঃই সমাজবদ্ধ মানুষের মনে ভয়, ভাবনা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য দুঃশ্চিন্তা বাডতে থাকে। এ ছাড়া যদি ধর্মোন্মাদনা, জাত্যভিমান, ও ভাষাভিত্তিক আন্দোলন কোন সময় তীব্র আকার ধারণ করে তখন যেসব এলাকায় আলোড়ন চলে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (ধর্মীয়, জাতীয় ও ভাষাভিত্তিক) খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটায়। আমাদের দেশে স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মন্দিরের কাছে গরু জবাই বা মসজিদের সামনে প্রতিমা বিসর্জনের মিছিল নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভবনা দেখা দিত, তখন স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভীতত্রস্ত হয়ে উঠত। এই সামাজিক তথ্যগুলো মনে রাখলে ভয়ের রোগের কারণ বিশ্লেষণ সহজ হবে। এছাডা রোগীর জীবনের অন্যান্য ঘটনাও থাকে একেবারে ব্যক্তিগত কারণ থেকে ভয়ের উদ্ভব হতে পারে।

একজন এসে বললেন তিনি ভীড়ের ট্রেনে বা দ্রুতগামী ট্রেনে, বাসে, বিশেষ করে ভীড়ের বাসে, উঠতে পারেন না। অফিসের বাসেও অফিসে যেতে অক্ষম, তাই সাইকেলের বন্দোবস্ত করেছেন। এ রকম চলেছে ১৬।১৭ বৎসর ধরে। এ ছাড়া কোন বদ্ধ জায়গায়, যেমন সিনেমা হলে, তিনি ঢুকতে পারেন না, থাকতে পারেন না। তাঁর বিবাহ হয়েছে প্রায় ১৪ বছর। এর মধ্যে একদিনও তিনি তিনি সিনেমা দেখেননি এবং এই কারণে তাঁর স্ত্রীও সিনেমা দর্শন থেকে বঞ্চিত।

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন মাতামহের আশ্রয়ে নিরাপত্তা খুঁজছিলেন সেসময় তাঁর মাতামহ এক বাস দুর্ঘটনায় মারা যান। এর কিছুদিনের মধ্যেই মাতামহীর পা পিছলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়। এই দু'টি ঘটনা তাঁকে বিশেষ ভাবে বিচলিত করে এবং এই সময় থেকেই তিনি ভয়াক্রান্ত।

বছর তিনেক আগে দেওঘর থেকে একজন ৩০/৩২ বছরের যুবক আমার কাছে চিকিৎসার্থে আসে। সে সঙ্গীছাড়া বাড়ী থেকে অফিস—যা মাত্র কয়েক মিনিটের পথ—যেতে পারত না। সাধারণতঃ তাঁর স্ত্রী আমার কাছে আসার সময় সঙ্গী থাকত। অফিসে যাবার সময় তার কোনও একজন সঙ্গী লাগতই। ছেলেটি স্কুল কলেজে পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিল। শৈশবে পিতৃহীন হবার পর থেকেই আর্থিক নিরাপত্তার অভাবে তার মনে আবছা আতঙ্ক সবসময় বিদ্যমান ছিল। সে ওই বয়সেই ধর্মচর্চা করত এবং স্থানীয় একজন খুবই নামকরা গুরুর শিষ্য হয়েছিল। তারই নামজপ করার জন্য তার হাতে একটা, থলির মধ্যে রুদ্রাক্ষের মালা থাকত। সে দিনে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পূজার্চনা করত। যুক্তিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানসম্পর্কিত পড়াশুনা তার কম ছিল না। তা সত্ত্বেও সে মনে করত রাস্তায় একলা বেরলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারে। এই ভয়েই সে সঙ্গী ছাড়া কখনও বাড়ীর বাইরে যেত না। তবুও ভয়ের হাত থেকে সে মুক্তি পেত না।

এই দুই ক্ষেত্রেই ভয় অব্‌সেশনে দাঁড়িয়ে গেছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা গেল দুজনেই মৃত্যুভয়ে ভীত। প্রথম রোগীটির মৃত্যুভয়ের কারণ তার রোগ ইতিহাস থেকে সহজেই বোঝা যায়। দ্বিতীয়টির বেলায় অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। জানা গেল তার পারিবারিক জীবন শান্তির নয়। মা এবং স্ত্রীতে বনিবনাও হয় না। শিক্ষিত এই ছেলেটি মায়ের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীকে অনেক সময় প্রহার করত। এ কথাগুলো তার স্ত্রীর কাছ থেকে শোনা এবং সে অস্বীকার করতে পারেনি। স্ত্রীর শারীরিক স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল। তবুও গৃহস্থালীর সব কাজকর্ম তাকেই করতে হত। ছেলেটি স্ত্রীকে নির্যাতন করেই ক্ষান্ত ছিল না, তার নামে কুৎসা রটনা করত। সমস্ত স্ত্রীজাতির উপরেই তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল সেটা কিছু দিনের মধ্যেই বুঝলাম। এই বিদ্বেষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক ন্যক্কারজনক ঘটনার হদিশ পাওয়া গেল। সাত বছরে ছেলেটি পিতৃহীন হয়। সে ছিল একমাত্র সন্তান। বারো তেরো বছরের সময় সে জানতে পারে ও বুঝতে পারে যে তার মা (৩১/৩২ বয়স) একজন গুরু ভাই-এর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত। বারো বছরের ছেলে রাগে, ঘৃণায় কুপিত হয়ে একদিন মায়ের অনুপস্থিতিতে তার গুরুজন স্থানীয় মায়ের শয্যাসঙ্গীকে কটুকথা শোনায়। তিনি তার গলা টিপে ধরে, তাকে মেরে ফেলবেন বলে ভয় দেখিয়ে বলেন যে, সে যা

জানে তা যদি কারো কাছে প্রকাশ করে তা হলে তার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। সেই থেকে মৃত্যুভয় তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু মায়ের প্রতি আনুগত্য এবং ভালবাসা একটুও কমে না। তার তখন মনে হয়েছিল এবং এখনও মনে হয় যে, মা নির্দোষ তিনি ভয়ের বা অর্থা-ভাবের বশবর্তী হয়েই ঐ লোকটিকে শয্যাসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই একদিকে তার নারী জাতির উপরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, স্ত্রীর প্রতি নির্যাতন এবং অন্যদিকে জন্ম দুঃখিনী মায়ের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ।

ভয়ের অনেক রোগীই আবার ব্যক্তিগত দিক থেকে কোনো ভীতিজনক অবস্থার সম্মুখীন হন নি—এও দেখা যায়। তারা মা-বাবার স্নেহ থেকে শৈশবে বঞ্চিত এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ, বিবাদ, দেখে এবং শুনে বিশেষভাবে বিচলিত। পাড়ায়, স্কুলে, কলেজে সমবয়সীদের সঙ্গে তারা সহজভাবে মিশতে পারেনা, সবলোককেই সন্দেহ বা অবিশ্বাস করে, নিজের সমস্যার সমাধান করার জন্য নানাবিধ পুস্তক থেকে সূত্র বা উপায় খোঁজার চেষ্টা করে। এই ধরনের ভয় বা সন্দেহ কিন্তু স্কিজোফ্রেনিক প্যাবানয়েডেব ভয় থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। বাইরের জগৎ থেকে তাবা বিচ্ছিন্ন নয়, আবার সমাজ বা সমাজস্থ মানুষের একাত্মবোধেরও অভাব। এরা সাধারণতঃ চিকিৎসককেও পুরোপুরি বিশ্বাস কবে না, ওষুধ খেতে ভয় পায়, পাঁচ সাতটি সাক্ষাৎকারের পরও তারা খোলাখুলিভাবে সব কথা ডাক্তারকে জানায় না। ডাক্তার আরও কিছু জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তারা চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়। বাড়ীতে, পাড়ায় এবং বৃহত্তর সমাজে, কোথাও নির্ভর করার মত বন্ধু বা সঙ্গী তারা খুঁজে পায় না, বলা চলে খোঁজ করার চেষ্টাও ঠিক করে না। দল, উপদল, গোষ্ঠী ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে থাকার ফলেই আমরা সাধারণতঃ ভয় থেকে অনেকখানি মুক্ত থাকি। ফোবিয়ার রোগীরা দলছুট, বন্ধুহীন এবং তাই নিরাশ্রয় ও নিরাপত্তার অভাবে পীড়িত। সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভয়ে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করে যাবার যে হিড়িক পড়ে গেছে বর্তমানে পাঞ্জাব হরিয়ানায়, সেই ভয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত কারণে উদ্ভূত ভয়ের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। সংখ্যালঘুদের ঐ ভয় সাময়িক। তাদের কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। তবে তারা যদি স্থানান্তরনের সুযোগ না পায় এবং ঐ ভয়ের পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয় তা হলে তাদের ভয় অব্‌সেশনে পরিণত হতে পারে। কোনো গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, রাজনৈতিক, দল ইত্যাদির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করতে না পারলে আমরা স্বভাবতঃই নিরাপত্তার অভাব বোধ করবো এবং আতঙ্কের কোনো সামান্যতম কারণ ঘটলেই হয়তো রোগী হয়ে পড়ব। সমাজবদ্ধ প্রতিটি ব্যক্তির তাই এই সমাজকে সুস্থ এবং যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, রেষারেষি এবং দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য ব্যক্তিপ্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতার (ধর্মভিত্তিক,

ভাষাভিত্তিক, জাতিভিত্তিক, ইত্যাদি সব রকমের) এ দেশের আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এর জন্য পরিবর্তনে প্রয়াসী ব্যক্তিদের সংগঠিত করা দরকার। মনের রোগের উৎস অনুসন্ধান ও মনের রোগের ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য কি—এই আলোচনায় আমরা হয়তো অনেক কিছু বলছি যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মনের রোগের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু মনের রোগকে বোঝার জন্য শুধু আমাদের দেশের নয়, গোটা পৃথিবীর রাজনৈতিক সমাজনৈতিক অবস্থার জ্ঞান ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাই আমাদের এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করি না।

কোন মানুষ ভয় পায়? ব্যক্তিমানুষ কোনো একটি বিশেষ বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে নিজেকে সুরক্ষিত করতে চায়, সেই বিশ্বাসের মূলে আঘাত পড়ছে বুঝতে পারলে সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া ভয় অনেক সময় সংক্রামক। কিছু লোককে একদিকে ছুটতে দেখলে এবং তারা ভয় পেয়েছে মনে করলে অন্যান্য পথচারীরাও পলায়মান দলের অনুগামী হয়। কি ঘটেছে কেন ওরা ছুটছে, সত্যিকারের কোনো বিপদ দেখা দিয়েছে কিনা এসব প্রশ্ন তাদের মনে জাগে না। পরে হয়তো তিনি জানতে পারলেন যে দুটি ষাঁড় দাঁড়িয়ে শিং-এ শিং লাগিয়ে লড়াই করছিল অথবা বাজারের মধ্যে একজনকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে এই গুজব শুনেছিলেন। এইভাবে ভয় পাওয়া ব্যক্তিরা হিস্টিরিক রোগীর মত অনেক সময় হিংস্র হয়ে উঠতে পারেন। নিরীহ মানুষকে আঘাত করা, পথের পাশের দোকানের শো-কেস ভেঙ্গে ফেলা ইত্যাদি উন্মত্ত আচরণ এদের করতে দেখা যায়। এরা কোনদিক থেকে বিপন্ন সেটা ঐ অবস্থায় বিচার করা বা যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করা ভয়ের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার অবস্থায় থাকেন না। যদি গুজব রটে যে বাজারে 'ছুরিকাহত' ব্যক্তিটি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহলে সামনে অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত কোনো ব্যক্তিকে দেখলে তাকে বড়দরের আঘাত করতেও কুণ্ঠিত হন না। সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দাঙ্গার সময় এই ধরণের অনেক ব্যাপার ঘটে থাকে বলে আমরা জানি। এই ধরণের হিস্টিরিক ভয় তখনই বেশী ঘটে যখন রাষ্ট্র, প্রশাসক ও সমাজের সংরক্ষকরা দুর্বল এবং সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে অসমর্থ ও অক্ষম।

আমরা রোগীদের আত্মীয়স্বজন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে এই লেখায় যথাসাধ্য সহজ ভাষায় বড়দের মনের অসুখ (psychosis) এবং মৃদু ধরণের মনের রোগ (neurosis) সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আশা করি আমাদের উদ্দেশ্য কিছু অংশে অন্ততঃ সাধিত হবে। তত্ত্বকথা তুলিনি, কিন্তু মনের রোগ সম্পর্কে যে সব ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে দু'একটি কথা না বললে বোধ হয় আমাদের কী

কর্তব্য সেটা ঠিক করতে গিয়ে আমরা রোগীর উপকারের পরিবর্তে হয়তো অপকার করে বসতে পারি।

শিক্ষিত সাধারণ যাঁরা বেশী পড়াশুনা করেন তাঁরা অবশ্যই ভূতপ্রেত বা মারণ উচাটনে বিশ্বাসী নন। তাঁদের মধ্যে কিছু আবার বড়দরের মনের রোগকেও ঠিক রোগ বলে মনে করেন না। এরা সংখ্যায় অল্প হলেও এদের প্রভাব তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিউস পন্থী (মার্কিউস আমেরিকার একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিপ্লবে Lumpen-Proletariat-রা প্রধান ভূমিকা নেবে এই অভিমত প্রচার করেছেন) কিছু মনোরোগ চিকিৎসক দুটি বা তিনটি আন্তর্জাতিক অতিবামপন্থি সমাবেশে এই বক্তব্য বেশ জোরের সঙ্গে পেশ করেছিলেন যে স্কিজোফ্রেনিকরা আসলে রোগগ্রস্ত নয়। তারা আমাদের সমাজের শোষণ ও বঞ্চনার বিরোধী হওয়ায় সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তাই পিতামাতা ও সমাজ রক্ষকরা একদল চিকিৎসকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এক জটিল ব্যাধির লেবেল এদের গায়ে এঁটে দিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য সমাজবিরোধীদের অ্যাসাইল্যাম্ বা ঐরকম কোনো জায়গায় সরিয়ে রাখা এবং এই সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এইসব মনোরোগী চিকিৎসক উন্নত দেশের বাসিন্দা, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশেও দু'একটি সংস্থা ঠিক এই ধরনের না হলেও প্রায় এই রকমের মতবাদে খানিকটা বিশ্বাসী। তাদের মতে স্কিজোফ্রেনিয়ার মত গুরুতর ব্যধিতেও চিকিৎসা বা ওষুধের কোনো ভূমিকা থাকা উচিত নয়। সুস্থ বলে পরিগণিত লোকদের সঙ্গে সন্ধ্যার বা রাত্রে মেলামেশা করলেই তথাকথিত রোগগ্রস্তরা নিজেদের ঠিকমত চালিয়ে নিতে পারে। এদের এই ধারণা আমরা—চিকিৎসকরা—মেনে নিতে পারি না।

এইবার, এই রোগ সারে না, চিকিৎসা করে কোনো লাভ নেই, কিছুদিন ভাল থেকে আবার রোগ হবে—এই ধারণায় যারা বিশ্বাসী তাদের উদ্দেশ্যে দু'চার কথা বলছি। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে স্কিজোফ্রেনিক রোগীদের রোগ সারার পরেও বেশ কিছুদিন ওষুধ খাবার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। এই ব্যবস্থা সুস্থ হলে রোগী এবং তার আত্মীয়রা অনেক সময় মেনে নিতে পারেন না। এর ফলে পুনরাক্রমণ ঘটে। অনেক শারীরিক ব্যাধিতে (ফুসফুসের যক্ষ্মা যার মধ্যে প্রধান) ভাল হবার পর ও ওষুধ চালিয়ে যাবার বিধান বিশেষজ্ঞরা দিয়ে থাকেন। ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের রোগ প্রভৃতি আরও কিছু ব্যাধিতে অনেক ক্ষেত্রে সারা জীবন ওষুধ খাবার ব্যবস্থা দেন চিকিৎসকরা। এই ব্যবস্থা রোগী এবং তাদের আত্মীয়স্বজনেরা প্রায়ই নির্দ্বিধায় পালন করেন, কেননা কিছুদিন ওষুধ বন্ধ করলেই তারা রোগ উপসর্গজনিত কষ্ট অনুভব করেন। মনের অসুখের বেলায় বোধহয় সেই মধ্যযুগের সংস্কার এখনও প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের

২

মধ্যে বিদ্যমান। তাই চিকিৎসকের বিধানের প্রতি এই অবহেলা। এছাড়া স্কিজোফ্রেনিক রোগীর প্রতি আচার ব্যবহারে মাতাপিতা ও আত্মীয়রা দু'ধরণের ভুল করে থাকেন ; এক রোগী সুস্থ হয়েছে, সবল রয়েছে, কাজেই আগে যতটা কাজের ভার তার উপর ছিল ততটাই সে এখন বহন করতে পারে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তার মস্তিষ্ক কোষ যখন দুর্বল তখন তাকে বোঝা বহনের নির্দেশ দেন ; দুই—অতিসাবধানী মাতাপিতা রোগীকে সুস্থ অবস্থাতেও সে যে আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক নয় এইরকম মনে করেন এবং তাকে কোনো কিছু দায়িত্ব বা কাজ না দিয়ে সে যে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও হীনশক্তি এইটা তাকে বুঝিয়ে দেন। উপযুক্ত দুই কারণেই রোগী কমমাত্রায় ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এটা তাদের অজ্ঞতা নয়, স্বেচ্ছাকৃত আচরণ। ডাক্তাররা রোগীকে রোগমুক্ত বলে ঘোষণা করার পরে এ সম্পর্কে তাদের যথাযথ নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এইরকম ঘটে। এ বিষয়ে চিকিৎসক বা দরদী মানুষের আরও ভাবনা-চিন্তার অবকাশ আছে। চিকিৎসিত রোগীদের ভাল রাখতে হলে তাদের আশেপাশে যারা আছে তাদের সংস্কার এবং মতান্ধতার অবসান অতীব প্রয়োজন।

১

প্রৌঢ়ার অবসন্নতা

'আমি চলে যাব তীর্থ পথিক তিমির তমসা-তীরে' —অচিন্ত্যকুমার

—আমার স্বামী অবসর নিয়েছেন, ছেলে দুটি ভাল কাজ পেয়েছে—স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে আছে। মেয়ে দুটির-ও ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছি তাদের জীবনে কোনো জটিলতা নেই ; এবার আমি অবসর চাই। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি খুঁজে পেলেন আমার স্বামী ? আমি আপনার রোগী নই। আমাকে ছেড়ে দিন। একটা বয়সে সবাইকে অবসর নিতে হয়।

—আমি আপনাকে তো ধরে আনিনি, ধরে রাখছিও না। মিঃ গোস্বামী বললেন, আপনি গত কয়েক মাস ধরে ধীরে ধীরে সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন, কোনো ব্যাপারে আর আপনার মন নেই। আপনাদের নতুন বাড়ী হল, দুদিন বাদে গৃহপ্রবেশ, বিদেশ থেকে বড় ছেলে ছুটি নিয়ে এসেছে, হায়দ্রাবাদ থেকে মেয়ে-জামাই এসেছে অথচ আপনি নাকি একেবারে নির্লিপ্ত। তাছাড়া ঘুম হচ্ছে না, খিদে নেই, অল্পেতে রেগে যাচ্ছেন—

বাধা দিয়ে মিসেস গোস্বামী বলে উঠলেন : বাজে কথা বলেছেন মিঃ গোস্বামী। ঘুম হবে না কেন ? আমি কাজ করছি, হাতে জরুরী কাজ আছে, ঘুমোবার সময় পাচ্ছি না। আমার স্বামী, এইতো কয়েক মাস আগেও, গাদা গাদা ফাইল অফিস থেকে বাড়ীতে এনে রাত দুটো অবধি জেগে কাজ করতেন। তখন কি আমি তাঁকে ধরে মনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছিলাম ?

মিসেস গোস্বামীর বয়স পঞ্চাশের ওপরে, রোগা ছিপছিপে লম্বা চেহারা, দাঁত পড়েনি, চুল পাকেনি। দেখে মনে হয় না যে তিনি চারটি সন্তানের জননী, চারটি নাতি-নাতনীর-দিদিভাই। গোস্বামী বছরখানেক হল চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন, ষাটের কোঠা ছুঁয়েছেন, শক্তসমর্থ দোহারা চেহারা দেখে মনে হয় 'একসটেনশন' পেলে আরো বছর দশেক বাদুড়ঝোলা হয়ে অফিসে যাতায়াত করতে পারেন। স্ত্রীর কথার উত্তর তিনিই দিলেন : আহা সেতো দরকারী কাজ, আর আমি বহু বছর ধরেই তো ফাইল বাড়ী নিয়ে আসছি। আর তুমি সারা রাত ধরে যে সব কাজ কর, তা আগে কোনোদিন করতে না ; ওগুলো বাজে, আই মিন, শখের কাজ, ওগুলো রাত জেগে করবার কাজ নয়।

—তোমার কাছে বাজে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে দরকারী ; খুবই দরকারী। তোমার সঙ্গে আমার রুচি মিলছে না, তোমার মনের মত হয়ে

আমি চলছি না, তার মানে এই নয় যে, আমি মনের অসুখে ভুগছি—বেশ ঝাঁঝালো সুরেই কথাগুলো বললেন মিসেস গোস্বামী। তার পরই হঠাৎ গলা নামিয়ে অন্য সুরে বললেন: আমি যে পারি না, ঐ সব না করে পারি না। ভেতর থেকে কে যেন তাগিদ দেয়, আমাকে বাধ্য করে, আমাকে তাড়িত করে। আমি পারছি না, তোমাদের এই সংসারে আমি আর থাকতে পারছি না, আমাকে ছুটি দাও। চৌত্রিশ বছর ধরে তোমাদের জন্যে। তোমাদের ইচ্ছেমত কাজ করেছি, এবার আমাকে ছুটি দাও, আমার রুচিমত কাজ করতে দাও, আমাকে নিজের ইচ্ছেমত চলতে দাও।

—তোমার কোনো কাজ, কোনো অভিলাষে আমি তো কখনও বাধা দিইনি। যখন যখন যা চেয়েছ তাই পেয়েছ। যা বলেছ, তাই করেছি।

—কারণ, এতদিন তুমি যা চাও আমি তাই চেয়েছি, তুমি যা বল আমি তাই বলেছি, তুমি যা বিশ্বাস কর আমি তাই বিশ্বাস করেছি। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে, চাওয়া-পাওয়া, বিশ্বাস অবিশ্বাস দিয়ে আমাকে ঘিরে রেখেছিলে। এতদিন আমি জানতাম না আমি কে আমি কি চাই, আমার জায়গা কোথায়। তাই বাধা দাওনি। আজ আমি জেনেছি আমি কে, আজ আমি টের পেয়েছি আমি কি চাই। আমার ইচ্ছেমত চলতে যাচ্ছি তাই বাধা দিচ্ছ, আমার রুচিমত কাজ করছি তাই পাগল বলছ।

স্ত্রীর কথার কোনো জবাব না পেয়েই বোধ হয় গোস্বামী হতাশ হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বাইরে যেতে বললাম। তিনি বেরিয়ে যেতে মিসেস গোস্বামীকে প্রশ্ন করলাম: কি আপনার ইচ্ছে মিসেস গোস্বামী? কোথায় আপনি বাধা পাচ্ছেন?

মিসেস গোস্বামী চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেণ্ড কি যেন ভাবলেন, তার পর নরম গলায় থেমে থেমে বলতে লাগলেন: আমি 'রিটায়ার' করতে চাই। আমি ছুটি চাই। অনেক অনেক বছর ধরে ঘানি টেনেছি, পাথর ভেঙেছি, সবজিবাগানের জন্যে জল তুলেছি। এই দেখুন আমার দু হাতে কড়া পড়ে গেছে; এই দেখুন, আমার পায়ে বেড়ির দাগ। আমি কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেতে চাই, সংসার থেকে মুক্তি চাই। সেই মুক্তি, ছেলে মেয়ে স্বামী, কেউই দিতে চান না। তাঁরা বলেন, আমি নাকি প্রলাপ বকছি। আর আমার ভাল লাগছে না। আমার চারদিকের বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, আমি মুক্ত বাতাস চাই।

—আপনি বিশ্রাম চান—এইতো? গৃহপ্রবেশ হয়ে যাক, তারপর কর্তা-গিন্নী দুজন বেরিয়ে পড়ুন। মাস ছয়েকের একটা প্রোগ্রাম করে যেখানে খুশী ঘুরে বেড়ান। এখন তো আর আপনার জন্যে কিছু আটকে থাকবে না।

সুন্দর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল ওঁর পাণ্ডুর মুখে।—দুজনে বেড়াতে

গেলে ২ঘন থেকেই যাবে; মিঃ গোস্বামীই বেড়াবেন, আমি তাঁর খেয়াল মেটাব: আর তল্পী বইব। না, সে আমি চাই না।

—তবে ছেলেদের কারুর সঙ্গে তাদের চাকরীর জায়গায় চলে যান। তারা কি আপনাকে নেবে না।

—তাদের কথাই তো আপনি বলছেন। একজন বলছে কানাডায় চল; অন্যজন বলছে আসছে মাস থেকে ছুটি নিয়ে সে আমার পছন্দমত যে কোনো জায়গায় যেতে রাজী। বউমাদেরও আপত্তি নেই! মেয়ে বলছে হায়দ্রাবাদের মত শহর নাকি ভারতে নেই।

—ছেলেমেয়ে আপনাকে খুবই ভালবাসে। তাহলে। আপনি কোনা জায়গা পছন্দ করেন?

আবার সেই হাসি। খুবই করুণ দেখাল মিসেস গোস্বামীকে। এখনও তাঁকে আমি বুঝতে পারছি না। গোস্বামীর কাছে যা শুনেছি ওঁর সঙ্গে কথা বলে তা সত্যি মনে হচ্ছে না। মিসেস গোস্বামীকে অসুস্থের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা!—ভেবে ঠিক করতে পারছি না। একটি মহিলা বিয়ের পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর সংসার করেছেন; চারটি ছেলেমেয়েকে বড় করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বিয়ে দিয়েছেন। তারাও বেশ সুখেই সংসার করছে। মাত্র কয়েক বছর আগে একটা শোক পেয়েছিলেন—ওঁর দাদার একমাত্র ছেলে স্কুলে যাবার পথে হারিয়ে যায়, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মা-হারা ছেলেটি পিসীর কাছে মানুষ হয়েছিল। সেই সময় কয়েক সপ্তাহ মিসেস গোস্বামী নাকি স্নানাহার ছেড়ে দরজাজানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন। সে সময় অনেক অল্পবয়সী ছেলে রাস্তাঘাট থেকে হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে যেত; কারুর কারুর মৃতদেহ পাওয়া যেত, কারুর আবার কোনো সন্ধানই মিলত না। সে শোক তিনি কাটিয়ে উঠেছেন, তার পর ছোট মেয়ের খুব ঘটা করে বিয়ে দিয়েছেন জাঁকিয়ে সংসার করেছেন। তাঁর জীবনে আর কোনো দুঃখ শোকের ইতিহাস নেই। মা-বাবা শৈশবেই মারা যান; তাঁদের কথা ভাল করে মনেই পড়ে না। জ্যাঠামশাই বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর থেকে একটানা স্বামীর ঘর করেছেন। সরকারী চাকরী করতেন গোস্বামী, ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে, বিভাগীয় বড়কর্তা হয়ে কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। ভদ্রলোককে অমায়িক বন্ধুবৎসল কর্তব্য-পরায়ণ বলেই সকলে জানে। তবে অফিসার হিসেবে বেশ বড়ো এবং মতামতের দিক থেকে বেশ গোঁড়া। হিন্দুশাস্ত্র, লোকাচার, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছেন; অবসর নিয়ে অথর্ববেদের বাংলা অনুবাদ লেখায় ব্যস্ত। নিজের বিভাগে এবং নিজের পরিবারে যতদূর সম্ভব নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ-ব্যাপারে কোনো বাধা পেলে তিনি মানতে চাইতেন না। ছেলেমেয়ের মতামত তিনি তা-বলে উড়িয়ে দিতেন না;

বেদ পুরাণ উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের অভিমতের সপক্ষে তিনি এমন জোরালো যুক্তি খাড়া করতেন যে তারা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারত যে তারা ভুল করেছে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় সব ব্যাপারেই তিনি একমত ছিলেন। তার অসাক্ষাতে ছেলেমেয়েরা মাকে বলত—'হিজ মাস্টারস ভয়েস'। ছেলেমেয়ে কি পড়বে, কোন চাকুরী নেবে, কার কোন্‌দিকে উন্নতির সম্ভাবনা—এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য ছেলেমেয়েরা জেনেছে মায়ের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করেই বাবা পথ নির্দেশ করেছেন। তারা প্রতিবাদ করেনি, আর তাদের এখনও মনে হয় বাবা সঠিক পথই তাদের জন্যে বেছে দিয়েছেন। বিয়ের ব্যাপারেও পিতার মতই যুক্তিযুক্ত মনে করে তাদের সায় দিতে হয়েছে। এজন্য তারা দুঃখিত নয়, তাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলেও তারা মনে করে না। এ পর্যন্ত এই রকমই চলে এসেছে। একনায়কত্ব পারিবারিক শান্তিরক্ষার সহায়ক হয়েছে, কোনো দিকে বিদ্রোহ-অসন্তোষের চিহ্ন দেখা যায়নি। গোলমাল ঘটেছে মাত্র কয়েক মাস আগে। মাঝারী ধরনের বাড়ীর নকসাটা ছোট ছেলে পছন্দ করেছে। স্ত্রীর সামনে ধরে গোস্বামী তাঁর অভিমত চাইলেন। নকসার দিকে না তাকিয়ে চা ছাঁকতে ছাঁকতে তিনি যে জবাব দিলেন, তার জন্যে গোস্বামী আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন: কিন্তু তুমি তো পেন্সিল স্কেচটা পছন্দ করেছিলে, তাইতো আমি ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করে মিউনিসিপালিটিতে জমা দিলাম। এখন তা বদলাতে গেলে অনেক হাঙ্গামা।

বদলাবার কথা বলিনি, পছন্দ হয়নি তাই বলেছি। এই বলে চায়ের কাপটা নিয়ে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। উঁচু গলায় ঘর থেকে বললেন, শুধু নকসা নয়, নামটাও পছন্দ হয়নি।

—কিন্তু তখন তো ছেলেমেয়ে সবার সামনে এই নামই ঠিক হল, তুমিও তো মত দিলে।

—মত দিইনি, তুমি জোর করে আদায় করেছ। যেমন এ-যাবৎ অন্য সব বিষয়ে করে এসেছ।

এ ধরনের প্রতিবাদ এই প্রথম শুনলেন গোস্বামী। চায়ের কাপটা মেঝেতে ছুঁড়ে মারলেন। ঘর থেকে কোনো সাড়া এল না। আগে হলে মিসেস গোস্বামী ছুটে এসে কাপের টুকরোগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে জোড়া লাগানোর কথা ভাবতে বসতেন। স্ত্রীর এই ঔদাসীন্য গোস্বামীর সহ্য হল না। তিনি এবার ঘরে ঢুকে চড়া গলায় বললেন: 'তোমার নামে বাড়ীর নাম হবে—এতো অনেক দিন ঠিক হয়ে আছে। এতে তোমার আপত্তি কেন? না, এ আপত্তি মানতে রাজী নই, আর নকসা পাল্টানোও এখন তো সম্ভব নয়।' কথার কোনো জবাব এল না ঐ তরফ থেকে। মিসেস গোস্বামী তখন ছোট মেয়ের

সেতারটা টেনে নিয়ে পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ টুং টাং শুরু করেছেন। তাঁর চড়া গলায় আকৃষ্ট হয়ে ছোট ছেলে, ততক্ষণে ওপরতলা থেকে নেমে এসেছে। ছোটবউ রান্নাঘর থেকে সব শুনছিল, সেও এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। সবাই বিস্মিত, হতবাক।

এ-দৃশ্য ছেলে বউ কোনো দিন দেখেনি। গোস্বামীর মনে পড়ল, বিয়ের পর প্রথম এইভাবে মীনাক্ষী (মিসেস গোস্বামী) সেতার বাজাতেন। স্বামী বা শাশুড়ীর কাছ থেকে উৎসাহ পেতেন না, তাঁরা ভাবে ভঙ্গীতে জানিয়ে দিলেন যে বিবাহিত মেয়েদের এই সব বাজে কাজ তাঁরা পছন্দ করেন না। যদিও বিয়ের কনে পছন্দ করার পর্বে মীনাক্ষীকে সেতার বাজানোর পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এরপর শাশুড়ী গত হলেন, একের পর এক আগন্তুকদের শুভাগমন হতে থাকল, সেতার বাক্সবন্দী হয়ে ক্রমশ শোবার ঘর থেকে সিঁড়ির তলার আজেবাজে জিনিসের মধ্যে ঠাঁই পেল। বাড়ীর নকসা দেখানোর দিন থেকে মিসেস গোস্বামীর কিছু কিছু অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করতে লাগলেন বাড়ীর সকলে। রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের চাবি খুলে ছোটবউ এর আঁচলে বেঁধে দিলেন, স্বামীপুত্রের খাওয়ার সময় অনুপস্থিত হতে লাগলেন, চা জলখাবার খাওয়া ছেড়ে দিলেন। গৃহস্থালীর জোয়ালটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলেন।

তিনি ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন। এই ইতিহাস মিসেস গোস্বামী কিছুটা বলেছিলেন আর কিছুটা শুনেছিলাম পুত্রবধূর মুখে। একটানা সংসার চালিয়ে যদি তিনি হাঁপিয়ে উঠে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটাকে ঠিক অস্বাভাবিক বলা যায় কি? এবার মিসেস গোস্বামীর কথা শুনুন।

হ্যাঁ, ভাল আমাকে সবাই বাসে। ছেলেমেয়ে স্বামী সবাই। দাদা বুড়ো হয়েছেন, তবু সপ্তাহে অন্তত একদিন ব্যারাকপুর থেকে আমাকে দেখতে আসেন। অভাব-অনটন কোনো দিনই ছিল না, এখনও নেই। যেখানে যেতে চাই ছেলে জামাই সেখানেই নিয়ে যেতে রাজী। কিন্তু ওরা পারবে না।

—কি পারবে না?

—আমি যেখানে যেতে চাই সেখানে ওরা নিয়ে যেতে পারবে না।

—অনেক দূরে বুঝি? কতদিন লাগবে যেতে? জায়গাটা কোথায়?

কাঁধের ঝোলা থেকে খানকয়েক কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন: জায়গাটা ওরা চেনে না। আমি জানি জায়গাটা কেমন, কিন্তু কোথায় কিভাবে যেতে হয় তা জানি না। জায়গাটার কয়েকটা স্কেচ এঁকে রেখেছি। দেখুন তো, আপনি যদি চিনতে পারেন, পথ বলে দিতে পারেন।

—কাগজে আঁকা ছবিগুলো নানা দিক থেকে দেখবার ও বোঝবার চেষ্টা করলাম। ছবি আঁকার হাত আছে মিসেস গোস্বামীর; কিন্তু কেমন যেন উদ্ভট, অদ্ভুত ছবিগুলো। সব কটা ছবিতেই দুটো জিনিস স্পষ্ট আর সবই

অস্পষ্ট ঝাপসা। মরুপথ দিয়ে একটি মেয়ে হেঁটে চলেছে, কাঁধে ঝোলা, পরনে কালো রং-এর শাড়ি, হাতে একখানা পর্যটকের লাঠি। তার লক্ষ্য দূরের একটা পাহাড়, ধূসর পাথরগুলো সূর্যাস্ত আভায় ঈষৎ রক্তাভ। কিন্তু সব থেকে বেশি করে চমক জাগায় একটা বিরাট গুহা, ভিতরটা অন্ধকার। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় পাহাড় থেকে নেমে আসা কয়েকটা জলধারা গুহাপথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্কিজোফ্রেনিকের আঁকা কিছু ছবি আমি দেখেছি; কিন্তু সেগুলোতে এমন নিপুণ তুলির আঁচড় নজরে পড়েনি। গুহাটা দেখলে সত্যিই ভয় হয়—যেন একটা বিরাট জন্তুর মুখগহ্বর।

—তমসা বলে একটা নদী আছে, তাই নয়? নদীটা কোথায় আপনি জানেন কি? জানেন না। না, আপনাকে গুরু করা হল না। আমি গুরুবাদে বিশ্বাস করি না। আমার পথ আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তমসার তীরে আমাকে যেতে হবে, একা একা পথ খুঁজে। আমি এই সব ছবি আঁকি তাই ওরা বলে আমি পাগলা। আচ্ছা পাগলে কি ছবি আঁকে?

—সারা রাত ধরে ছবি আঁকলে আর সেতার বাজালে লোকে ও-রকম ভাবতে পারে। অনেক মহান শিল্পীকে তাঁদের জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষ পাগল ভেবেছে।

—আমি যে না এঁকে পারি না। না বাজিয়ে পারি না। তবে সারারাত নয় ভোর পাঁচটা অবধি। ছোটঘরে দরজা জানালা বন্ধ করেই বাজাই। আমি ছাড়া সেতারের শব্দ আর কেউ শোনে না। যত আঁকছি তত আমি অভীষ্ট পথে এগিয়ে চলেছি, জায়গাটার চেহারা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গভীর রাতে যখন বাগেশ্রী বাজাই, তমসা তখন আমার কাছে চলে আসে। তার ছলছল কলকল শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। মিলনের জোয়ার তমসার বুক থেকে আমার বুকে এসে ধাক্কা মারে। আমাকে যেতে হবে সেখানে, যেখানে তমসা পাহাড় থেকে উঠে আবার পাহাড়ী গুহার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। যাবার চেষ্টায় মরুভূমির বালিতে গিয়ে পথ হারায়নি। আমার মত ভুল করেনি। আপনি চেনেন তমসা? তবে ছবিগুলো দিন। আমি ক্রমশ পথ দেখতে পাচ্ছি। দুচার দিনের মধ্যে ঠিক পথ খুঁজে পাব। তখন বেরিয়ে পড়ব। আর কোন বন্ধন থাকবে না আমার। পিছনে তাকাবো না আর। এগিয়ে যাবো মুক্ত জীবনের পথে।

একটানে ছবিগুলো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঝোলায় পুরে মিসেস গোস্বামী বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার গোস্বামী এবার ঘরে ঢুকে খুসীমনে বললেন: ও চিকিৎসা করতে, ওষুধ খেতে রাজী হয়েছে। কবে আবার আসতে হবে জানতে চেয়েছে। সপ্তাহ খানেক বাদে? দশদিন হলে কি কোনো ক্ষতি হবে? তা হলে তাই আসব। রথযাত্রার দিন গৃহপ্রবেশ করব ভাবছি। 'মীনাক্ষী

ভবন' নামের প্লেটটা আজ বসানো হবে। —তৃপ্তির হাসি হেসে গোস্বামী বিদায় নিলেন।

রথের দিন খবর পেলাম, আগের দিন ভোর থেকে মিসেস গোস্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট্ট নাতিটাকে বলে গেছেন তার জন্যে তমসার জল আনতে চলেছেন। জল নিয়েই ফিরে আসবেন। আমার দেওয়া ওষুধগুলো তাঁর ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেছে, একটা বড়িও তাঁর পেটে যায়নি। এতদিনে তিনি ইচ্ছেমত পথে বেরিয়ে পড়েছেন। মুক্তির ডাকে সংসারের সব বন্ধন ক্রমশ আলগা হয়ে ছিঁড়ে পড়েছে। নাতির বিশ্বাস দিদিভাই তমসার জল নিয়ে ঠিক একদিন ফিরে আসবেন।

২

একটি বালকের বেদনা

অধ্যাপক-দম্পতি তাঁদের দশ বছরের ছেলেটিকে নিয়ে খুবই মুস্কিলে পড়েছেন। ছেলেটিকে দেখতে সুশ্রী, স্বাস্থ্যও ভাল। মুস্কিল দেহ নিয়ে নয়, মন নিয়ে। তিন বছর আগেও এই পুত্রটির জন্যে তাঁরা গর্ব অনুভব করতেন। স্কুলের শিক্ষকেরা অধ্যাপক-দম্পতিকে স্পষ্টই বলতেন : বেঁচে থাকলে ছেলেটি আপনাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র অলক অষ্টম শ্রেণীর ছেলেদের অঙ্ক অনায়াসে করতে পারে, নির্ভুল ইংরিজি লিখতে পারে। বাড়ীতে বাবা পড়াতেন অঙ্ক, মা ইংরিজি। স্কুলের পড়া শেষ করে বাবার কাছে সে উঁচু ক্লাসের অঙ্ক শিখত, মায়ের কাছে বড় বড় সাহিত্যিকদের লেখা নামকরা উপন্যাসের কাহিনী শুনত। গোলমাল বেধেছে ঠিক তিন বছর আগে থেকে ছোট বোনটির জন্মের পর থেকে। অলক পড়াশুনায় ক্রমশ অমনোযোগী হয়ে উঠতে লাগল, নানা অছিলায় স্কুল কামাই করতে আরম্ভ করল। জোর করে স্কুলে দিয়ে এলেন বাবা। কিছু দিন পরে জানলেন ছেলে স্কুল পালিয়ে বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ খারাপ সিনেমা দেখছে। মায়ের ব্যাগ থেকে পয়সা সরাচ্ছে, এটাও বোঝা গেল। পরীক্ষার ফল হল খুব খারাপ। স্কুল বদলানো হল কিন্তু ছেলের মন বদলালো না। মা-বাবা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এর আগে যাকে কোনো দিন একটি কড়া কথা বলার প্রয়োজন হয় নি তাকে বকলেন, ভয় দেখালেন : চড়-চাপড়ও দিতে লাগলেন। এর ফলে তার দুষ্টুমি-নষ্টামি বেড়েই চলল। স্কুলে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিল। মা-বাবার চোখের সামনেই ছোট বোনটাকে নানাভাবে বিরক্ত করতে লাগল। ঘুমন্ত শিশুটিকে খোঁচা মেরে, চিমটি কেটে কাঁদাতে পারলে তার চোখমুখে একটা উল্লাসের ভাব ফুটে উঠত, অন্য সময় সেই সাত-আট বছরের ছেলেটির মুখেচোখে দেখা যেত অপ্রসন্ন বিরক্তির ভাব। পাছে বাচ্চাটির কোনো ক্ষতি করে—এই ভয়ে পালা করে বাবা এবং মা কলেজ কামাই করে শিশুকন্যার পাহারায় থাকতেন। কিন্তু এমন ভাবে তো চিরকাল চলে না। বাড়ীতে বাচ্চাটিকে দেখাশুনার জন্যে মাঝবয়সী যে বিধবাটি ছিলেন, তাঁকে অলক আদৌ সমীহ করত না। দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময় অলকের মা অলকের তত্ত্বাবধানের জন্য দেশ থেকে স্বামীর এক বৃদ্ধা পিসীকে নিয়ে আসেন। তিনি মাস কয়েক থেকে দেশে ফিরে গেছেন। উপায়ান্তর না দেখে

বাবা-মা অলককে একটা ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্দী করে কলেজ যেতে শুরু করলেন। এর পর তাকে কোলকাতার উপকণ্ঠে এক আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলল। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কড়া তাগিদে ঘরের ছেলেকে আবার তাঁরা ঘরে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলেন। সমস্যার সমাধান হল না। উপরন্তু দেখা গেল কয়েক মাস বোর্ডিংয়ের বাসিন্দা হয়ে সে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়েছে। বাবা-মা প্রমাদ গনলেন। অনেক বন্ধুবান্ধবের পরামর্শ নিলেন, অনেক চিকিৎসকের কাছে দরবার করলেন। এবং দু'বছরে এ সম্পর্কিত যাবতীয় লিটারেচার পড়ে শেষ করলেন অধ্যাপক-দম্পতি। সেই সঙ্গে বন্ধুদের পরামর্শে, চিকিৎসকদের সদুপদেশে ও বিভিন্ন দেশের মনস্তাত্ত্বিকদের নির্দেশানুযায়ী শায়েস্তা-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না।

কেন ফল হল না? বাবা, মা ও অলকের সঙ্গে কয়েকদিন ধরে কথাবার্তা বলার ফলে ব্যাপারটা খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাবা ও মা প্রায় একই ধরণের কথা বললেন। তাঁদের মধ্যে সব বিষয়েই মতৈক্য। তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই রকম: অলক সবদিক থেকে আদর্শ বালক ছিল। আদর্শ বালক হিসেবেই সে বেড়ে উঠতো যদি না আমরা পিসীকে দেশ থেকে এনে ওর তত্ত্বাবধানে লাগাতাম। পিসীমাই যত নষ্টের মূল। তিনি নিজে সব কিছু থেকে বঞ্চিত। বালবিধবা নিঃসন্তান। অল্পবয়সে আমার (বাবার) মা মারা যাবার পর—আমার লালন-পালনের ভার নিয়েছিলেন। গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা পর্যন্ত পিসীমা আমার অভিভাবকের মত ছিলেন। আমার জন্যে তিনি অনেক কিছু করেছেন। তাঁর প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু আমার ছেলেটির কানে বিষ ঢেলে তিনি আমাদের যে সর্বনাশ করেছেন তার জন্যে আমি তাঁকে আর কোনো দিন ভাল চোখে দেখতে পারব না। তাঁকে মাসে মাসে যে টাকাটা পাঠাই সেটা পাঠাব, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কোনো রকম সম্পর্ক রাখব না।

অধ্যাপকমশাই বেশ পড়াশুনো করেছেন। গণিত তাঁর নিজের বিষয়, তার বাইরেও তাঁর যাতায়াত আছে। আধুনিক মনস্তত্ত্বের অনেক পরিভাষা তাঁর জানা। মেপে, ঠিক শব্দ বাছাই করে থেমে থেমে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত পেশ করলেন। খুব আস্তে কথা বলেন, নিঃশব্দে চলাফেরা করেন, কদাচ মুখে হাসি ফোটে। বললেন: পিসীমা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমার বাবাকে দায়ী করতেন। আমার বাবা নাকি পিসেমশায়ের চিকিৎসায় সুবন্দোবস্ত করেন নি বলে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটেছে। এই অভিযোগ শৈশবে তাঁর মুখে বহুবার শুনেছি। আমাদের বিয়ের পর কয়েক মাস তিনি আমাদের সঙ্গে কোলকাতায় বাসায় ছিলেন। আমাদের জীবন সেই কয়মাসেই অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

জানানো উচিত, আমাদের মানে আমার স্ত্রী ও আমার মধ্যে বিয়ের আগে থেকে পরিচয় ছিল। স্ত্রী আমার থেকে কয়েক বছরের জুনিয়র। ওকে গণিতে 'কোচ' করতে গিয়ে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমাদের বিয়েতে পিসীমার মত ছিল না। নানা ভাবে আমার স্ত্রীকে তিনি হেয় করার চেষ্টা করতেন। কাজেই তাঁকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হই। পিসীমার মনে ভালবাসা কিছু নেই, তিনি চান আধিপত্য। আমার ওপর আধিপত্য হারিয়ে অলকের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই তাকে আমাদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শিখিয়েছেন। আমাদের জব্দ করা আর অলকের ওপর আধিপত্য করা—দুই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ওকে বুঝিয়েছেন যে আমরা ওকে ভালবাসি না। আমাদের ভালবাসা সবটাই নাকি খুকুর জন্যে তোলা ছিল। অলকের এক মাস বয়সের সময় তাকে পিসীর হাতে তুলে দিয়ে আমার স্ত্রীকে কলেজ যেতে হত। কারণ চাকরীতে তখন সবে বহাল হয়েছে, ছুটি পাওনা নেই। খুকুর জন্মের পর ও তিন মাস ছুটিতে ছিল। এই ব্যাপারটাকেই ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে সাত বছরের ছেলেটার কানে তুলে ওর মনে বাপ-মায়ের প্রতি দারুণ ঘৃণার ভাব এনে দিয়েছিলেন। খুকুর জন্মের পর পিসীর হাতে তুলে না দিয়ে নিজেদের আওতায় রাখা নাকি আমাদের অলকের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের অকাট্য প্রমাণ।

অধ্যাপক তাঁর স্ত্রীকে পাশে রেখে কথাগুলো বললেন। অধ্যাপিকা মাঝে মাঝে শুধু ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালেন। একটি কথা নিজে থেকে বললেন না। স্বামীকে সব বিষয়েই ওকালতনামা লিখে দিয়েছেন মনে হল।

অলককে মুখ খোলাতে প্রথমটায় বেশ বেগ পেতে হল। পরে যখন মুখ খুলল—তখন আর থামতে চাইল না। অনর্গল কথা বলে গেল।

অলক: থামা (ঠাকুরমা) আমাকে বলেছে বলেই কি আমি বদলে গেছি? বাজে কথা। খুকুকে পেয়ে বাবা-মাই বদলে গেছে, আমাকে চায় না। আমাকে কেউ ভালবাসে না, থামাও বাসে না। খুকুটা একটু ভালবাসে, আমিও ওকে ভালবাসতে চাই। কিন্তু ওরা আমাকে খুকুটার কাছেই ঘেঁষতে দ্যায় না। ওরা পিসীকে বলে ডাইনি। আমাকে নাকি তুক করেছে।

বললাম: তুমি তো বাবার কাছ থেকে কত জিনিস পেয়েছ, মামণি-ও তো এই সেদিন—তোমার জন্মদিনে ক্রিকেটের ব্যাট উপহার দিলেন। তোমাকে কোলকাতার সেরা স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। অন্য স্কুলের থেকে তিনগুণ খরচা বেশি। তোমার যত বই আছে অত বই তোমার বয়সী কোনো ছেলের নেই। তবে কেন ভাবছ যে বাবা-মা তোমাকে ভালবাসেন না? ঐ বয়সের ছেলে হলে কি হবে, জবাবে সে বলল: জিনিস দিলেই ভালবাসা হয় না। আমি তো রোংরা ভিখিরীদের জিনিস, পয়সা দিয়ে থাকি। তা বলে কি আমি তাদের

ভালবাসি? দূর থেকে ছুঁড়ে জিনিস পয়সা দিয়েই পালিয়ে যাই। ওদের দেখলে আমার কেমন যেন লাগে। ওদের আমি একটুও ভালবাসি না। ভালবাসলে তো মা-বাবারা আদর করে গাল টিপে দেয়, কতরকম কথা বলে। খুকুকে ওরা ভালবাসে আমাকে বাসে না।

—তুমি যখন ছোট ছিলে তোমাকেও আদর করতেন, গাল টিপতেন, ছড়া শোনাতেন।

—না, আমার একটুও মনে পড়ে না। থামা বলেছে, আমাকে ফেলে রেখে সেজেগুজে মামণি পড়াতে চলে যেত। আমি দুষ্টুমি করব, ওদের বিরক্ত করব। বেশ করব, খুব করব। কিন্তু আমি খুকুকে মারব না—সত্যি বলছি খুকুকে মারব না। ওদের বলে দিন না খুকুর সঙ্গে আমাকে খেলতে দিতে। তা হলেই আমি ভাল হয়ে যাব।

অধ্যাপক-দম্পতির সঙ্গে পরের দিন কনফারেন্সে বসলাম। খোলাখুলি বললাম যে তাঁরা অলকের ওপর কিছুটা অবিচার করেছেন। শুধু জিনিস দিলে, অভাব মেটালে, ভাল স্কুলে পড়ালেই হবে না। ছোটদের মুখেও ভালবাসা জানাতে হবে। 'দে ডু নট্ লভ্ দোজ্ হু ডু নট শো দেয়ার লভ্'—শেক্সপীয়রের এই উক্তিটি সবার মনে রাখা দরকার।

অধ্যাপকমশাই মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানালেন। 'শো অফ লভ্' তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী নন। এতে ছেলেদের চরিত্র দুর্বল হয়, তারা স্বাবলম্বী হতে শেখে না। আগের দিনের যৌথ পরিবারে ছেলেদের অভাব মিটিয়েই অভিভাবকেরা কর্তব্য পালন করতেন, তাই উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আমাদের দেশে দৃঢ়চেতা পুরুষ জন্মেছে। আজকের 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে' বাচ্চা নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, 'শো অফ লভ'-এর আধিক্য ঘটছে—তাই এই জেনারেশনে মানুষের মত মানুষ দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

—ভালবাসা জানানোতে বাড়াবাড়ির কথা আমি বলছি না। তবে একেবারে নিক্তি মেপে ভালবাসা জানাতেও বলছি না। মেয়েটিকে আপনারা যে-ভাবে ভালবাসা জানাচ্ছেন, ছেলেটিকেও ছোটবেলা থেকে সেই ভালবাসা জানালে পিসীমার কথায় ছেলে বিগড়ে যেত না, বোনকে হিংসে করত না। আপনাদের শীতল ভালবাসা যতই আন্তরিক ও গভীর হোক না কেন, অলকের মনে তার সাড়া জাগছে না।

মেয়ে ও ছেলেকে একইভাবে মানুষ করা ঠিক? মেয়েদের একদিন পরের বাড়ী পাঠাতেই হবে, চিরকাল কাছে রাখা যাবে না।

অধ্যাপক-পত্নী সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গী করলেন।—তাছাড়া, ছেলেরা বড় হয়ে সমাজ পরিচালনার ভূমিকা নেবে, মেয়েরা তা নেবে না। ছেলেদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে যে দৃঢ়তা অবলম্বন দরকার, মেয়েদের বেলায় সেটার প্রয়োজন নেই।

বিরক্তি গোপন করতে পারলাম না।—বলেন কি? মেয়েদের সমাজ পরিচালনায় কোনো ভূমিকা নেই? আপনি কি বলেন মিসেস লাহিড়ী?

স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। স্বামী বললেন: ভূমিকা নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু সমাজে তাদের ভূমিকা হবে গৌণ, পরিবার পরিচালনায় তাদের ভূমিকা হবে মুখ্য। সেখানে পুরুষালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দরকার হবে না।

—কিন্তু মিঃ লাহিড়ী, আপনিতো নিজস্ব পদ্ধতিতে ছেলেকে মানুষ করেছেন। ফল দেখে কি আপনার মনে হয় নি যে আপনার পদ্ধতি সঠিক নাও হতে পারে।

—কোথায় একটা গলদ আছে নিশ্চয়ই, তাইতো আপনার সাহায্যপ্রার্থী। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পিসীমাই যত নষ্টের গোড়া—'ভিলেইন অফ্ দি পিস'।

লাহিড়ী-দম্পতি অবশ্য আর আসেন নি। একদিন মিসেস লাহিড়ী ফোনে একটু ত্রস্ত কণ্ঠে বলেছিলেন যে তিনি একবার একা আমার সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁর নিজস্ব কিছু বলবার আছে। ঐ পর্যন্ত। তিনি এখনও দেখা করার সময় পান নি।

এইবার অধ্যাপক-দম্পতির ভালবাসা সম্পর্কে ধারণা ও শিশু-পালন পদ্ধতি সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা চলে।

আমার মনে হয় অধ্যাপক লাহিড়ী তাঁর পিসীমার মতই (অবশ্য পিসীমা সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি সব তাঁর মুখে) আধিপত্য প্রয়াসী ও কর্তৃত্বাভিলাষী। সামন্ততান্ত্রিক কালের পিতাই তাঁর আদর্শ। পিতার সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করেন তিনি, তাঁর মুখেই শুনেছি। ঠিক আত্মকেন্দ্রিক নন, তবে অহম্মন্যতায় ভরপুর। বাইরে খুব মৃদু, ভেতরে খুব কঠিন। নিজের ও পুত্রের 'কেরিয়ার' তৈরীর দিকে তাঁর যত কিছু আগ্রহ। তিনি ভালবাসা চান না, আনুগত্যে খুশি। স্ত্রীকে তিনি ভালবাসেন কিনা সন্দেহ। তাঁর ছকে বাঁধা পথে চলতে না পারলে, তিনি কাউকেই ক্ষমা করবেন না। স্ত্রীটি সুন্দরী ও ভাল মানুষ। শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী তাঁর সম্মানবৃদ্ধি করেছে, বিবাহও তিনি ঐ কারণেই করেছেন। স্ত্রী স্বামীকে যতটা ভয়ভক্তি করেন, ততটা ভালবাসেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তাঁর নিজস্ব কোনো বক্তব্যই স্বামীর সামনে আমাকে বলতে সাহস পান নি। বাইরে থেকে মনে হতে পারে এঁরা আদর্শ দম্পতি, কিন্তু আমার বিশ্বাস অধ্যাপিকা লাহিড়ী সুখী নন।

লাহিড়ীর উদ্ভট মতামত ও ছেলে মানুষ করার পদ্ধতিই এই অবস্থার জন্যে প্রধানত দায়ী।

৩ আতঙ্কিত পৌরুষ

কাব্য-নাটক-ইতিহাসে মনের রোগের কাহিনী অনেক পড়েছেন, অনেক শুনেছেন। ঈডিপাস রেকস ও ইলেকট্রা অস্বাভাবিক অজাচার প্রবণতার চিত্র দেখে হয়তো চমকে উঠেছেন। অরেস্টেসে নাটকে পাপবোধ ও অনুতাপের তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে অলীক দর্শন ও অলীক শ্রবণের যে নাটকীয় বর্ণনা আছে, তা পড়ে বিস্মিত ও হতবাক হয়েছেন। ঈর্ষাপরায়ণ সন্দিগ্ধচিত্ত ওথেলোর পরিণতি আপনাদের ব্যথিত করেছে, লেডি ম্যাকবেথের স্বপ্নচারিতা ; বাধ্যতামূলক হাত ধোয়ার দৃশ্যে হয়তো বা মহিলাটির জন্যে মনের কোণে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও করুণার উদ্রেক হয়েছে। অতিবড় সনাতনপন্থী ও শৈবলিনী ও কিরণময়ীর উন্মত্ততা দেখে অন্তত সাময়িকভাবে এই দুই নারীর জন্যে সহানুভূতি বোধ করেছেন। এই সব মানসিক অসুস্থতার কাহিনী আপনাদের অভিভূত করলেও আপনারা এগুলোকে নিছক কাল্পনিক কাহিনী হিসেবেই নিয়েছেন। বাস্তব জীবনে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনেকেরই হয়তো মনে হয় নি। পাগলাগারদের অধিবাসীদের জীবনকাহিনী শোনবার প্রয়োজন বা সুযোগ যাঁদের ঘটেছে তাঁরা জানেন জীবনে অনেক সময় নাটকের থেকেও নাটকীয় ঘটনা ঘটে থাকে। তারই একটি আজ আপনাদের শোনাবো।

তার আগে পুরান ইতিহাসের পাতা থেকে দু'চারজন নামকরা কীর্তিমান পুরুষের অসুস্থতার কথা শোনানো, বোধ হয় খুব অস্বাভাবিক হবে না। গ্রীক-বীর হারকিউলেসের মৃগী রোগ ছিল। রোগের আক্রমণের সময় তিনি পুরোপুরি আত্মবিস্মৃত মারমুখী উন্মাদের মত আচরণ করতেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি নিজের ছেলে, ভাইপো, বন্ধু ও শিক্ষককে নিহত করেন। অ্যাজাকস্ উন্মত্ত অবস্থায় শত্রু মনে করে একপাল ভেড়ার গর্দান নেবার পর আত্মসচেতন হয়ে অনুতাপে আত্মহত্যা করেন। ভারতের পৌরাণিক রাজা কল্মাষপদের মানুষ খাবার কাহিনী আর ব্যাবিলনের রাজা নেবার্চাদনেজার-এর নিজেকে নেকড়ে মনে করার কাহিনী নিঃসন্দেহে অসুস্থ মনের কাহিনী। সক্রেটিস, ডেমক্রিটাস, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট—তিনজনেই মানসিক রোগে ভুগেছেন। তৈমুরলং মড়ার খুলি দিয়ে পিরামিড তৈরী করতে ভালবাসতেন। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো শেষ জীবনে সন্দেহবাতিকে ভুগেছিলেন। তিনি মনে

কয়েছেন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, প্রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য শত্রুর ভয়ে একবার লণ্ডনের এক হোটেলে মালপত্র রেখে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস না হয়, জেমস সি কোলম্যানের লেখা অ্যাবনরমাল সাইকোলজি অ্যাণ্ড মডার্ন লাইভ (ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৭২) পড়ে দেখতে পারেন। বেটোফেন, মোজার্ট, শুমান —কেউই মনের দিক থেকে সুস্থ ছিলেন না। বেটোফেন ও মোজার্ট দু'জনেই সন্দেহবাতিকের লোক ছিলেন। শুমান স্বর্গীয় আত্মার সঙ্গীত শুনতেন। বারবনিতার জন্যে নিজের কান কেটে তিনি কার যাত্রা ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন জানা নেই, তবে এটা যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ সেটা সবাই জানেন। শোপেনহাওয়ার, জন স্টুয়ার্ট মিল মাঝে মাঝে বিষণ্ণতা (ডিপ্রেসন) রোগে ভুগতেন। বার্ণস ও বায়রন অতিমাত্রায় সুরাসক্ত ছিলেন। কোলরিজ-এর 'কুবলা খাঁ' সৃষ্টির মুলে যে অহিফেন—একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

আপনারা নিশ্চয়ই এই সব খ্যাতনামাদের অনেকের ব্যক্তিগত জীবনের এই রহস্যের খবর জানেন। আমি চরিত্র হননের জন্যে এঁদের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করছি না। অথবা আমি এই সব উদাহরণ পেশ করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে চাই না যে প্রতিভা ও উন্মত্ততা এক। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে বাস্তব জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় হতে পারে। আরো একটি বিষয়ে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই মনের অসুখ সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। মনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সব সময়ই দুর্বল বা হীন নয়, অনেক বড় বড় সাধু-সন্তরাও মনের রোগে ভুগেছেন জানলে মনের অসুখকে আর মানুষ বিধাতার অভিশাপ বা শয়তানের অনুগ্রহ বলে মনে করবে না, মনের অসুখ সারাতে ভূতের রোজা ডাকবে না।

আমার কাহিনীর নায়ক তিরিশ বছরের দোহারা চেহারার এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে তিনি আমার এক পরিচিত ডাক্তারের চিঠি নিয়ে আমার কাছে আসেন। মনে করা যাক, তার নাম প্রসূন রায়। প্রসূনবাবু একটা বড় ফার্মে ভাল মাইনের চাকরী করেন। আর্থিক অসচ্ছলতা নেই। থাকেন উত্তর কোলকাতার কোনো এক পল্লীতে। স্ত্রী আর পাঁচ বছরের শিশুসন্তান নিয়ে তাঁর পরিবার। বিয়ে হয়েছে বছর সাতেক আগে। প্রসূনবাবু তখন এম, এস সি পাশ করে চাকরীতে ঢুকেছেন। বাবা-মা আছেন শিলিগুড়িতে। তাঁর বড় দুই ভাই বিদেশে চাকরী করেন। এ-কাহিনীতে তাঁদের ভুমিকা বিশেষ কিছু নেই। প্রসূনবাবুর শারীরিক কোনো রোগ নেই বছর দুয়েক ধরে তিনি এক অদ্ভুত মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। ট্রেনে চাপতে তাঁর ভয় হচ্ছে। দূরপাল্লার ট্রেনে করে কোথাও যেতে হবে শুনলে তিনি আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠেছেন। তাঁর চাকরীতে প্রায়ই দিল্লী, বোম্বাই যেতে হয়। সেই সময় ছোট শ্যালককে বাসায় রেখে তিনি বাইরে যান। পাঁচ বছরের মধ্যে

অন্তত ২০।২৫ বার তাঁকে বাইরে যেতে হয়েছে। প্রথম ক'বছর কোনো অসুবিধা ছিল না। তিনি বাইরে যেতে বরং আনন্দই পেতেন। টি-এ ইত্যাদি বাবদ এতে আইনসঙ্গত বেশকিছু টাকা উপরি রোজগারও হত। কিন্তু বছর দুয়েক আগে প্রথমে তিনি রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠে এই আতঙ্কের আভাস পান। গাড়ী হাওড়া স্টেশন ছাড়ার আগে তাঁর মনে হয় বুকের বাঁ-দিকটায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, চোখে ঝাপ্‌সা দেখছেন, গা ঘামছে, বমন উদ্রেক হচ্ছে। তিনি ভয় পেয়ে গাড়ী থেকে নেমে সোজা বাড়ী চলে আসেন। সেই রাতেই পাড়ার ডাক্তার এবং পরের দিন অফিসের ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেন। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ নেওয়া হল, বুকের এক্‌সরে ফোটো তোলা হল। কোনো রোগের হদিশ পাওয়া গেল না। ডাক্তারেরা বললেন পেটে বায়ু জমার দরুনই বোধ হয় এই রকম হয়ে থাকবে। দু-দিন বাদে তিনি অফিসে যাতায়াত সুরু করলেন। মাসখানেক বাদে তাঁর অফিস নির্দেশ দিল আবার বাইরে যেতে হবে। এবার বোম্বে। যথারীতি টিকিট কাটা রিজার্ভেশন পর্ব চুকে গেল। নির্ধারিত তারিখের দিন তিনেক আগে যাবার কথা ভাবতেই তিনি আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আবার ডাক্তারী পরীক্ষা। এবারও সেই একই রায় দিলেন চিকিৎসকেরা। কোনো রোগ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্কুলাইজার খেতে নির্দেশ দিলেন। নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিয়ে প্রসূনবাবু প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি এই ছেলেমানুষী ভয়কে কিছুতেই আমল দেবেন না। প্রথম শ্রেণীর এক কামরায় উঠে বসার আগেই তিনি স্টেশনের খাবার ঘরে চা খেতে খেতে অসুস্থ বোধ করলেন। সেই বুকে ব্যথা, মাথা ঘোরা, পেট গুলিয়ে উঠলো, যা খেয়েছিলেন সব বমি করে দিলেন। স্ত্রী, শ্যালক এবং অফিসের এক বন্ধু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। বন্ধুটি দেখলেন, নাড়ীর গতি অস্বাভাবিক দ্রুত। এবারও অফিসের গাড়ী করে বাড়ী ফিরতে হল। এর পর এক নামী নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে সাত দিন রইলেন। নানা ধরনের অনুসন্ধান চালিয়েও কোনো শারীরিক রোগের সন্ধান মিলল না। অফিসের কর্তারা তাঁর কর্ম-দক্ষতায় সন্তুষ্ট ছিলেন। অন্য বিভাগে তাঁকে বদলি করা হল, বাইরে যাওয়ার দায় থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন। ট্রেনে ওঠার ভয় কিন্তু তার রয়েই গেছে। তিনি এই ভয় থেকে মুক্ত হতে চান।

—জানেন ডাক্তারবাবু, শুধু লেখাপড়া নয়, খেলাধুলাতেও আমার স্থান বরাবর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উঁচু সারিতে ছিল। ভয় কাকে বলে আমি জানতাম না। এই নিউরোটিক দুর্বলতার দরুন আমার প্রতিপত্তি অনেকটা খর্ব হয়েছে। অফিসে কেউ মুখ টিপে হাসে, কেউ বা অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করে উত্যক্ত করে তোলে। আর সব থেকে বড় কথা কি জানেন? স্ত্রীর কাছে আমি ছোট হয়ে গেছি, তিনি আমাকে অনুকম্পার চোখে দেখতে সুরু করেছেন। আর ভয়

এখন ট্রেনে ওঠাতেই শুধু নয়, বাড়ীর বাইরে যেতেই আমার ভয় হচ্ছে। ভয় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। অফিস থেকে আগে নিয়মিত খেলার মাঠে যেতাম। এখন সে পাঠ বন্ধ। লাঞ্চের পর থেকেই আমি ঘড়ি দেখতে আরম্ভ করি। কতক্ষণে পাঁচটা বাজবে, কতক্ষণে গিয়ে গাড়ীতে উঠব—এই চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বেশিক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকা বন্ধ করেছি। ক্লাব ছেড়েছি, আড্ডা ছেড়েছি। খালি বাড়ী যাবার চিন্তা। দিনের মধ্যে অফিস থেকে অন্তত পাঁচবার নানা অছিলায় বাড়ীতে ফোন করি। বাড়ী ঢোকবার আগেও বুক দুরদুর করে ; কিন্তু বাড়ীতে ঢুকে স্ত্রীকে ছেলেকে দেখলেই আমার মন শান্ত হয়। এটা কি রোগ ? কি জন্যে এমন হচ্ছে ?

দু-দিন তিন দিনের মধ্যে আমারই নির্দেশে ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা খুলে বললেন : স্ত্রী আমার আহামরি গোছের না হলেও দেখতে ভালই। বি-এ পাশ করেছেন বিয়ের পর। আত্মীয়-স্বজন মহলে খুবই সুনাম। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি কর্মঠ। বিয়ের পর প্রথম বছর তিনেক আমার দুই ভাই-ই কোলকাতায় ছিলেন। আমরা একসঙ্গে থাকতাম। কোনো গোলমাল হয় নি। আমার স্ত্রীকে বড়রা সমীহ করে, বাচ্চারা ভয় পায়। রাশভারী এক ধরনের মানুষ থাকে জানেনতো, যারা অনায়াসে অপরের ওপর কর্তৃত্ব করে যায়, আমার স্ত্রী সেই জাতের। সব ব্যাপারে তাঁর জেদই বজায় থাকে। তাঁর অনেক অন্যায় সিদ্ধান্তও আমাকে মেনে নিতে হয়! দু-একবার বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে হয়েছে। না আমরা প্রেম করে বিয়ে করি নি। তবে ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের জানাশোনা অনেক দিনের। আমি বিদ্রোহ করলে তিনি ঝগড়াঝাটির মধ্যে যান না। উঁচুগলায় কথা বলতেও তাঁকে খুব কম শোনা যায়। তবে কি করে বুঝি তিনি রাগ করেছেন ? কথা বন্ধ করেন ; স্রেফ বোবা হয়ে যান। অবশ্য শুধু আমার সঙ্গে কথা বলেন না। অন্যের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আমার সুখসুবিধা খাওয়াদাওয়া, পোষাক-আসাকের তদ্বির-তদারক যথারীতি আগের মত করে যান। ঝি-চাকরেরা বুঝতে পারে না যে আমাদের মধ্যে নীরব সংগ্রাম চলেছে। আমি বড় জোর এক সপ্তাহের মত এই ঠাণ্ডা লড়াই-এর চাপ সহ্য করতে পারি। সহ্য করতে পারি মানে এই নয় যে আমি বেশ নিশ্চিন্ত থাকি। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্বস্তি, দিনরাত আমাকে পীড়িত করে। তিনি নিজের বিছানায় শুয়ে নিরুদ্বেগে ঘুমুতে থাকেন আর আমি ঘুমের বড়ি খেয়েও ছটপট করি। তারপর একদিন নতি স্বীকার করি। স্নায়ুর চাপ কমে, অনেকটা শান্তি আসে। কিন্তু নিজের কাছে ছোট হয়ে যাই, পরাজয়ের গ্লানি কাটতে চায় না। ভেতর থেকে কে যেন আমাকে চাবুক মারতে থাকে। আমার মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি এবার কোনো সংঘর্ষ

ঘটলে আমি নতি স্বীকার করব না। সংঘর্ষ ঘটে, বিদ্রোহ করি, আবার স্বীকার করি আর যন্ত্রণায় ভুগি।

রাজধানী এক্সপ্রেসে যেদিন প্রথম আতঙ্কের আভাষ পেয়েছিলেন সে সময় স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন ছিল মনে আছে কি? যুদ্ধ পর্ব না শান্তি পর্ব? কোন পর্ব চলছিল?

বেশ মনে আছে একটু বড় দরের অশান্তিই ঘটেছিল। ছেলেকে নিয়ে। উনি ছেলেকে কিছুতেই স্কুলে পাঠাতে চান না। আমি একটা বেবি স্কুলে ধরপাকড় করে ওকে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলাম; উনি ছেলেকে কিছুতেই ছাড়বেন না। জানেন তো আজকাল কিণ্ডার-গার্টেন থেকে স্কুলে না ঢুকলে পরে আর জায়গা পাওয়া যায় না। উনি কিছুতেই আমার কথা বুঝতে চাইলেন না। তর্ক করা ওঁর সঙ্গে বৃথা। কানে উনি সুবিধামত তুলো গুঁজে দিতে পারেন। তাই করলেন আর মুখেও ছিপি আঁটলেন। স্টেশনে যাবার আগে জোর গলায় ঘোষণা করলাম যে দিল্লী থেকে ফিরে এসেই খোকাকে স্কুলে পাঠাবো। দেখি কে বাধা দিতে আসে।

—আপনার মনে গাড়ীতে ওঠার আগে থেকেই তাহলে অশান্তি উদ্বেগ ছিল!

আমার কথার উত্তরে তিনি বললেন—বেশি পরিমাণেই ছিল।

—শুধু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথাই বললেন; এবার ভাল কথা কিছু শোনান।

—ভাল কথা মানে ভালবাসার কথা? স্ত্রীকে ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা করছেন? মনে হয় অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখী হতে পারতাম। এই আতঙ্ক-রোগের জন্যে চিকিৎসা করতে হত না। নিউরোসিসের জন্যে লোকের কাছে হেয় হতাম না।[1] কিন্তু আমি অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসার কথা ভাবতে পারি না। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে বাইরেও প্রেম করে বেড়ায়। আমাকে দু-একবার সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমার রুচিতে বেধেছে। আমি আমন্ত্রণে সাড়া দিই নি। আবার নববিবাহিত বন্ধুদের বিবাহিত জীবনের গল্প শুনলে মনে হয় আমি স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুই পাই নি; উনি আমাকে সব সুখ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

—আপনি দিনে পাচবার করে বাড়ীতে ফোন করেন কেন? বাড়ী থেকে বাইরে থাকতে চান না কেন? আপনি কি স্ত্রীকে সন্দেহ করেন?

প্রসূনবাবু যেন ঈষৎ চমকে উঠলেন। পাশের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে চলেন: আমি ঠিক বুঝতে পারি না! এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কূলকিনারা পাচ্ছি না। আমাকে তিনি যত্ন করেন আমার সুখ-সুবিধের দিকে দৃষ্টি আছে। কিন্তু স্ত্রীর সব কর্তব্য তিনি পালন করতে চান না। ভবেশ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রোজ কি ঘটে না ঘটে—তার

আনুপূর্বিক বিবরণ সে আমাকে দিত। প্রায় এক সময়েই দু-জনের বিয়ে হয়েছে। তার কথা শুনে বুঝতাম আমার স্ত্রী অন্যদের স্ত্রীর মত নন। গোড়ার দিকে এ নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করতাম। কিন্তু এখন করি না। ভবেশকেও যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলি। ওর মিলনের গল্পগুলো শুনে আমার রক্তে আগুন জ্বলে ওঠে সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

একটু থেমে এবার একটু উঁচুগলায় বলে উঠলেন: আমার মধ্যে প্যাশান খুব বেশি। আমার স্ত্রী শীতল, তার মধ্যে উত্তাপ কম। প্রথম দিকে মনে হত আমি বোধহয় অ্যাবনরম্যাল, তিনিই নরম্যাল। কিন্তু ভবেশ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের দাম্পত্য জীবনের গল্প শুনে আমার ধারণা পালটে গেছে।

—আপনি দাবী করেন না কেন।

দু'একদিন যে করি নি এমন নয়। বিশেষ করে যে রাত্রে পার্টি বা ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ সুরা পান করে বাড়ী ফিরেছি সেই রাত্রে দাবী করেছি, জবরদস্তিও করেছি মাঝে মাঝে। তখনকার মত তৃপ্তিও হয়তো পেয়েছি। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়েছে স্ত্রীর ছোট্ট দুটি কথা—ছিঃ! তুমি বড় গ্রাস, বড় ভালগার। লজ্জায় মুখ তুলে সেদিন স্ত্রীর দিকে তাকাতে পারিনি। আরো লজ্জিত হয়েছি যখন বুঝতে পেরেছি অহল্যা যে পাষাণ সেই পাষাণই রয়ে গেছেন।···

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রলোকের গলাটা ধরে এল। তিনি ধীরে ধীরে মুখ নীচু করলেন।

—আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না কিন্তু।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে প্রসূনবাবু বললেন: ঐ প্রশ্নের জবাবটা আমি আপনার কাছে পাব আশা করছি। আমি আমার স্ত্রীকে সন্দেহ করি? আমি ঠিক বুঝতে পারি না। স্ত্রী আমাকে ভালবাসেন কিনা তাও আমি বুঝতে পারি না। কেননা অন্য কোনো নারীর ভালবাসা পাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ব্যাপারটা কি আমি হয়তো ঠিক জানি না। তবে তিনি যে আমাকে শ্রদ্ধা করেন না—এ আমি ভালভাবেই বুঝতে পারি। আর ঐ জায়গাতেই আমার দুর্বলতা। মনে হয় ভালবাসা না পেয়েও বাঁচা যায়, দৈহিক মিলনের আনন্দ ও তৃপ্তি ছাড়াই দিন কাটানো যায়। কিন্তু একই ছাদের তলায় আমার দিনরাতের সঙ্গী আমাকে সমীহ করবে না, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির তারিফ করবে না—এ আমি কিছুতেই সইতে পারি না। ছোটবেলা থেকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে শুধু বাহবা পেয়ে এসেছি। ইউনিভার-সিটির সব পরীক্ষাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি। অফিসে অল্পদিনের মধ্যে জবর-দস্ত ডিরেকটররা আমার মূল্য বুঝেছে, সেই অনুযায়ী দক্ষিণা ও মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই আমার কদর বুঝলেন না, আমার প্রাপ্য আমি

পেলাম না। তাই আমার নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত, আমার অহংবোধ বিপর্যস্ত। আমি অসুখী। আপনি এবার বলুন, আমি ওকে সন্দেহ করি কি করি না?

একটু থেমে ভারী গলায় বললেন: না। ও প্রশ্নের জবাবে দরকার নেই। আপনি আমার 'আতঙ্করোগ' দূর করতে সাহায্য করুন। স্ত্রীকে ছাড়া যাতে আমি চলতে পারি, সেই ব্যবস্থা করে দিন। ওঁর ওপর আমার কেন এই অস্বাভাবিক নির্ভরতা? আমার রোজগারে সংসার চলে, ওঁর নিত্যপ্রয়োজনের সব জিনিস আমি জোগাই। উনি আমার ওপর নির্ভর করবেন—এইটেই তো স্বাভাবিক। উল্টোটা কেন হল? আমার ভয় কিসে যাবে বলুন।

—সন্দেহ অবিশ্বাস কাটলেই ভয় চলে যাবে।

—সন্দেহ যে মাঝে মাঝে হয়না, তা নয়। কিন্তু আবার মনে হয় ঐসব মেয়েরা ভালবাসতে জানে না, ভালবাসা, পাবারও ওদের দরকার হয় না। দেহমন দু-দিকথেকেই আমার স্ত্রী শীতল বরফের মত ঠাণ্ডা। পরপুরুষের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ওঁর মনে জাগতেই পারে না। আবার এও মনে হয় যে হয়তো এই উষ্ণতার অভাব শুধু আমার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। আমি আপনাদের কিছু লিটারেচার পড়েছি 'ইমপোটেন্স ও ফ্রিজিডিটি' দুইই নাকি স্থানকালপাত্র সাপেক্ষ। ঠিক জানি না। আপনি বলছেন সন্দেহর জন্যই আমি বাইরে থাকতে ভয় পাই। ঘন ঘন ফোন করে দেখি স্ত্রী ঘরে আছেন কিনা। তাই যদি সত্যি হয় তবে আমার মত হীন-প্রকৃতির মানুষ খুব কমই আছে বলতে হবে। আমার সন্দেহ দূর হবার কি কোনো উপায় নেই।

—বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রসূনবাবু।

বললাম: অনেক মেয়েই যৌনশীতল। তা বলে তারা স্বামীকে ভালবাসে না—একথা ঠিক নয়। মর্যাদার লড়াই আপনাদের দাম্পত্যজীবনকে অসুখী করেছে। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে এত বেশি সচেতন নাই বা হলেন প্রসূনবাবু। স্ত্রীকে নিজের সমকক্ষ বলে ভাবতে শিখুন, পুরুষালী দম্ভ ভুলে যান। তা হলেই দেখবেন সন্দেহ দূর হবে, হয়তো আতঙ্করোগও সেরে যাবে।

৪

সন্দেহ, ভয়, অমরত্ব, ঈর্ষা

সন্দেহ

কল্পনাকে নিয়ে বাড়ীর লোকেরা খুবই মুস্কিলে পড়েছেন। সে আজ মাস দুয়েক হলো হাসছে, কাঁদছে, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে আপনমনে কি যেন বলছে। কেন হাসছে, কেন কাঁদছে, কি বলছে, কেউই কিছু বুঝতে পারছেন না। কোনো কথার জবাব তার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ মানুষ চিনতে পারছে, খেতে দিলে খাচ্ছে, দরকারমত বাথরুমে যাচ্ছে। বাড়ীর ডাক্তারের ওষুধে গত কয়েক রাত ঘুম হচ্ছে, কিন্তু অন্য কোনো দিকে কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। প্রথমটায় এ-নিয়ে মা-বাবা বিশেষ উদ্বিগ্ন হননি। ভেবেছিলেন—কোনো কারণে বোধ হয় মন খারাপ হয়েছে, দু-চারদিনে আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে তাঁরা ভয় পেয়ে হাতুড়ে, বদ্যি, জ্যোতিষী, রোজা ইত্যাদি সবরকমের বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়েছেন; সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী দাওয়াই বাতলেছেন; সব রকমই দাওয়াই ও টোটকাটুটকি দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ফল পাওয়া যায়নি। এ-সব ব্যাপারে ডাক্তারের সাহায্য সাধারণত সব থেকে শেষে চাওয়া হয়, এ-ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন—এ এক ধরনের মনের অসুখ, মনের রোগের ডাক্তারের কাছেই যাওয়া উচিত।

কল্পনাকে নিয়ে এসেছেন তার দিদি, সঙ্গে বাড়ীর ডাক্তার। ডাক্তারবাবু প্রথমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ইতিহাস জানালেন।

কল্পনার বয়স তেইশ। বছর চারেক হল বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে কোলকাতা থেকে কিছু দূরে এক গ্রামের স্কুলে মাস্টারী করছে। স্কুলটি এখনও ভাল করে গড়ে ওঠেনি, মাইনেপত্র নিয়মিত পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তার পরিমাণও যৎসামান্য। কল্পনার বাবা দেবীবাবু একজন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী। প্রথম জীবনে কোনো বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন, শেষে গান্ধীবাদে দীক্ষিত হন। অনেক বছর জেলে কাটিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেন। স্ত্রীও স্কুলে পড়ার সময় ৩০/৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তিনিও জেলখানার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। স্বাধীনতা লাভের পর রাজনীতি ছেড়ে দেবীবাবু সরকারী গৃহ নির্মাণের ঠিকাদারীর কাজ ও অন্যান্য নানা ধরনের ব্যবসা করার চেষ্টা করেন।

কোনোটাতেই তিনি সফল হতে পারেননি। অসাফল্যের কারণ—তাঁর আদর্শনিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতা। ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা লাভ করতে হলে আদর্শ ও সততাকে সব সময় আঁকড়ে থাকা চলে না, মনের কথা সব সময়ে সব স্থানে প্রকাশ করা চলে না, কিছুটা আপোষ না করতে শিখলে জীবনযুদ্ধে টিঁকে থাকা যায় না—এই সহজ সত্য জীবনধারণের মূলনীতিগুলি তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও বুঝতে পারেননি। কাজেই ছেলে পড়িয়ে, একখানা টালির ঘরে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে দিন কাটাতে হয়েছে। এ ছাড়া নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশেষ কঠোর; তাঁর চরিত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচিতি থাকার দরুণ তাঁর স্ত্রী প্রায় সব ব্যাপারে একরকম মানিয়ে নিতে পেরেছেন। কিন্তু গোলমাল বেধেছে মেয়েদের নিয়ে। বড় মেয়ে জল্পনা বছর পাঁচেক আগে প্রায় বিদ্রোহ করেই ঘর ছেড়ে একটা মেয়েদের বোর্ডিং-এ আশ্রয় নিয়েছে। দেবীবাবুর পছন্দকরা পাত্রকে তার পছন্দ না হবার দরুণ দেবীবাবুর সঙ্গে বচসা হয় এবং তিনিই তাকে অন্য আশ্রয় খুঁজে নিতে বলেন। সরকারী পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বিভাগে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে সে স্বনির্ভর হয়েছে; এই কাজ নেবার ব্যাপারেও দেবীবাবুর সঙ্গে জল্পনার মতবিরোধ ঘটে। এই পরিকল্পনা ব্যাপারটাতে তাঁর নৈতিক সমর্থন ছিল না, আর জল্পনার কাজটাকে তিনি নোংরা কাজ বলে মনে করেছিলেন। বর্তমানে অবশ্য জল্পনা এ-বাড়ীতে যাতায়াত করে এবং বাবাকে না জানিয়ে মায়ের হাতে মাসে মাসে কিছু টাকা দিয়ে যায়। কল্পনার কলেজে পড়ার খরচও সেই চালিয়েছে। তাঁর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, স্পষ্টবাদিতা ও গোপন স্বভাবের জন্য পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে দেবীবাবুর বিশেষ সদ্ভাব নেই। বড়রা তাঁর নাম দিয়েছেন 'বিশ্বামিত্র' আর ছেলেছোকরারা তাঁকে বলে জীবন্ত জীবাশ্ম বা 'লিভিং ফসিল'। দেবীবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হল। তার কারণ এই যে, কল্পনার অসুখের সঙ্গে তার পারিবারিক পরিবেশের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

ডাক্তারবাবু দেবীবাবুর বন্ধুপুত্র, দেবীবাবুকে শ্রদ্ধা করেন। এদের পরিবারের অনেক কিছু খবর রাখেন। তাঁর কাছে আরও জানা গেল কল্পনার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দেবীবাবু অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও এ-পর্যন্ত উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাননি। কল্পনা খুবই নম্র ও বিনয়ী, বাবার কোনো কথার কোনো প্রতিবাদ সে করে না। ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা খুব কম। তবে মেয়েদের মনের সন্ধান পাওয়া খুবই দুরূহ, তার স্কুলে কোনো ছেলে-মাস্টারের সঙ্গে তার ভাবসাব হয়েছে কিনা বলা ডাক্তারবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

দিদির সঙ্গে ধীরপদে কল্পনা প্রবেশ করল। হাত ধরে এনে জল্পনা তাকে আমার সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিল। মাথা নীচু করে স্থিরভাবে সে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ভ্রূ কুঁচকে সে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল। জল্পনা একটু জোর গলায় জিজ্ঞাসা করল—কি বলছিস, জোরে বল। ডাক্তারবাবু শুনতে পাচ্ছেন না। কল্পনা—কল্পনা।—কল্পনা সাড়া দিল না। কিন্তু মুখভাবের পরিবর্তন হল। বিরক্তির চিহ্ন মিলিয়ে গিয়ে মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। এইবার মুখ তুলে একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিল।

এতক্ষণে ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ হল। শিশুর মত সরল মুখে বয়সের কোনো ছাপ পড়েনি। মুখ দেখে মনে হবে যে তার বয়স বড়জোর-পনেরো-ষোলো। জল্পনা একটু বিরক্ত হয়ে এবার আরো উঁচু গলায় বলে উঠল: কি হয়েছে বল ডাক্তারবাবুকে। একটা রুগী নিয়ে উনি কতক্ষণ বসে থাকবেন:

ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত করে আমি বললাম: ব্যস্ত হয়ো না। আমার তাড়া নেই। হ্যাঁ বলতো—তোমাদের কোনো কথাতেই ও সাড়া দিচ্ছে না!

—হ্যাঁ, না, আচ্ছা, এই ধরনের এক অক্ষরের কি বড়জোর দু-অক্ষরের কথা মাঝে মাঝে দু-একটা বলছে। সেও অনেক সাধ্য-সাধনার পর। আর ঐ দেখুন, আবার ভ্রূ কুঁচকাচ্ছে, একটু পরেই হাসবে; মাঝে মাঝে শব্দ করে হাসে। এবার সশব্দে হেসে উঠল কল্পনা, তারপরই আবার চুপ করে চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে তুলল।

—একখানা চেয়ার টেনে এনে ওর পাশে বসে ফিসফিস করে কথা বলে দেখতো। মনে হয় উত্তর পাবে। মস্তিষ্কের কোষ নিস্তেজিত থাকলে মৃদু উদ্দীপকে সাড়া দিয়ে থাকে। জোরালো উদ্দীপকে আরো নিস্তেজিত হয়ে পড়ে।

জল্পনা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চোখ ফেরাল। তারপর আমার কথামত একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসল। ও তখন আবার মৃদু মৃদু হাসছে। মুখ নীচু, চোখ দুটো আধ-বোজা। ডাক্তারবাবু আমার কথামত বাইরে চলে গেলেন। একটা কাগজে তাড়াতাড়ি কতকগুলো প্রশ্ন লিখে জল্পনার হাতে দিয়ে আমি একটু দূরে গিয়ে বসলাম: ফিসফিস করে দুজনে কথা বলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্পনা একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু বলল। জল্পনা বিস্মিত হয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাতে লাগল। বাইরে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে বললাম: কল্পনাকে কয়েকদিন জল্পনার সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। ওদের বাবাকে যেমন করে হোক রাজী করাতেই হবে, না হলে আমার পক্ষে চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হবে না। তারপর ঘরে এসে কল্পনার দিকে তাকিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললাম: তোমার সব কথা দিদির কাছে খুলে বলবে। আমি আর দিদি ছাড়া তোমার কথা আর কেউ জানবে না। তোমার বাবা-মা এমন কি তোমাদের ডাক্তারবাবুকেও কোনো কথা বলা হবে না। তুমি দিদির কাছে নিশ্চিন্ত মনে সব কথা বলতে পার। দিদি তোমাকে ভালবাসে, সে তোমার সমস্যার একটা কিছু সমাধান ঠিকই করে দেবে।

দিন তিনেক পরে জল্পনার মনের খবর জানলাম।

—আমি ভাবতেই পারিনি ডাক্তারবাবু যে কল্পনা এতদূর যেতে পারে। বয়সের তুলনায় ওকে যেমন ছোট দেখায়, আমি ভাবতাম বুঝি সব দিক থেকেই ও ঐরকম ছোটই রয়ে গেছে। বি-এস-সি পড়বার সময় একটি ছেলের সঙ্গে ওর ভাব হয়। ছেলেটি ঐ কলেজের ল্যাবরেটরীতে দিন-কতক কাজ করেছিল, নাম শঙ্কর। তারপর তাদের গ্রামে একটা স্কুল খোলে, সেই স্কুলেই মাষ্টারী করছে কল্পনা। ওদের ভালবাসা অনেক দূর এগিয়েছে, সামনের মাসেই রেজিস্ট্রি হবার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমরা এর বিন্দু বিসর্গও জানি না। বাবা-মাকে না হয় ভয়ে ভয়ে কিছু না বলতে পারে, কিন্তু আমাকে পর্যন্ত ঘূণাক্ষরেও কিছু জানাল না। রাগে, ক্ষোভে প্রায় কেঁদে ফেলল জল্পনা।

—এ অবস্থাটা হল কেন? রেজিস্ট্রি করতে ভয় পাচ্ছে নাকি? বাবা মায়ের অমতে বিয়ে করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না মনে করছে বুঝি?

—কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো ওকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে রেজিস্ট্রি করে ফেলতে বললাম। বাবা মা শেষ পর্যন্ত মেনে নেবেন—এই আশ্বাস দিলাম। কিন্তু ও কোনো কথার জবাব দিল না। কাঁদতে লাগল। সন্দেহ হচ্ছে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।

—ছেলেটি বিগড়ে যায়নি তো? তার মত পালটায়নি তো? ওরা কতদূর এগিয়েছে বুঝতে পারলে? অনেক ছেলেতো মেয়েদের বিপন্ন অবস্থায় ফেলে কেটে পড়ে।

—সে দিকটা আমি খুঁচিয়ে দেখেছি। এরকম ব্যাপার নিয়ে আমাকে মাঝে মাঝে 'ডিল' করতে হয়। ঐদিক থেকে বিপন্ন হলে আমার কাছেই তো প্রথমে ছুটে যেত। না, 'আই অ্যাম শিওর, শি ইজ নট ক্যারিইং'। ওর কিন্তু খানিকটা উন্নতি হয়েছে। আপনার কাছে একবার নিয়ে আসি, আপনি আর একবার দেখুন।

কয়েক দিন পরে জল্পনার সঙ্গে কল্পনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে বোঝা গেল। স্বাভাবিক হাসি দিয়ে আমাকে শুভেচ্ছা জানাল। দু-চারটে আজে-বাজে কথার পর কাজের কথা তুলতেই কিন্তু ওর চোখমুখের ভাব বদলাতে লাগল। তখন সোফায় দেহটা এলিয়ে বিশ্রাম করতে বললাম। অভিভাবনের ফলে কল্পনা তন্দ্রাচ্ছন্ন হল। তখন নির্দেশ দিলাম যে, ও এবার দিদিকে ওর ভয়ের আসল কারণ ব্যক্ত করবে। কয়েকবার ঐ রকম নির্দেশ নিয়ে জল্পনাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে বললাম। টুকরো টুকরোভাবে কল্পনা তার মনের কথা বলতে লাগল : আমার ভয় করছে, আমি ওকে ঠিক মত বিশ্বাস করতে পারছি না। কেন?···ও···বোধহয় অন্য কাউকে ভালবাসে। কাকে? ঠিক বলতে পারব না।···হয়তো মণীষা কে। মণীষা কে? স্কুলের

নতুন একজন টিচার। আমার থেকে অনেক ভাল দেখতে। আমার চেয়ে বুদ্ধিও বেশি। শঙ্করকে স্কুলের ব্যাপারে সে অনেক বেশি সাহায্য করে। তারই চেষ্টায় এ বছর বোর্ড থেকে আমরা 'রেকগনিশন' পাচ্ছি। আমার থেকে শঙ্করের কাছে তার দাম অনেক বেশি। ওরা হয়তো রোজ সন্ধ্যায় বাঁধের ধারে বেড়াতে যায়। আমি তো সন্ধ্যার আগে চলে আসি। মণীষা কোথায় থাকে? টালিগঞ্জে। আমার সঙ্গেই স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি বাসে উঠলেই ও বোধ হয় আবার ফিরে যায়। ওর সঙ্গে শঙ্করের নির্জন বাঁধের ধারে দেখা করার কথা থাকে। এসব আমার সন্দেহ। আমার কল্পনা? কী জানি? হতেও পারে। আমি বোধ হয় মণীষাকে হিংসে করি। রোজ শাড়ী পালটায়, ম্যাচ করে ব্লাউজ পরে, জুতো থেকে ঘড়ির ব্যাণ্ড, চুলের ফিতে পর্যন্ত ম্যাচ করা। 'শি ইজ এ স্মার্ট' আর শঙ্কর একটা 'ফপিশ ড্যানডী'—ওর ঐ ধরনের মেয়েই পছন্দ। তবে রেজিস্ট্রিটা সেরে ফেলবার জন্য অত তাগিদ দিচ্ছে কেন? তাইতো! আমিও তো তাই ভাবি। বুঝতে পারি না। ও-ভাবে ওর সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি বোধহয় আত্মহত্যা করব। 'সুইসাইড' করতে যাব কোন দুঃখে। আমার বাবা-মা আমাকে কত ভালবাসেন। আমার বাবাকে সকলে চেনে, সকলে মানে, তিনি দেশের জন্য কত কী করেছেন। রাজবন্দী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বাবাকে চেনেন। শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি মরবও না, পাগলও হব না। কি বললি? ওকে আর ভালবাসি না। নারে খুব ভালবাসি আগের মতই ভালবাসি। ওই বরং আমাকে ভালবাসে না। কি করে বাসবে? ও আজ চার বছর ধরে যা বলছে, আমি তাতে রাজী হইনি। ছিঃ বিয়ের আগে! ছিঃ ছিঃ। সবাইতো মণীষার মত 'স্মার্ট' নয় 'চিপ' নয়। কিন্তু···আমার, কি ভয় হয় জানিস? হয়তো স্কুলে গেলে ও আমাকে স্পষ্ট বলে দেবে—ও আমাকে চায় না। আমিও কি চাই? বাবা মায়ের অমতে বিয়ে করলে সে বিয়ে টেঁকে না। আমি যদি বাবা মায়ের আশীর্বাদ না নিয়ে বিয়ে করি, ও ঠিক কিছুদিন পরে আমাকে ছেড়ে মণীষাকে বিয়ে করবে। আমি তোদের না জানিয়ে পাপ করেছি, অপরাধ করেছি। বিয়ে করলে বাবা মায়ের মনে আঘাত দেওয়া হবে। তুই বাড়ী থেকে চলে গেলে বাবা তিন মাস রাত্রে ঘুমোননি। উঠোনে সারা রাত পায়চারি করতেন।···আমার কান্না পাচ্ছে রে, আমি থাকতে পারব না। ওকে মণীষার হাতে তুলে দিতে পারব না। কিন্তু বাবা-মাকে, বিশেষ করে বাবাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আমার তোর মত মনের জোর নেই কেন রে? বাবা আমার পায়ে বেড়ি না পরিয়ে মনের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আমার মন নেই। তোরও তো মন নেই। তেড়েফুঁড়ে তো বেরিয়ে গেলি, কাউকে তো মন দিতে পারলি না। আমাদের উড়ে বেড়াবার ডানা নেই কেন? আজকের কত মেয়ে উড়ে বেড়ায় প্রজাপতি হয়ে।

আমরা পারি না! আমি তোর মত বিদ্রোহ করতে পারব না। বাবাকে আমি ভয় পাই। আমার ভয় করছে, খুব ভয় করছে। আমি ভালবাসি না, ভয় করি। —কেটে কেটে কথাগুলো বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কল্পনা।

আমার কথামত কল্পনা শঙ্করের ঠিকানায় একখানা চিঠি পাঠিয়ে লিখেছিল সে যেন ওর সঙ্গে দেখা করে। সেই সঙ্গে কল্পনার অসুখের খবরও জানিয়েছিল। শঙ্কর চিঠি পেয়েই দেখা করল। তাকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হল। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে কল্পনাই প্রথম চিঠি লিখে তাদের গ্রামের স্কুলে চাকরী চায়। কিছুদিনের মধ্যে দুজনের মধ্যে ভালবাসা জন্মায়। বাবার যে ওদের বিয়েতে অমত থাকতে পারে, আভাসেও এমন কথা কল্পনা কোনোদিন জানায় নি। শঙ্করের নানা রকমের সন্দেহ হত, ও কেন ওদের বাড়ীতে শঙ্করকে যেতে বলে না, ওর বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করার ব্যাপারে ও কেন বাধা দিয়েই চলেছে—এতদিন বুঝতে পেরে শঙ্কর যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। আমার কাছে আসার আগে কল্পনার অফিসে গিয়ে তার কাছ থেকেও শুনে এসেছে যে, এই বিয়েতে ওদের বাবা মা খুব সম্ভব মত দেবেন না। অনেকক্ষণ ধরে কল্পনার অসুখের কারণ, অসুখের প্রকৃতি, সারবার ও আবার হবার সম্ভাবনা প্রভৃতি নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে আলোচনা চলল। ছেলেটি মোটামুটি বুদ্ধিমান। সব ব্যাপার জেনে ওর কর্তব্য সম্পর্কে আমার পরামর্শ চাইল। আমি বললাম: তোমাকে কোনো পরামর্শ আমি দিতে পারি না। এই রোগ তোমাকে আগেই বলেছি, আবার 'বেকার' করতে পারে। এই 'হেবেফ্রেনিক': টাইপের স্কিজো-ফ্রেনিয়া কল্পনার মত ছেলেমেয়েদেরই হয়। 'হেবেফ্রেনিয়া' কথাটির মানে শিশু-মন। কথাটা গ্রীক। কল্পনা বয়সের তুলনায় এখনও অনেকটা ছেলেমানুষ আছে। কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, নীতিবাগিশ বাবার প্রভাবেই হয়তো তার মনের বৃদ্ধি ঘটেনি। তবে যদি ওর মনে আঘাত না দিয়ে ধীরে ধীরে ওকে বড় করে তোলা যায়, তাহলে অসুখের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম। স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে পারলে অসুখ পুরোপুরি সেরে যেতে পারে। অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো রকম ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। এখন তুমি কি সিদ্ধান্ত নেবে, তুমি ঠিক কর। হ্যাঁ, আর একটা কথা। মণীষা কে? কতদিন তোমার স্কুলে চাকরী করছে?

—মণীষা আমার পিসতুতো বোন। আমার ওখানে চাকরী ঠিক করছে না। কয়েক মাসের ছুটিতে ষ্টেট থেকে দেশে এসেছে। ওর স্বামী আর ও দুজনেই কালিফোর্নিয়ায় প্রশিক্ষণের ডকটরেট করছে। ছুটির মধ্যে যতটা পারে আমাদের স্কুলটাকে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ওর কথা কেন হঠাৎ। চেনেন না কি?

টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে করতে বললাম: ডিপ্রিভেশনেও ভুগছে কল্পনা। পরে বলব।

ভয়

সিড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই ভদ্রমহিলা হাঁপাতে লাগলেন। মেয়ের হাত থেকে জলের বোতল নিয়ে ঢকঢক করে আধবোতল জল গলায় ঢাললেন, ফ্যানটাকে পুরোদমে চালিয়ে দিতে বলে চেয়ারে বসে মেয়ের কাছে ইঙ্গিতে কিছু একটা চাইলেন। হাতের ঝোলা থেকে একখানা গোটানো হাতপাখা বের করে সেটাকে মেলে মেয়েটি মায়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে নাড়তে লাগল। কয়েক সপ্তাহ ধরে শ্রীযুক্তা মজুমদার তাঁর মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে আসছেন। তাঁর হাবভাব আকার-ইঙ্গিত আমার জানা হয়ে গেছে। এরপর তিনি মেয়েকে অন্য রকমের ইশারা করলেন। মেয়েটি তৈরীই ছিল, বাঁ হাতের ধোয়া তোয়ালেটা মায়ের হাতে এগিয়ে দিল। তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিজে উঠে গিয়ে পাখার রেগুলেটার ঘুরিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে চোখ তুলে চাইলেন। চোখেমুখে আজ আতঙ্কের চিহ্ন আরো বেশি যেন ফুটে উঠেছে। মনে পড়ে গেল, গতকালই তাঁর নিজের বাড়ীতে উঠে গেছেন।

—কি ? নতুন বাড়ীতে গিয়ে সাজাতে-গোছাতে ব্যস্ত ছিলেন বুঝি ? কাল এলেন না কেন ? ঘুম হয়েছিল তো ? ও পাড়ায় তো গোলমাল হবার কথা নয়।

মিসেস মজুমদার কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। মেয়েকে বাইরের ঘরের দরজাটায় ছিটকিনি তুলে দিতে বলে চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন: ওরা ওখানেও হানা দিয়েছে। ওদের কি আর কিছু অজানা থাকে ? সারারাত ভয় দেখিয়েছে। চোখের দুটো পাতা এক করতে পারিনি।

বিস্মিত ভাব দেখিয়ে বললাম: সে কি ? ওখানে ওরা ধাওয়া করল কি করে ? আপনাদের তো ভোরের আগেই এ-বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কথা। অত ভোরে কি ওরা আপনাদের পিছু নিতে পেরেছে ?

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মহিলা। তারপর মোটাসোটা চল্লিশ বছরের মিসেস মজুমদার পাঁচ বছরের মেয়ের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে বসলেন: আপনারা কেউ কিছু করলেন না, আমি জানি। করবার ইচ্ছেও নেই, ক্ষমতাও নেই। ওদের সঙ্গে আপনারা পেরে উঠবেন কেন ? ওরা সব দেখতে পায়, সব জানতে পারে। মিছিমিছি শুধু দরজা বন্ধ করা আর সাবধান হওয়া। ওরা তো আপনার আমার মত রক্তমাংসের মানুষ নয়। আমাদের আপনি ওদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। —কথা শেষ করে মেয়ের হাত থেকে জলের বোতলটা নিয়ে খানিকটা জল গলায় ঢাললেন, কিছুটা মাথায় দিলেন। এমনি সময় দরজায় শব্দ হতেই মিসেস মজুমদার

আঁতকে উঠলেন: ঐ আসছে, পুলিশ আসছে। ডাইনিরা কাল শেষ ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছে যে আজ যদি ওদের কথামত কাজ না করি, ওরা পুলিশে খবর দেবে।

—আপনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন। 'নক' শুনে বুঝতে পারছেন না? মিঃ মজুমদার। খুকু খুলে দাও। খুকু দরজা খুলে দিল। মিঃ মজুমদার ঢুকলেন। স্ত্রীর মতই গোলগাল মোটাসোটা চেহারা। পরনে হাফসার্ট, হাফপ্যাণ্ট, মাথায় শোলার টুপি, মুখে গর্বের ও তৃপ্তির হাসি। তাঁকে দেখে মিসেস মজুমদার কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। ভয়ের ভাব কেটে চোখেমুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল। মাথার কাপড়টা টেনে নড়েচড়ে বসলেন। এইভাবেই রাগ প্রকাশ করে থাকেন মিসেস মজুমদার। আমাকে সংক্ষিপ্ত একটা নমস্কার জানিয়ে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে বললেন: আজ দেরী হবার জন্য আমাকে দোষ দিতে পারবে না। হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে হেদো পর্যন্ত সব গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিসের একটা মিছিলের জন্যে এই কাণ্ড।

—তাই বলে বারোটার জায়গায় তুমি পাঁচটা করবে? আমি তখন থেকে ঘরবার করছি। নতুন পাড়া, কাউকে চিনি না; ফোন নেই, খবর নিতে পারছি না, আশেপাশে বাড়ী নেই, পুলিশ ফাঁড়ী কোথায় জানি না, কেউ এসে কেটে টুকরো টুকরো করে রেখে গেলেও কাকপক্ষীতে টের পাবে না। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে মিসেস মজুমদার আবার হাঁপাতে লাগলেন, মেয়ে বোতলটা হাতে তুলে দিল। যথারীতি গলায় মাথায় জল ঢেলে মিসেস মজুমদার শান্ত হলেন। মজুমদার একগাল হেসে স্ত্রীর অভিযোগের জবাব দিলেন। তারপর চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন: কাল সারারাত বড় জ্বালিয়েছে মিসেসের ডাইনিগুলো। এ পাড়ার তিনজন ও পাড়ায় পর্যন্ত ওকে ধাওয়া করেছে। কাল আমাদের একেবারে ঘুমুতে দ্যায়নি।

—বাজে কথা বলো না। একগাদা ছাঁইপাশ গিলে ভোঁস ভোঁস করে সারারাত নাক ডাকিয়েছ। দুর্গন্ধে বমি উঠে আসছিল। চোর-ডাকাত ঘরে ঢুকে আমার গলা টিপে ধরলেও তোমার ঘুম ভাঙ্গতো না। ঘরের মধ্যে নাক ডাকছে আর বাইরে ওরা ভয় দেখাচ্ছে। ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কুম্ভকর্ণের কানে ওদের কথা ঢোকেনি, ঢুকলে আর আরামে ঘুমুতে হত না। জানেন ডাক্তারবাবু, ওরা এখন আর প্রথম দৃশ্যের সেইসব কথা "Fair is foul and foul is fair" বলছে না। এখন সুস্পষ্ট বলছে—"Sleep no more, Majumdar, does murder sleep" ওরা এবার আগুন ধরাবে, ভূমিকম্প করাবে। ঝড় বৃষ্টি বাজ পড়ার কথা আর বলছে না। বলছে, বাড়ী বেঁচে দে, বাড়ী বেঁচে দে নইলে বাড়ীতে আগুন লাগবে, ভূমিকম্পে বাড়ী ভেঙ্গে পড়বে। তোর মেয়ে যাবে, তোর স্বামী যাবে তারপর তোর চামড়ায় তৈরী ঢোল বাজিয়ে

সারা শহরে জানিয়ে দেব তোদের সব কথা। ওরা আমাকে কিছুতেই ঘুমুতে দেবে না। আমাকে ভয় দেখিয়ে পাগল করে দেবে। আপনি ওকে বাড়ীটা বেচে দিতে বলুন ডাক্তারবাবু। না হলে আমরা কেউ বাঁচব না—আবার তাঁর নিশ্বাস আটকে গেল, গলা শুকিয়ে গেল, মাথা গরম হয়ে উঠল।

মুখে স্বভাবসিদ্ধ মোলায়েম হাসি ফুটিয়ে তুলে মজুমদার বললেন: ঐ ম্যাকবেথ-এর ডাইনিগুলো আমার জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দিল। চারশো বছর ধরে ওরা কত লোককে যে পাগল করেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। শেকসপীয়র বেঁচে থাকলে আমি তাঁর নামে মামলা ঠুকে দিতাম। 'হ্যালুসিনেশনের' আবহাওয়া তৈরীর জন্যে চার্জ আনতাম। আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মজুমদারবনিতা: আমি স্পষ্ট শুনছি, রোজ রাত্রে শুনছি। ওরা ধাপার মাঠ থেকে রাত বারোটার পর বেরিয়ে পড়ে। রক্তের গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাওয়ায় পাখা মেলে দিয়ে ঠিক জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। আমার মত অনেককে সাবধান করে। যারা ওদের কথায় কান দ্যায় না তাদের সর্বনাশ হয়।

এইবার কাহিনীটা বলি:

তিন বছর ধরে মিসেস মজুমদার অসুখে ভুগছেন। তার আগে মোটামুটি ভাল ছিলেন, তবে উদ্বেগপ্রবণতা তাঁর ছোটবেলা থেকেই। ভূতের গল্প, ডাইনির গল্প, 'হরর পিকচার্স,' ক্রাইম স্টোরিজ পড়ার নেশা তাঁর বহুদিনের। বি-এ পাশ করার পর প্রায় কুড়ি বছর আগে মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হয় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। মজুমদার মজলিশি লোক, সব আড্ডার তিনি মধ্যমণি। গান জানেন, ম্যাজিক জানেন, দাবা-তাস-পাশা সব খেলতে ওস্তাদ। আর একটা ক্ষমতা তাঁর ছিল, যা দিয়ে শত্রুকেও বশে আনা যায়। অমায়িক হাসি দিয়ে প্রতিপক্ষের সব অস্ত্র খণ্ডন করে তার হৃদয় জয় করতে পারতেন। কোনো সময় তিনি উত্তেজিত হতেন না। মাঝে মাঝে তিনি কোলকাতা থেকে উধাও হয়ে যেতেন। কেউ জানত না কোথায়। তাঁর অসাক্ষাতে লোকে বলাবলি করত যে তিনি নাকি শবসাধনা করতে মাঝে মাঝে অমাবস্যার রাতে শ্মশানে যাতায়াত করতেন। হাসতে হাসতে একথা তিনিই আমাকে বলেছিলেন।

—দ্বিতীয় রিপুটিকে আমি পুরোপুরি জয় করেছি স্যার—আমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে। শবসাধনা-টাধনা কিছু নয়, তবে হ্যাঁ—শ্মশান আমার ভাল লাগে। বিশেষ করে, পাড়াগাঁয়ের শ্মশান, যেখানে এপিডেমিকের সময় না পুড়িয়ে দায়সারা গোছের মুখাগ্নি করে মড়া ফেলে আত্মীয়স্বজনরা পালিয়ে যায়। না, আমার ভয় করে না। ভয় করলে চলবেই বা কি করে—আপনাদের তো মড়া কাটতে হয়েছে। ভয় কি ঘৃণা থাকলে ডাক্তার হতে পারেন কি? বে-ওয়ারিশ লাশগুলো সমাজ কল্যাণে লাগা উচিত! আমার নিজের কথা যে না ভেবেছি তা নয়। ব্যবসাটা খুবই বিপজ্জনক আর ঠিক সেই আইনসম্মত ও নয়। মেডিকেল

কলেজগুলোতে এ্যানাটমির ছাত্রদের জন্যে মড়া সাপ্লাই-এর ব্যবসায় কথা বলছি। শেয়াল কুকুরের দাঁতের কামড়ের চেয়ে ছেলেদের ছুরির খোঁচা অনেক বেশি মোলায়েম তাই না? আমার এ-বাতিকের কথা প্রতিমা রায় জানতেন না। জানলে তিনি কিছুতেই মিসেস মজুমদার হতেন না। আর আমিও এই বিপাকে পড়তাম না। বাতিকটা আমার এখনও আছে তাই মাঝে দু-একবার পুলিশের খপ্পরেও পড়েছি। তবে আপনার আশীর্বাদে বিপদ ঘটেনি। ওরা বুঝতে পেরেছে আমি মড়া কেনাবেচার ব্যাপারের মধ্যে নেই। আমার সকসপোর্ট-ইমপোর্টের কারবার। সবটাই ফেয়ার অ্যাণ্ড অ্যাবভ বোর্ড। হ্যাঁ, এইবার আসল কথায় আসছি। বছর তিনেক আগে একদিন শেষ রাতে আমার টালিগঞ্জের বাসা ঘেরাও করে পুলিশ আমার বাড়ী সার্চ করে। বেনামিতে বাইরে থেকে হাতঘড়ি আমাদানি করছি এই মিথ্যে চার্জে আমাকে গ্রেপ্তার করে। দিন তিনেক হাজতে থাকতে হয়েছিল। এবারেও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আমাকে ওরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বাড়ী ফিরে দেখি মিসেসের মগজ বিগড়েছে। তিনি বাড়ীর প্রতিটি ড্রয়ার, আলমারি, কাবার্ড তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন, সামনে ফুলের বাগানটার মাটি খুঁড়ে তছনছ করেছেন। তিনি নাকি পচা মড়ার গন্ধ পেয়েছেন। অতি কষ্টে তাঁকে আর বাচ্চাটাকে নিয়ে মাস তিনেক বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই। এই সময়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে আসল অসুখের সূত্রপাত। তখন আমরা পুরীতে। রাত্রে ঝড়-বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হল। তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারীর ভিড় ছিল না, হোটেলটা ফাঁকা। ঝড়ের শব্দ, বাজের শব্দের সঙ্গে সমুদ্রের গর্জন মিশে সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল পাহাড়-প্রমান ঢেউগুলো বুঝি আমাদের হোটেল বাড়ীটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। প্রতিমা ছোটবেলা থেকেই ভীরু স্বভাবের। সেই রাত্রে তার ভয়ের মাত্রা বেড়েগেল। চোখ দুটো বড় বড় করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল:

When shall we three meet again
In thunders lighting or in rain ?

ঐ ওরা আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু ওদের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি। ঐ ওরা বলছে:

Fair is foul and foul is fair : /
Hover through the fog and filthy air

—হ্যাঁ একটা কথা বলা হয়নি। সেই সন্ধ্যায় স্থানীয় পুলিশের এক ইন্সপেকটর, আমার এক পুরনো বন্ধু, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ও তাতে খুব ভয় পেয়েছিল। আর দিন কয়েক আগে একটা বুড়ী বেদেনীর কাছে হাত

দেখিয়ে ও কয়েক টুকরো হাড় আর শিকড় কিনেছিল। সেইগুলো ধারণ করলে নাকি বিপদ কেটে যাবে। হ্যাঁ কি বলছিলাম? ওঃ—সেই ঝড়বৃষ্টি। ঝড়বৃষ্টি ভোরের দিকে থামল, সকালের দিকে প্রকৃতিদেবী শান্ত হলেন। ওকে ঘুমের বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়ালাম। ভাবলাম বুঝি এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। কোলকাতায় ফিরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। পরের দিনই কোলকাতায় এলাম। ওর হ্যালুসিনেশন কাটল না। প্রথম দিকে ঝড বৃষ্টি হলেই ভয় পেত, আব ম্যাকবেথ থেকে ঐ সব লাইনগুলো আওড়াতো। আপনাকে বোধ হয় জানানো উচিত, লরেটোতে পডার সময় ওদের ক্লাসের মেয়েরা 'ম্যাকবেথ' অভিনয় করেছিল, ওকে দিয়েছিল লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা। আজ মাস ছয়েক হল, রোজ রাতে 'তিন ডাইনীর' কথা শুনেছে।

—মাস ছয়েক হল আপনার নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে। তাই না?

ঠিক বলেছেন। বাড়ীটা আমি নিজের প্ল্যানমত করেছি। জায়গাটা ফাঁকা আর চুরি ডাকাতি তো লেগেই আছে। তাই দেযালের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা গোপন খোপর রেখে দিযেছি ওর জুয়েলারীগুলো নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে। ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখাও চলত কিন্তু কে রোজ রোজ ভল্টে ছোটে মিসেসের খেয়াল মেটাতে। যেকোন দিন উনি বায়না ধরতে পারেন গয়নার জন্যে। মাথার তো ঠিক নেই। তাই এই ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থাই ওঁকে আরো বেশি মাত্রায় অব্যবস্থিত করে দিয়েছে।

প্রথম দিকেই মিসেস মজুমদারের এই কাহিনী, তাঁর 'ডিলিউশন-হ্যালুসিনেশনে'র ইতিবৃত্ত আমাকে শোনানো হয়। এরপর মিসেস মজুমদার দু-একদিন মেয়েকে নিযে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ডাইনীদের কথা ছাডাও দু-একটা কথা আমাকে শুনিযেছিলেন। জুয়েলারী বলতে সামান্য কিছু সোনা নয়। দামী পাথর, মুক্তা, সোনা সব মিলে মিসেস মজুমদারের হিসেবে কয়েক লাখ টাকার জিনিস। অনেক দিনের 'এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের' কারবার, কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি থাকা এমন কিছু বিচিত্র নয়। মিঃ, মজুমদার তাঁর স্ত্রীর ভ্যালুয়েশনকে পাগলেব প্রলাপ বলে উড়িয়েও দেননি, আবার মেনেও নেননি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িক হাসি দিয়ে আমাকে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর বিশ্বাস, এই বাড়ীর প্ল্যান যেদিন পাশ হয়, সেইদিন থেকে ডাইনীবা তাঁকে সতর্ক করে দিচ্ছে। ঐ বাড়ী তিনি চাননি, স্বামী তাঁর অনুরোধ উপরোধ না মেনে নিজের গোঁ বজায় রেখে চলেছেন। ঐ বাড়ীতে ঢুকলে তাঁদের সর্বনাশ হবে, তাছাড়া সারা দিন স্বামী বাইরে বাইরে থাকেন, একলা ঐ লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়েলারীর সঙ্গে তিনি দিনের বেলায় একলা থাকতে পারবেন না। ছোট্ট একটা মেয়েকে নিয়ে তিনতলা একটা বাড়ীতে থাকতে গেলে তিনি মারা যাবেন।

হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন তাঁর স্বামী, অথচ চাকর দারোয়ান রাখবেন না, ঠিকে ঝিই একমাত্র ভরসা। অথচ মজুমদার হেসে বলেছিলেন, ওই তো চাকর ঠাকুর রাখতে ভয় পায়।

তারা তিন ডাইনির আদেশে আমাকে মেরে ওর গয়নাগাটি নিয়ে চম্পট দেবে—এই ওর ভয়।

দিনের বেলায় ডাইনীদের কণ্ঠস্বর শোনা যেত না। দু-এক রাত্রে কি কারণে যেন তিন বোন অন্য কোথাও যেত আর কাউকে সতর্ক করতে। তার পরদিন মিসেস মজুমদারের ভয়ের ভাবটা কম থাকত। এইরকম দিনে তিনি স্বাভাবিক বাক্যালাপ করতেন। তা থেকে মোটামুটি তাঁর স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের কারণ সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছিল। আমার সেই ধারণা পাঠকদের জানাচ্ছি।

প্রতিমা রায় দক্ষিণ কলকাতার এক ব্যারিস্টারের মেয়ে। বাবা অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন, স্ত্রীর সঙ্গে খুব সদ্ভাব ছিল না। দুজনেই বাইরে বাইরে দিন কাটাতেন, আলাদা আলাদাভাবে বাড়ী ফিরতেন। এক বুড়ী আয়ার কাছে প্রতিমার প্রায় সারাদিন কাটত। লনের বুড়ো মালী আর এই আয়া তাকে ভালবাসত। মাও ভালবাসতেন তবে তিনি নানা ধরনের সোসাইটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাই মেয়ের জন্য বেশী সময় দিতে পারতেন না। বাবাকে ও খুবই ভয় পেত। তিনি খুব রাত করে ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরতেন। খুব দেরী করে ঘুম থেকে উঠেই হাইকোর্ট যেতেন। ছুটির দিন ছাড়া বড় একটা তাঁর দেখা পেত না। ওর যখন সাত বছর বয়স, তখন একটা দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হয়। একশ মিটার বেগে দুপুর রাতে গাড়ী চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনাটা ঘটে। ওর দুঃখ হয়েছিল কিনা মনে নেই, তবে ভয় পেয়েছিল খুব। সেই থেকে দুর্ঘটনার ভয় তাকে পেয়ে বসে। মা বিয়ে করলেন না কিন্তু মুক্ত জীবন যাপন করতে লাগলেন। লরেটোতে অনেক বন্ধু জুটেছিল, কিন্তু দু-একজন ছাড়া কারুর সঙ্গে ভাব হয়নি। খুব মুখচোরা না হলেও, ভাব জমাবার ক্ষমতা তার ছিল না। ইংরিজিতে খুব ভাল ছিল, তাই টিচাররা খুব খাতির করতেন। বড় হয়ে মায়ের সঙ্গে দু-একটা পার্টিতে যেতে শুরু করে। এমনি এক পার্টিতে মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হয়, পরিচয় থেকে প্রেম ও বিবাহ। মায়ের কোন আপত্তি ছিল না। তিনি ক্রমশ কেমন যেন 'ইনভ্যালিড' হয়ে পড়েছিলেন, প্রায়ই নার্সিং হোম বা হাসপাতালে যেতেন।

মজুমদার প্রতিমাকে নানাভাবে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু মজুমদারকে ও ভালবাসতে পারে নি। কাউকে ভালবাসতে হলে তাকে ভাল করে জানা দরকার। মজুমদারকে ও কোনদিন ভাল করে জানতে পারে নি, বুঝতেও পারে নি। এখনও প্রতিমা জানে না মজুমদার ঠিক কিসের ব্যবসা করে। এত টাকা সে পায় কোথা থেকে? মাঝে মাঝেই দামী গয়না ওকে উপহার

দেয়। হীরে, চুণী, পান্না, কোথা থেকে এসব আসে? পুলিশ কেন ওকে হাজতে রেখেছিল? মাঝে মাঝে কেন ওদের বাড়ী সার্চ হয়? একজনের কাছে শুনেছিল মজুমদার বিদেশে মড়া চালান দেয়, আর একজনের কাছে শুনেছে মজুমদার স্মাগলার। ও কিছুই বুঝতে পারে না। ও অনেকদিন থেকেই বাড়ীতে পচা মড়ার গন্ধ পাচ্ছে। ওর ধারণা মজুমদার মড়া চালান দেবার কারবারই করে। শুনেছে ওরা জ্যান্ত মানুষকে মেরে, বে-ওয়ারিশ বলে তাকে চালান করে দিয়ে থাকে। ওর স্বামীর অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বোধহয় ম্যাক-বেথের মত সবকিছু করতে পারে। শৈশবের অসুস্থ পরিবেশ, স্বামীর সন্দেহজনক ব্যবসা, তাকে বুঝতে বা বিশ্বাস করতে না পারার ফলে প্রতিমা কোনদিন জীবনে নিরাপত্তার স্বাদ পায়নি। স্বামীকে ম্যাকবেথের মত মনে হয়েছে, কিন্তু সে কি লেডী ম্যাকবেথের মত স্বামীর মনে উচ্চকাঙ্ক্ষার বিষ ঢুকিয়েছে? না, সে বড় হতে চায় না, বড় হতে ভয় পায়। পুরীর সেই ঝড়ের রাতে ম্যাকবেথের ডাইনীরা তাকে প্রথম সতর্ক করে দিয়েছিল। সেই থেকে তার লোভ নেই, উচ্চাশা নেই। শুধু ভয় আর ভয়ে তার সারা মন আবিষ্ট।

অমরত্ব

ব্যাগ থেকে জাবদা খাতার মত একটা নোটবই বের করে দিব্যেন্দুবাবু তাঁর কাহিনী শোনাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বললেন যে তার একটু সময় লাগবে, তাই তিনি পূর্বাহ্নে পত্রের মারফৎ দিন ও সময় নির্দিষ্ট করে দেখা করতে এসেছেন। চিঠি পড়ে মনে হয়নি দিব্যেন্দুবাবু পঞ্চান্ন বছরের মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোক। মনে হয়নি যে তাঁর মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফের জঙ্গল দেখতে পাব অথবা শুনব যে তিনি বিবাহিত, জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনটি সন্তানের জনক। প্রেমঘটিত একটা সমস্যা নিয়ে তিনি দেখা করতে আসছেন, জানতাম। চিঠিতে রোমিও-জুলিয়েট, ট্রিসটান; জাপানের সুইসাইড প্যাক্‌ট ইত্যাদি অনেক কথার উল্লেখ ছিল আর মানাসই কিছু কবিতার লাইন ছিল। দু-চারটে লাইন আমার পরিচিত, বেশির ভাগই অপরিচিত। দুটো উদ্ধৃতি তার চেহারা বা বয়সের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। যেমন: ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন / থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার; বনলতা সেন; অথবা—আমাকে সে নিয়েছিলো ডেকে / বলেছিল: এ নদীর জল / তোমার চোখের মত ম্লান বেতফল। সেই প্রচলিত পুরনো কথাটা আর একবার মনে পড়ল---সময় সময় ট্রুথ

ইজ ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। দিব্যেন্দুবাবু খাতা অথবা ডায়েরী খোলার আগেই আমার মনের মধ্যে তাঁর চিঠির আলো দু-একটা লাইন ভেসে উঠল। লাইনগুলো কেমন যেন খাপছাড়া, অসংলগ্ন; অথচ আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি কথা যেন বিশেষ অর্থবহ। দু-চারটে লাইন তুলে ধরছি: জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু প্রেম অমরত্বের আশ্বাস···প্রেমে অমৃতের স্বাদ···প্রেম কানে কানে কথা বলে···আমি প্রেমে পড়েছি···তাই আমি মৃত্যুকে জয় করেছি—প্রেম-মৃত্যু-জীবন-এই ত্রিভূজ সমবাহু—আমরা দুজনে চুক্তিপত্রে সই করেছি—মৃত্যুর পর বেঁচে থাকবার জন্যই প্রেম—ইত্যাদি। কুড়ি বাইশ বছরের ছেলের কলমে এসব কথা মানায়, কিন্তু মনে হয় না আজকার ছেলেমেয়েরা এই ধরনের সস্তা বস্তাপচা কথা ভাবে বা লেখে।

জাবদা-ডায়েরী খুলে দিব্যেন্দু আবার বললেন যে তাকে একটু বেশী সময় দিতে হবে; কেননা ব্যাপারটা বেশ জটিল ও রহস্যময়। তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই তাঁর কাহিনী পড়তে শুরু করলেন:

—আমার নাম দিব্যেন্দু বোস; বয়স ৫৬, বিবাহিত, তিনটি সন্তানের জনক স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সদ্ভাব আছে। কর্তব্য পরায়ণ ও স্নেহশীল আমাকে বলতে পারেন। পরিবারের সকলেই আমাকে ভালবাসে ও বন্ধুবান্ধবরা আমাকে পছন্দ করে। বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাবার পর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবসার দিকে আমার নজর যায়। ব্যবসায় আমি সাফল্য লাভ করেছি। অর্থ, প্রতিপত্তি, মর্যাদা—সাধারণ মানুষ যা চায়—সবই আমি আশাতীতভাবে লাভ করেছি। মেয়ে দুটিকে যথাসময়ে পাত্রস্থ করেছি, বর্তমানে ছেলেটি আমার কারখানা—অফিস দুইয়েরই ভার নিয়েছে। সে বেশ বুদ্ধিমান ও করিৎকর্মা। বাইরে থেকে কাজকর্ম শিখে এসে শক্তহাতে হাল ধরেছে; তার পরিচালনায় সবকিছু বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলছে। সাংসারিক বা ব্যবসায়িক সমস্যা আমার এমন কিছু নেই যার জন্য আপনার মত চিকিৎসকের সাহায্য নেবার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে।

এই অবধি পড়ে ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন। সেই সুযোগে আমি বললাম: প্রথমে আপনার জটিল ও রহস্যময় ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে ফেলুন। তারপর প্রয়োজন হলে আপনার অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস শোনা যাবে।

খাতাটা বন্ধ করে ব্যাগে পুরে ভদ্রলোক বোধ হয় উঠেই যাচ্ছিলেন। কি ভেবে আবার চেয়ারে বসলেন। মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা আপনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে যায় কি? শেষ কিছুই হয় না, শুধু রূপান্তর ঘটে। রক্তমাংসের দেহটা পঞ্চভূতে মিশে যায়; আত্মাটার কি হয়? তারও কর্ম বদলে

যায়, রূপান্তর হয়। আপনার কি মনে হয়? আত্মা কি পূর্বের স্তূপে ফিরে আসতে পারে? মাঝে মাঝে পারে—তাই না?

এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে হকচকিয়ে গেলাম। চিঠির কথাগুলো এখন অর্থ নিয়ে আমার কাছে দেখা দিল। বালখিল্যের চাপল্য বলে যা মনে হয়েছিল, তা এখন বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত বলে মনে হল। বললাম: আমার যা বলবার পরে বলব। এখন আপনার রহস্যময় ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। সেটা না শুনলে আমি কোন মতামত দিতে পারছি না।

তাহলে কিন্তু অতীত কাহিনীর কিছুটা অন্তত এখনই আপনাকে শুনতে হবে। আপনি রাজী আছেন? বেশ তাহলে বলছি: আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন আত্মা-চর্চা করবার একটা চক্র গড়েছিলাম। পদার্থবিদ্যার আর মনোবিদ্যার কিছু ছাত্রছাত্রী এই নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় মেতে উঠেছিলাম। আমাদের সেই সাইকিক সোসাইটির মধ্যমণি ছিল ললিতা। আমাদেরই বয়সী একটি মেয়ে। তাকে মিডিয়াম করে আমরা অনেক বিদেহী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। আমি ছিলাম চক্রের পাণ্ডা আর ললিতা ছিল সব ব্যাপারে আমার ডানহাত। আমাদের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠল। ওর মাধ্যমে আমরা জানলাম যে, আগের জীবনে আমরা বিদর্ভ বা ঐরকম একটি নগরে জন্মেছিলাম। আমাদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কোনো এক প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠীর দৃষ্টি পড়ে ওর ওপর। ওর পিতা ওকে শ্রেষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেন। আমরা তখন অন্য উপায় খুঁজে না পেয়ে এক-সঙ্গে বিষ খেয়ে পরের জীবনে মিলিত হবার আশায় আত্মহত্যা করি। এবারও, মানে এই জীবনেও মিলনের বাধা অনেক। ললিতার বাবা-কুলে-মানে-ধনে আমার থেকে অনেক উঁচু এক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলেন। ললিতা বলল, ঐ পাত্র আর কেউ নয়—সেই ধনপতি শ্রেষ্ঠী। আমরা ল্যাবরেটরি থেকে সায়ানাইড সংগ্রহ করলাম। আমাদের হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে ঈপ্সিত মিলনের আশায়। দুজনেই এই জন্ম পরিক্রমার সংকল্প নেবার পরই এক শনিবার সকালে খবর পেলাম, ললিতারা সপাত্র দার্জিলিং চলে গেছে। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় এসে একদিন থেকে স্বামীর সঙ্গে তার কর্মস্থলে চলে গেছে। চিঠি লিখে আমাকে জানিয়ে দিল যে তার পূর্বজন্মকথনে একটা ভুল হয়েছিল। আমিই পূর্বজন্মে শ্রেষ্ঠী ছিলাম আর তার এজন্মের স্বামার সঙ্গে মিলিত হবার আশাতেই সে গতজন্মে বিষপান করেছিল। আমি দিনকতক ছটফট করে বেড়ালাম, পরীক্ষার ফল ভাল হল না। আমাদের চক্র ভেঙ্গে গেল। আমি ব্যবসায়ে ডুবে গেলাম। বিয়ে করলাম, সন্তানের পিতা হলাম। বড় দরের না হোক, ছোট্ট খাট্টো শ্রেষ্ঠী আমাকে বলা যায়। আমি আমার সবকিছু নিয়ে বেশ সুখেই ছিলাম। কোনো ভাবনা ছিল

না, কোন সমস্যা ছিল না। মাস ছয়েক আগে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে আমার মনে প্রথম চিন্তাটা ঢুকল। চিন্তাটা আর কিছু নয়, অস্তিত্বের সমস্যা। সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জানলাম এই বাড়ীটার পুরনো মালিক ললিতার বাবা বছরখানেক আগে বাড়ীটা বেচে দিয়েছেন। এই বাড়ীরই একটা ঘরে তাঁর মেয়েকে এনে রেখেছিলেন। মেয়েটা নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিল। একদিন বাড়ীর লোকেরা ষ্টেশনে কাকে যেন তুলে দিতে যায়। সেই সুযোগে ঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে হাঁটা পথে ঐ পাইন গাছটার কাছে গিয়ে নীচের খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টার পর তার ভাঙ্গাচোরা দেহটা উদ্ধার করা হয়। এই খবর পেয়ে আমার মাথার মধ্যে কিরকম একটা চাপের সৃষ্টি হল। ঘটনাটা সত্যি। এই বাড়িতেই বত্রিশ বছর আগে ললিতার বিয়ে হয়েছিল, আর এই বাড়ীতেই সে আত্মহত্যা করেছে। সেই রাতে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। একটা কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে ললিতা যেন আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলছে—আমি ইচ্ছে করে তোমাকে ভুল খবর দিয়েছিলাম। তুমি শ্রেষ্ঠী নও, তুমিই গত জন্মের প্রেমিক। তোমার সঙ্গে মিলনের আশায় আমি খাদে ঝাঁপ দিয়েছি। তুমিও এস, আমার সঙ্গে এস, ঐ পাইন গাছটার কাছে গিয়ে চোখ বুঁজে লাফিয়ে পড়। আমি বললাম—আমার ভয় করে। ওর মুখে একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল। তোমাকে এজন্মে ফাঁকি দিয়েছি বলে তুমি আমাকে আগামী জন্মে ফাঁকি দিতে চাও। এই বলে সে মিলিয়ে গেল। পরের দিন কোলকাতায় চলে এলাম। কোলকাতায় এসেও সেই স্বপ্ন। কালো কাপড় পরা ললিতার মূর্তি প্রতি রাত্রে আমার কাছে আসছে। আমার ঘুম বন্ধ, প্রেসার বেড়েছে, রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিকের ডবল হয়ে গেছে। বাড়ীর লোকেরা জানে না আমার মনের খবর। তারা অনেক ডাক্তার ডেকেছে, অনেক ওষুধ খাইয়েছে; নানাভাবে আমার প্রেসার সুগার কমাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি।—আমি ব্যবসায়ে নেমেও পড়াশুনা ছাড়িনি; প্রেতলোক সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো করেছি, প্যারাসাইকলজি জার্ণালে যেখানে যত লেখা বেরিয়েছে সব ইংরিজিতে তর্জমা করিয়ে পড়েছি আর এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। উপযুক্ত মিডিয়ার অভাবে এ নিয়ে নতুন গবেষণা কিছু করতে পারিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আত্মা আছে, আত্মা দেহত্যাগ করেও পুরনো দেহ ধারণ করতে পারে। আমি বুঝতে পারছি ললিতা আমাকে ডাকছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করব? তার ডাকে সাড়া দেব কি দেব না? আমি শ্রেষ্ঠী, ললিতার গতজন্মের স্বামী; না আমি পুরন্দর—ললিতার গতজন্মের প্রেমিক? ললিতাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। ও আমাকে একবার ঠকিয়েছে। এবারও ঠকাচ্ছে কিনা কি করে জানব? আপনার কাছে এসেছি উপযুক্ত মিডিয়ার সন্ধানে। আপনি সম্মোহনবিদ্যার চর্চা

করেন শুনেছি তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। অন্য কাউকে বলতে পারছি না, জানি তারা বুঝতে পারবে না। এমনিতেই আমাকে ওরা পাগল মনে করছে। আমি কি করে বোঝাবো আমি পাগল নই। আমি স্ত্রীকে ভালবেসেছি—কিন্তু সে ভালবাসায় অমর প্রেমের, আত্মিকপ্রেমের স্বাদ পাইনি। অমর প্রেমের আস্বাদন ছাড়া অমরত্ব লাভ করা যায় না। আমি মুক্তি চাই, নির্বাণ চাই। বারবার জন্ম নিয়ে জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করার শাস্তি থেকে অব্যাহতি চাই। আর তা পারি শুধু আমার আত্মিক প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে। আপনি আমাকে এবিষয়ে সাহায্য করুন। এই জীবনযন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি প্রেম চাই, মুক্তি-চাই।

কথা শেষ করে দিব্যেন্দুবাবু আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ ভিজে গেছে। আশ্বাসের ভঙ্গীতে বললাম: আমার সাধ্যমত সাহায্য করব দিব্যেন্দু-বাবু। কিন্তু আপনি অত অধীর হলে তো চলবে না। মিডিয়ার খোঁজ পেলে আপনাকেই তো বৈঠকে বসতে হবে। সে সময় এরকম অস্থির থাকলে আপনি ললিতার সঙ্গে কনটাকট করতে পারবে না। আপনি বরং আপনার ছেলেকে ফোনে ডেকে পাঠান। আমি তাকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছি। আসল ব্যাপারটা ভাঙ্গবো না, ভয় নেই। আপনার নার্ভসগুলোকে ঠাণ্ডা করার কিছু ওষুধ তার কাছে দিতে চাই। এখন অন্তত দিন রাত আপনার ঘুম হওয়া দরকার। এর মধ্যে আমি মিডিয়া সংগ্রহ করতে পারলে চতুর্থ দিনে বৈঠকে বসতে পারেন।

কিছু আশ্বস্ত হয়ে দিব্যেন্দুবাবু বাড়ীতে ফোন করলেন। বাড়ীর লোকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ছেলে আর স্ত্রীর কাছে আরো কিছু জানতে পারলাম।

বরাবরই দিব্যেন্দুবাবু রাত জেগে পড়াশুনো করেন। প্রেততত্ত্ব, পরামনো-বিদ্যা ও পদার্থকণা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। মাঝে মাঝে তাঁকে ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশ যেতে হত। সেই সূত্রে তিনি বিদেশের নামকরা প্যারাসাইক-লজিস্টদের অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। তাদের সঙ্গে পত্রালাপ করে থাকেন। তাঁর ধারণা এমন কোনো মৌলকণার সন্ধান শীঘ্রই পাওয়া যাবে, যা মস্তিষ্কে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যম ব্যতিরেকে সাড়া জাগাতে পারে। বছর পাঁচেক হ'ল, এসব চিন্তার চেয়ে অনেক বেশী তিনি ব্যাপৃত ছিলেন মৃত্যুরহস্য নিয়ে। দেহটা তো প্রকৃতির পঞ্চভূতে মিশে যায়; আত্মা বা মন দেহমুক্ত হয়ে কোনভাবে অবস্থান করে—এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসী-মহাপুরুষদের অনেকের দ্বারস্থ হয়েছেন। কেউই তাঁর মনোমত উত্তর দিতে পারেনি। তিনি বছরখানেক ধরে কিছু কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন, কিছু কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তাও বলছিলেন। প্রায়ই স্ত্রীকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা

করতেন যে তিনি ঘুমের মধ্যে কোনো বিশেষ স্বপ্ন দেখেছেন কিনা ? মাঝে মাঝে ছেলে, ছেলের বউ ও স্ত্রীকে এক সঙ্গে ডেকে এনে বলতেন—মৃত্যুকে ভয় পাবার কিছু নেই। মৃত্যুর পরও জীবন আছে। দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে বলতে শুরু করেছেন যে, মৃত্যুকে জয় করার মন্ত্র তিনি শিখে এসেছেন। আত্মিক প্রেম নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন। সব কথার মানে হয় না, সব কথা বোঝা যায় না। বাড়ীর ডাক্তার দু'চারজন মনের রোগের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন দিব্যেন্দুবাবু মনের অসুখে ভুগছেন। বাড়ীর লোকেরা কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারছেন না।

বাড়ীর লোকের কানে সব কথা সব সময় খোলাখুলি বলা চলে না। দিব্যেন্দুবাবুর প্রথম প্রেম ও ললিতার প্রত্যাখ্যান, সফল শ্রেষ্ঠি হবার সাধনা এবং সর্বোপরি মিডিয়া সিয়ান্স ইত্যাদিতে দৃঢ়বিশ্বাস তাঁকে সবসময় অস্থির ও বিচলিত করে রেখেছে। তিনি আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বিজ্ঞানসম্মত কারণ খুঁজতে গিয়ে ভুল করেছেন ও বিড়ম্বিত হয়েছেন। এসব নিয়ে তাঁর স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আলোচনা করা সঙ্গত মনে হল না। শুধু ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে পারলে তিনি হযতো মনের দিক থেকে সুখী হতে পারতেন। দার্জিলিং গিয়ে তিনি দারোয়ানের কাছে একটা আত্মহত্যার কাহিনী শুনেছিলেন। ঐ বাড়ীতে একটা আত্মহত্যাব ঘটনা ঘটেছিল এবং বাড়ীটা ললিতাদের—এ খবর একটু অনুসন্ধান করেই জানা গেল ; আরো জানা গেল বছর দশেক আগে ললিতার মৃত্যু হয়েছে। ললিতার আত্মহত্যার ঘটনা তাঁর স্বপ্ন, তার আগে স্বামীর সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এসব খবর খুব সম্ভব দিব্যেন্দুবাবু শুনেছিলেন কিন্তু সে সব তাঁর স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। দার্জিলিং যাবার আগে থেকেই মৃত্যু ভয় তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। জীবন যৌবন ধনমান একদিন কালস্রোতে ভেসে যাবে—এ চিন্তা সকলেরই মনে আসে, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরণের মানুষের মনে এই চিন্তা 'মরবিড' প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকে মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে ফেলতে পারে। আবার এই চিন্তা ব্যক্তি বিশেষকে অন্যভাবে প্রভাবিত করে ধর্মীয় সাধনার মাধ্যমে।

অর্থসম্মান, প্রতিপত্তি কিছুই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। তবু মানুষ অমর হবার চেষ্টায় মরজগতে কীর্তি স্থাপন করে রেখে যেতে চায়। মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে চায় নিজের সৃষ্টির মধ্যে। সে সৃষ্টির স্থিতিকালই বা কতদিন ? মহাকালের নৃত্যের এক এক পদক্ষেপে লক্ষ লক্ষ মানবজন্ম নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ পৃথিবীর ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলছে। তিনদিন ঘুমের পরে কিছুটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এই কথাগুলো অন্যভাবে শোনালেন দিব্যেন্দুবাবু। আমি তাঁকে একটা কথাই শুধু বোঝাতে চেষ্টা করলাম : সন্তানসন্ততি, সমাজের অন্যান্য মানুষ এবং প্রজাতির প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে নিজের খণ্ড জীবনের একাত্মীকরণ যারা করতে চেষ্টা করে তাদের মৃত্যুভয় এমন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে না।

ঈর্ষা

প্রেম সব সময়েই কি আমাদের ঈর্ষান্বিত করে? যাকে ভালবাসি তাকে অন্য কেউ ভালবাসলে আমরা সহ্য করতে পারি না কেন? ঈর্ষা কি অযৌক্তিক প্রক্ষোভ? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। আমি গৌরীকে ভালবাসি, আমি জানি গৌরীও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু বিমল যখন গৌরীর প্রশংসা করে তখন আমার অনুরাগী বন্ধু, আপদে-বিপদে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে, তার মাধ্যমেই গৌরীর সঙ্গে আমার পরিচয়। অথচ বিমলের মুখে গৌরীর নাম শুনলে আমার মাথা গরম হয়, আমি অন্য প্রসঙ্গ তুলে গৌরীর প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাই। বিমল গৌরীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, শৈশব থেকে ওদের জানা-শোনা। গৌরী পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে, গৌরীর গানের রেকর্ড ভাল বিক্রী হচ্ছে, গৌরীর কবিতা সম্পাদকের দপ্তর থেকে ফেরত আসে না—এ সব কথা বিমলের মুখে শুনলে আমার গায়ে জ্বালা ধরবে কেন? কেন আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করব যে গৌরীর সাফল্যের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। ওরকম রেজাল্ট প্রতি বছর প্রতি বিষয়ে, অনেক মেয়েই করে থাকে; গানের কথা ও সুরে চটুলতা থাকলে—সে গান আজ-কালকার বখাটে ছেলেমেয়েদের ভাল লাগে; গৌরীর বাবার সঙ্গে সম্পাদকের চেনা আছে;—এইসব কথা বলে কেন আমি কাল গৌরীকে ছোট করার চেষ্টা করলাম? অথচ মনে মনে জানি—আমি যা বলছি তা সত্যি নয়। সেদিনই ক্লাবের ছেলেদের কাছে ঠিক এর উল্টো কথা বলেছি, বিমলের থেকে অনেক বেশী উচ্ছ্বসিত হয়ে গৌরীর গুণগান করেছি। দেবেশের কাছে দীর্ঘ চার পাতার চিঠি ভরতি শুধু গৌরী বন্দনা লিখেছি। আমার এক সময়কার প্রিয় বন্ধু বিমলের সঙ্গ আমার কাছে আজ অবাঞ্ছিত; তার সঙ্গে দেখা না হলেই আমি যেন খুশী হই। অথচ এমন একদিন ছিল যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা গঙ্গার ধারে বসে আড্ডা দিয়েছি, শেষ ট্রাম ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফিরেছি। আজ মনে হয় বিমল যদি বদলি হয়ে অন্য কোথাও চলে যায়, আমি বোধহয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। অথচ দু-বছর আগে বিমলের বদলি রদ করতে আমি একজন অফিসার হয়ে ওদের ইউনিয়নের পাণ্ডাদের খানা খাইয়েছি, তোষামোদ করেছি; ওদের কোম্পানার ডিরেকটরের বাড়ীতে ভেট পাঠিয়েছি। আজ সেই কথা মনে পড়লে নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে হয়। নিজের বোকামির মূল্য নিজেকেই দিতে হচ্ছে ভেবে এক সময় আমার কান্না পায়। দু বছরের মধ্যে এমন কি পরিবর্তন ঘটল? হ্যাঁ, একথা আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন বটে। আমিও নিজে অনেকবার এই প্রশ্নের উত্তর জানবার চেষ্টা করেছি, অনেকভাবে নিজেকে জেরা করেছি; কিন্তু উত্তর খুঁজে পাইনি। এইতো সেদিনও দিব্যি তিনজনে—বিমল, গৌরী আর আমি

গৌরীদের বাইরের ঘরে বসে শিল্পসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছি, কলকাতার ফুটবল ক্রিকেটের ক্রমাবনতি নিয়ে দুঃখ করেছি. গৌরীর গান শুনেছি, ওর মায়ের হাতের নারকেল-নাড়ু খেয়েছি। অন্য পাড়ায় থাকি বলে বিমলকে গৌরীর কাছে রেখে ওদের অনুরোধ উপেক্ষা করে দশটা বাজবার আগে কেটে পড়েছি। দু বছরের মধ্যে এমনকি ঘটেছে যার জন্যে আমার মনে বিদ্বেষের আগুন এমন প্রবলভাবে জ্বলে উঠেছে ? আমি নিজে বুঝতে পারছি না বলেই আপনার কাছে এসেছি। আমি রাত্রে ভাল করে ঘুমোতে পারি না, খাওয়ার রুচি নেই, ফুটবলের মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। বিমলের সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে অফিস থেকে বাড়ী না ফিরে বার-রেস্টুরেণ্টে গিয়ে বসি, কিম্বা ইডেন গার্ডেনের বেঞ্চিতে বসে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে বাড়ী ফিরি। মাকে বলি ওভারটাইম করছি। গৌরীর সঙ্গে দেখা করার দিন সপ্তাহে রবিবার। ঐ দিন বিমল দলবল নিয়ে ভোরবেলা পল্লীউন্নয়নের কাজে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে রাত বারোটায়। ঐ দিনটি শুধু আমার নিজস্ব। ঐ দিন গৌরীকে দেখতে যাই, কিন্তু কথা বলতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে ; ওর কথার জবাব দিতে পারি না। সারা সপ্তাহ আমি কোথায় থাকি ? আসি না কেন ? বিমলের টেলিফোনের উত্তরে ভাসাভাসা জবাব দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে দিই কেন ? সন্ধ্যায় বাড়ীতে বা ক্লাবে আমাকে পাওয়া যায় না কেন ? গৌরীর এ-সব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে আবোল-তাবোল দু-চার কথা বলে উঠে পড়ি। ক্লাবে গিয়ে সন্ধ্যায় ব্রিজের আড্ডায় বসি, খেলায় মন বসে না। গৌরীর প্রসঙ্গ উঠলে কিন্তু সজীবতা ফিরে পাই। ব্রহ্মার মত যেন তখন চতুর্মুখ হয়ে যাই। যারা আমাদের সম্পর্কে কথা জানে তারা মুখ টিপে হাসে, যারা জানে না তারা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরনো সভ্যরা জোড়ের জন্য মানিকটির খোঁজ করলেই আমার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কোনমতে দায়সারাগোছের একটা উত্তর দিয়ে উঠে পড়ি। গত রবিবার আমাকে পাকড়াও করবার জন্যই বোধহয় বিমল পল্লীউন্নয়নের কাজ স্থগিত রেখে সকালে এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে গৌরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। কথা ছিল ওর পরীক্ষার ফল বের হলেই আমাদের বিয়ের দিন পাকা হবে। ওর বিধবা মা আর দেরী করতে পারছেন না। আত্মীয়-স্বজন নানা রকম কথা বলছে। আমাদের বিয়ে ছ বছর আগেই হবার কথা। আমিই এ-কথা সে-কথা বলে সময় নিয়েছি। ও যখন বি, এ পরীক্ষা দিল তখন পরীক্ষার ফল বের হলেই শুভকাজ সেরে ফেলা হবে—এই রকম কথা দিয়েছিলাম। এখন কি বলে সময় নেব ভেবে না পেয়ে বলে বসলাম, আমার বুকের একস-রে তোলা না হলে এ-বিষয়ে আর এগুনো ঠিক হবে না ; অফিসের ডাক্তারের সন্দেহ আমার বোধহয় ফুসফুসের অবস্থা ভাল নয়। বিমল অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। আমি যে বাজে কথা বলছি, ও বুঝতে পারল। চোখ তুলে চায়ের কাপে মুখ না দিয়ে

কাপটা নামিয়ে রাখল। তারপর মায়ের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ থেকে আমার সঙ্গে দেখা না করেই বেরিয়ে গেল। মা এসে ঘরে ঢুকলেন। আরো একপ্রস্থ মিথ্যে বলার ভয়ে আমি পাঞ্জাবীটা পরে মায়ের কথার উত্তর না দিয়েই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পাড়ার পার্কে বসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করলাম। আমি কি গৌরীকে ভালবাসি না? আর কোন মেয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে! না! গৌরী ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে আমি ভাল করে চিনিই না। দু বছর আগে দুজনের মধ্যে ভালমত বোঝাপড়া হয়ে গেছে যে আমরা দুজনকে ভালবাসি। বিমলই বলতে গেলে গৌরীর অভিভাবক। তার কাছে প্রস্তাব দিতে সে আনন্দে আমাকে বুকে চেপে ধরেছিল। তার সেই আলিঙ্গনের উষ্ণতা আমি পার্কের বেঞ্চে বসে আর একবার অনুভব করলাম। গৌরীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার দিন থেকে বিমল গৌরী সম্পর্কে অনেক কথা আমাকে বলেছিল। সেদিন আরো অনেক কথা বলল। মনে আছে, সেদিন আমরা ট্যাকসি ভাড়া করে ঘণ্টা পাচেক ঘুরেছিলাম। গৌরীর প্রশংসা বিমলের মুখে শুনে মনে হয়েছিল বিমল যেন দেবদূত, স্বর্গোদ্যানের সন্ধান এনে দিয়েছে; সেই উদ্যানের দেবীর একমাত্র পূজারী হবার সৌভাগ্য ওর কৃপাতেই আমি লাভ করেছি। আজ কেন মনে হচ্ছে বিমল আমাকে ঠকাচ্ছে: আমি ওর চালাকি ধরে ফেলেছি, ওর ফাঁদ কেটে আমাকে বেরিয়ে আসতেই হবে! আমার সেই পার্কের বেঞ্চে বসে বসে মনে হল—আমি গৌরীকে ভালবাসি, গৌরীও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু বিমলও গৌরীকে ভালবাসে। গৌরী সুন্দরী, গৌরী বুদ্ধিমতী, গৌরী রেডিওতে গান করে, গৌরী অনার্সে প্রায় প্রথম শ্রেণীর কাছাকাছি নম্বর পেয়েছে। আমি যদি গৌরীর প্রেমে আত্মহারা হতে পারি, বিমলই বা হবে না কেন? তার সঙ্গে গৌরীর অনেক দিনের পরিচয়। পিতার মৃত্যুর পর এলাহাবাদ থেকে ওরা কলকাতায় এসেছে প্রায় বছর চারেক। তখন থেকে ওদের দেখাশোনার ভার বিমলের ওপর। আমার মত বিমলেরও মা ছাড়া আর কোন নিকট আত্মীয় বেঁচে নেই। সে আমারই মত স্বাধীন। গৌরীর মায়ের জ্ঞাতি সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদার ছেলে বিমল। বিয়ে আটকায় না। তবে ও কেন গৌরীকে বিয়ে করবে না? ওর নিশ্চয়ই মনে মনে বিয়ের ইচ্ছে আছে। আমি আগে থেকে প্রস্তাব দিতে ও লজ্জায় নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারেনি। আমার বাপের কিছু পয়সা আছে বটে, কিন্তু বিমল লেখাপড়ায় আমার থেকে অনেক ভাল। আমি মোটা মাইনের একটা সরকারী চাকরী করি, বিমল খামখেয়ালী না করলে আমার থেকে বড় চাকরি জোগাড় করতে পারত। সামান্য কেরাণী হয়ে থাকত না। আশ্রম সমাজসেবা ইত্যাদি কাজ যারা করে মেয়েরা তাদের শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, কিন্তু তাদের বিয়ে করতে চায় না। ঐ পার্কের বেঞ্চে বসে বসে আমার মনে হল গৌরী আমার থেকে বিমলকে বেশী শ্রদ্ধা করে। বিমলের যদি টাকা থাকত, অথবা আমার মত ও

একটা বড় দরের চাকরী করত, গৌরী ঠিক বিমলকেই পছন্দ করত। দু বছর ধরে আমার মনে হচ্ছে, হয় আমি বিমলকে ঠকিয়েছি, তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি ; কিম্বা বিমলই আমাকে ঠকাতে চাইছে—গৌরীকে আমার ঘরণী করে দায়িত্ব এড়িয়ে চিরকাল গৌরীকে প্রেমিকা করে রাখতে চাইছে। আমি নিজে ঠিকমত কিছুই বুঝতে পারছি না, তাই আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। যেদিন বিমল আমার আর গৌরীর বিয়ের প্রস্তাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে আলিঙ্গন করে, সেইদিন থেকে সন্দেহের বীজাণু আমার মনের ভেতরে বাসা বাঁধছে। ঈর্ষার তাপে তাদের ক্রমশ বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। অথচ কোনদিন এমন কিছু দেখিনি বা শুনিনি যা দিয়ে আমার সন্দেহকে সত্য বলে দাঁড় করাতে পারি। নিজেকে বিশ্লেষণ করেছি, মনে মনে বিমলকে গৌরীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বাঘা বাঘা ব্যারিস্টার দিয়ে জেরা করিয়েছি ; কিন্তু কিছুতেই সন্দেহের সপক্ষে কোন প্রমাণ খাড়া করতে পারিনি। শুধু একটা কথাই বার বার মনে হয়েছে—হয় আমি বিমলকে ঠকাচ্ছি, না হয় বিমল আমাকে ঠকাচ্ছে। এই দুটো চিন্তাই আমার পক্ষে মর্মান্তিক বেদনার কারণ। বিমলকে ঈর্ষা বা সন্দেহ করার কোন সঙ্গত কারণ না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব। আপনি মনস্তাত্ত্বিক। আপনি নিশ্চয়ই গৌরী আর বিমলের গোপন মনের খবর বের করে আমাকে বোঝাতে পারবেন যে আমি বিমলকে ঈর্ষা করে, সন্দেহ করে, কোন ভুল করিনি, কোন অন্যায় করিনি। ডাক্তারবাবু, আমাকে বলুন যে, আমি ঠিক করছি। আমি কি ভালবেসেছি বলে ঈর্ষান্বিত হয়েছি? প্রেমের শাস্তিই বোধহয় ঈর্ষা—কোথায় যেন এমনি একটা কথা পড়েছি। প্রেমে পড়লে যদি প্রাণের বন্ধুকে ঈর্ষা করতে হয়, সন্দেহ করতে হয়, তবে আমি প্রেম চাই না। গৌরী তার প্রেম ফিরিয়ে নিক। না হলে হয়তো—হয়তো আমি গৌরীকে কিম্বা বিমলকে খুন করে বসব।'

কমলবাবু বক্তব্য কিছুটা লিখে এনেছিলেন। মাঝে মাঝে লেখা থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছিলেন। কখনও বেশ স্বাভাবিক গলায় তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন, কখনও বা আবেগে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল। তাঁর নিঃশ্বাসে অ্যালকহলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। পরনে দামী পোষাক, চুল অবিন্যস্ত। দুদিনের না-কামানো দাড়ি-গোঁফে তাঁকে বিয়োগান্ত নাটকে নায়কের মত দেখাচ্ছিল। বত্রিশ বছরের যুবকটির চোখ দুটো রক্তাভ, চোখের কোণে কালি। দেখলেই মনে হয়, সারা রাত জেগেছেন এবং মদ গিলেছেন। শনিবারের এক সকালে এই 'জেলাস্ লাভার' এর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল—আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে। সব কথা তিনি ঠিকভাবে বা একটানা বলেননি। পাঠকদের কাছে আমি এইভাবে পেশ করলাম। এছাড়া

মাঝে মাঝে কিছু ইংরাজি বাংলা কবিতাও উদ্ধৃত করেছিলেন—যা আমি ডায়েরীতে লিখে রাখিনি।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝলাম ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দু বছর ধরে গৌরীকে ভালবেসেছেন আর বন্ধু বিমলকে সন্দেহ ও হিংসে করেছেন। অনেকে মনে করেন প্রেম আর ঈর্ষা বুঝি পরস্পরের পরিপূরক। কমলবাবুও ঠিক এই কথাটাই নানাভাবে আমাকে বোঝাতে চাইলেন। ওথেলোর উদাহরণ তুলে প্রশ্ন করলেন, ওথেলোর ভালবাসার তীব্রতাই তাকে ঈর্ষান্বিত করেছিল না ওথেলোর মধ্যে ঈর্ষারিপু অন্তর্নিহিত ছিল? আমি তাঁর কথায় মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম যে ঈর্ষার উদ্ভবের পেছনে সব সময় কারণ থাকে, তবে ভালবাসলেই মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষান্বিত হবে—একথা ঠিক নয়। ইয়াগোর মুখ দিয়ে শেকসপীয়র বলেছেন বটে: They are not even jealous for the cause, but jealous for they are jealous: 'its a monster be got upon itself, born on itself'.

কিন্তু ওথেলোর অবিশ্বাস সন্দেহের যথেষ্ট কারণও নাটকের মধ্যেই নিহিত আছে। ওথেলো কি সাময়িকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? ঐ রকমভাবে প্রেমিকাকে হত্যা করল কিভাবে? কমলবাবুর এই প্রশ্নের জবাবে বললাম যে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। ওথেলোর সময়কার সামাজিক রীতিনীতি, নরনারীর সম্পর্ক প্রেমের ধারণা, ওথেলোর জাতিগত বৈশিষ্ট্য—এ-সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেও আমরা বোধহয় ওথেলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ঈর্ষার সন্দেহের সঠিক কারণ আজ বুঝতে পারব না। তবে আপনার যে অনেক দিন ধরে মানসিক দ্বন্দ্ব চলছিল এবং তার ফলে আপনি একটু 'আপসেট' হয়ে পড়েছেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার অফিসের কথা, ছোটবেলার কথা, জীবনের অন্যান্য দিকের কথা জানলে আপনার বর্তমান মানসিক অস্থিরতার কারণ হয়তো বোঝা যেতে পারে। দু-তিন দিন বাদে অনেকটা সুস্থিত চিত্তে অফিসের কিছু খবর ও ছোটবেলাকার ইতিহাস শোনালেন। তা থেকে কমলবাবুর মানসিক অবস্থার ওপর অনেকখানি আলোকপাত ঘটল।

কমলবাবুর বয়স যখন পনেরো সেই সময়ে তাঁর বাবার 'সেরিব্রাল থ্রম্বসিস' রোগে মৃত্যু ঘটে। তিনি যুদ্ধের সময় বৈধ অবৈধ নানা উপায়ে অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন। গ্রামের মধ্যে নীচু জাত ও দরিদ্র বলে এক সময়ে তিনি নানাভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় এসে এক জার্মান ফার্মে সামান্য কেরানীগিরিতে নিযুক্ত হন। যুদ্ধের সময় কোম্পানী বন্ধ হয়ে যায়; তার আগে জার্মান সাহেব কমলের বাবাকে কিছু ওষুধপত্র, রি-এজেন্ট, ফাইন কেমিক্যালস খুবই অল্পদামে বিক্রয় করেন। সেই থেকে কমলের বাবার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন। সেইগুলো বাজারে বেশ কয়েক হাজার টাকায় বেচে

ঠিকাদারী কাজে লেগে পড়েন। ব্যবসার সূত্রে সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকেন, বিলিতি খানাপানিতে অভ্যস্ত হন। এক মিশনারী সেবা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ আনুকুল্য লাভের আশায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। গ্রামে বিরাট বাড়ী হাঁকিয়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি গ্রামের একজন হোমরাচোমরা হবার চেষ্টা করেন। খৃষ্টান হওয়ার পর গ্রামের উঁচু জাতের কাছে তিনি প্রকাশ্যে মনে প্রতিপত্তি লাভ করেন, যদিও আড়ালে সকলে তাঁদের তখনও টিটকিরি দিতে ছাড়ত না। মৃত্যুর কিছুদিন আগে আর্য সমাজের কৃপায় তিনি আবার স্বধর্মে দীক্ষিত হন। এইসব কমলবাবুর কিছু কিছু মনে আছে, কিছু কিছু মায়ের কাছে শুনেছেন। কোলকাতার কলেজে পড়ার সময় থেকে অবস্থা পাল্টে যায়। কে কেমন জাতের ছেলে—এ নিয়ে কলেজে কেউ মাথা ঘামাত না। দাস পদবী ছেড়ে 'রায়' পদবী ব্যাবহার করছেন বাবার আমল থেকে। এই বিমল ছাড়া এ-সব কথা বন্ধুদের আর কেউ জানতো না। বিমল ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ হলেও জাতিভেদ মানত না। গৌরীর মাও কোনোদিন বংশ পরিচয় জানতে চান নি। কমল কিন্তু কোনোদিন ভুলতে পারেনি যে—তারা নীচু জাতের মানুষ; বিমল বোধহয় মনে মনে তাকে ছোট জাতের লোক ভেবে হীন মনে করে। এই হীনমন্যতা খুব সম্ভব বিমলের প্রতি সন্দেহ ও ঈর্ষার একটা কারণ। তপশিলি সপ্রদায়ের লোক বলে সে বড় চাকরী পেয়েছে—একথা নানাভাবে অনেক জায়গায় তাকে শুনতে হত। এর ফলে হীনমন্যতার ভাব না কমে আরো বেড়েই চলেছে। আমার মন্তব্য মন দিয়ে শুনলেও কমলবাবুর মনে বোধহয় দাগ কাটল না। তিনি আগের মত ভাবতে লাগলেন প্রেমই তাঁকে বিমলের প্রতি ঈর্ষিত করেছে। বিমল গৌরীর প্রতি মনে মনে আসক্ত, বাইরে সেটা প্রকাশ করতে চায় না। আর গৌরী? গৌরী বিমলকে শ্রদ্ধা করে, শ্রদ্ধা থেকে ভালবাসা আসতে বেশিক্ষণ লাগে না।

কমল মা-বাবার বিশেষ করে মায়ের কাছে আন্তরিক ভালবাসা পেয়েছেন। ভালবাসার কাঙাল নন। মান সম্মান প্রতিপত্তি সর্বোপরি শ্রদ্ধা তাঁর কাম্য। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছেন তাঁর বাবা মার সম্মান প্রতিপত্তির জন্যে, অর্থ উপার্জনের জন্যে, দিনের মধ্যে ষোল ঘণ্টা কাজ করেছেন। অর্থ পেয়েছেন, নিজের তাঁবেদারদের কাছে সম্মান পেয়েছেন, গরীবদের ভালবাসা পেয়েছেন; কিন্তু গ্রামের পরিচিত মহলের শ্রদ্ধা কোনোদিন তিনি পান নি। তাঁর জীবনে সেইটেই ছিল সব থেকে বেশি কাম্য। কমলবাবুও প্রেমের চেয়ে শ্রদ্ধাকে বেশী মূল্যবান মনে করেন। গৌরী তাঁকে শ্রদ্ধা করে না, করবেও না এই তাঁর ধারণা।

তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হতে বেশি সময় লাগে নি। ঈর্ষা তাঁকে বেশী দিন পীড়িত করে নি।

৫

হীনমন্যতা

নিজেকে ভাল না বেসে কি অন্যকে ভালবাসা যায়? নিজেকে ভালবাসা কি স্বার্থপরতা আত্মকেন্দ্রিকতা? কোন ভালবাসা স্বার্থপরতা নয়? সদাশয়তা পরার্থপরতা নিঃস্বার্থপরতা—এই সবগালভরা নামশুনতেও বেশ, বলতেও বেশ। কিন্তু আসলে এ সব কথার জাদু শুধু নিজেকে আর অন্যকে মোহিত করার মন্ত্র। আমরা যা কিছু করি সবই আত্মতৃপ্তির তাগিদে। বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, নিজেকে ঐ বন্ধুর চেয়ে অন্যের চেয়ে উঁচু দরের জীব মনে করি। এর মধ্যে আত্মপ্রেম, স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি আছে বলতে পারেন? কোনো মিশনের মহারাজকে আপনি যখন মোটা অঙ্কের টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, আপনি তখনই অনেকখানি সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হলেন। পরার্থপরতা ইংরিজিতে যাকে অলট্রাইজম বলা হয়, আসলে অহম্মন্যতার ছদ্মবেশ নয় কি? মা সন্তানকে ভালবাসে নিজের তাগিদে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আপনি সামাজিক হিতের জন্য টাকা খরচ করেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেন কেন? পরিবর্তে নিরাপত্তা চান, যশ চান—তাই নয় কি? শিল্পপতির মন্দির, ধর্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আত্মবিজ্ঞপ্তির জন্য। বিজ্ঞাপনে লক্ষ টাকা খরচ করে কোটি টাকা রোজগার করার জন্য। আবার দুর্বল মানুষ অন্যকে ভালবাসে বা ভালবাসার ভান করে তার কাছ থেকে ভালবাসা বা বিপদে আপদে সাহায্য পাবার আশায়। তাই নয় কি?...

এইভাবে একটানা খানিকক্ষণ বকে যাবার পর চন্দ্রকান্তবাবু একটু চুপ করলেন। সামনের দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন, এবার চোখ নীচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের গেলাস থেকে এক ঢোক জল পান করলেন।

কিছুদিন আগে চন্দ্রকান্তবাবুর এক বন্ধু ওঁকে নিয়ে আমার কাছে আসেন, এক বিশেষ সমস্যা সমাধানে আমার সাহায্যের জন্য। সমস্যাটা প্রথমত চাকরী নিয়ে, দ্বিতীয়ত স্ত্রীকে নিয়ে। বছর পাঁচেক আগে নমিতার সঙ্গে আলাপ হয় দারজিলিং-এ বেড়াতে গিয়ে। চন্দ্রকান্ত একটা নামকরা কলেজের লেকচারার,

ডকটরেট-এর জন্য গবেষণা করছেন। আর নমিতা পড়া শেষ করে মফঃস্বলে একটা প্রাইভেট স্কুলে মাস্টারী নিয়েছে। চন্দ্রকান্তের মাসীর সঙ্গে নমিতার মায়ের অনেককালের বন্ধুত্ব। সেই সূত্রে প্রথম পরিচয় হয়। মাসীকে নিয়েই চন্দ্রকান্ত দারজিলিং এসেছিলেন, আর নমিতা এসেছিল স্কুলের কিছু ছাত্রীকে নিয়ে। দুই দলই একই হোটেলে বাসা নিয়েছিলেন। নমিতা মেয়েটিকে মাসীর খুবই পছন্দ। আজকালকার মেয়েদের মত পুরুষালী হাবভাব নেই। আবার আগের দিনের মত লজ্জাবতী লতাও নয়। ছোটোখাট্টো সপ্রতিভ সুশ্রী মেয়েটিকে দেখলে সবারই ভাল লাগবে। বিধবা মা ছাড়া সংসারে ওর আর কেউ নেই। মা দেশের বাড়ি আগলে পড়ে আছেন। বোনপোটিকে মাসী মানুষ করেছেন ছোটবেলা থেকে। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলার দাঙ্গায় চন্দ্রকান্তের বাড়ীর সবাই নিহত হন। গ্রামের অন্যান্য শরণার্থীদের হাত ধরে সাত বছরের ছেলে এপার বাংলায় এসে মাসীর সংসারে আশ্রয় চায়। মাসীর ছেলেমেয়েরা এখন বিয়ে-থা করে নানা জায়গায় ঘর বেঁধেছে। চন্দ্রকান্তকে সংসারী করতে পারলেই মাসী নিশ্চিন্ত হতে পারেন। দারজিলিংয়ে আসার উদ্দেশ্য নমিতার সঙ্গে চন্দ্রকান্তের মিলন ঘটানোর ব্যবস্থা করা। চন্দ্রকান্তের লম্বা-চওড়া চেহারা দেখলে বোঝা যাবে না যে তিনি লাজুক আর ঘরকুনো। পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসেও কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন নি। ছেলে বন্ধুও তাঁর খুবই কম। সমবয়সী ছেলেমেয়ের চেয়ে প্রৌঢ় শিক্ষক ও শিক্ষকস্থানীয়দের সঙ্গে তাঁর বেশি পরিচয়, তাঁদের সাহচর্য ও তাঁদের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনাতে বেশি আনন্দ পান। ছাত্র হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম থাকলেও তাঁর সাহচার্য কেউ কামনা করত না। তাঁর দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে আপ্যায়নের হাসি কদাচ ফুটে উঠতো বলে সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলত। আর সেইটেই বোধ হয় চাইতেন চন্দ্রকান্ত। দারজিলিং-এর আব-হাওয়া অথবা নমিতার ব্যবহার যে কোনো কারণেই হোক চন্দ্রকান্তের মুখে ঘন ঘন হাসি ফুটতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে এসে মাসীমা দুই হাত এক করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। মফঃস্বলের স্কুলের চাকরী ছেড়ে নমিতা শহরতলীর একটা নতুন স্কুলে চাকরী নিয়ে সেখানেই একটা ছোট ফ্ল্যাটে বিবাহিত জীবনযাত্রা শুরু করল। কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্যা দেখা দিল।

সেদিন শনিবার। নমিতা স্কুল থেকে এসে গা ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরোজা খুলতেই দেখে যে চন্দ্রকান্ত দুজন ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। জামা ছেঁড়া, চোখে আঘাতের চিহ্ন, চুল উড়ছে। ভয়ে ওর বুক কাঁপতে লাগল। ছেলেরা ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে নমিতাকে যে বিবরণ দিল তা

শুনে হতবাক হয়ে গেল নমিতা। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। বিতর্ক সভায় চন্দ্রকান্তের উন্মাদের মত আচরণে শিক্ষক, ছাত্র সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। একজন সতীর্থ তাঁর বক্তব্যে প্রতিবাদ করায় চন্দ্রকান্ত নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি ঘুসি মারতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি। তখন কিছু ছাত্র তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করেছে। ছাত্রদের ধারণা 'স্যার' এ, জি, অর্থাৎ সতীর্থ অমল ঘোষের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্ধ হয়ে এই অদ্ভূত আচরণ করেছেন। একথাও তারা জানাতে ভোলেনি যে চন্দ্রকান্তবাবু বোধ হয় নেশা করেছিলেন কেননা সে সময় তাঁর পা টলছিল কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছিল।

ছাত্ররা চলে যাবার পর যখন ডাক্তার এলেন, তখন চন্দ্রকান্ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ডাক্তার চন্দ্রকান্তের বন্ধুস্থানীয়। তিনি নমিতাকে জানালেন যে, আগের দিন সন্ধ্যায় চন্দ্রকান্ত রাত জেগে পড়াশুনো করার জন্য তাঁর কাছে কিছু ওষুধ চেয়েছিল। কিন্তু তিনি ওষুধ খেয়ে রাত জাগার পক্ষপাতী নন, তাই কোনো ওষুধ দিতে রাজী হননি। ঘটনাটা তিনি আগেই শুনেছেন এবং তাঁরও ধারণা হয়েছে কোনো 'ড্রাগ' বেশি পরিমাণে খাবার ফলেই তিনি এই উন্মাদের মত আচরণ করেছেন। ভদ্র নম্র লাজুক স্বভাবের চন্দ্রকান্তের পক্ষে এই আচরণ অন্য কোনো কারণেই সম্ভব নয়।

চব্বিশ ঘণ্টার মত বিশ্রামের পর চন্দ্রকান্ত সুস্থ হয়ে উঠলেন। লজ্জার ভাব কেটে যাবার পর তিনি স্বীকার করলেন যে তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না তাই স্নায়ু উত্তেজক একটা ওষুধের বেশ কয়েকটা বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নিয়েছেন। এতদিন তিনি সভাসমিতি এড়িয়ে এসেছেন বিশেষ করে বিতর্ক সভা সম্বন্ধে তাঁর মনে চিরকাল দারুণ ভয়। নমিতার সঙ্গে বিয়ে না হলে তিনি বিতর্ক সভায় যোগ দেবার কথা চিন্তাই করতেন না। নমিতাকে তিনি দু'একটা সভায় 'ডিবেট' করতে দেখেছেন ; আর তাঁর মনে হয়েছে তিনি যদি ওর মত সহজ অথচ দৃঢ়ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে না পারেন, তা হলে নমিতার চোখে তিনি ছোট হয়ে যাবেন। নমিতা এই ছেলেমানুষী কথা শুনে অনেকটা স্বস্তি বোধ করল, তাঁর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আদর করতে করতে জানাল যে তর্কাতর্কি করতে পারাটা খুব একটা বাহাদুরীর ব্যাপার নয়। ও-সব না করতে পারলেও চন্দ্রকান্ত তার কাছে ছোট হয়ে যাবেন না। চন্দ্রকান্ত প্রতিজ্ঞা করলেন যে আর এ দুষ্কর্ম তিনি করবেন না। কিন্তু তিনি কথা রাখতে পারেন নি। ঐ ঘটনার পর থেকে তিনি 'রিটালিন' জাতীয় উত্তেজক ওষুধ খেয়েই চলেছেন, প্রথমে দিনে দু'একটা বড়ি তারপর ডোজ বেড়ে বেড়ে এই চার বছরে প্রায় এক ডজনে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে খুবই সঙ্গোপনে স্ত্রীকে না জানিয়ে খেতেন, এখন আর লুকোচুরির

বালাই নেই। বিতর্ক সভায় যোগ দেবার প্রয়োজনে নয়। সেদিনকার ঐ লজ্জাকর আচরণের পর কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে মুখ দেখানোর প্রয়োজনে তাঁকে ওষুধের সাহায্য নিতে হয়েছে, পরে লেকচার দেবার প্রয়োজনে ওষুধের দরকার হয়েছে। এখন ওষুধ ছাড়া একদিনও চলে না। আবার ওষুধ খেয়েও তিনি নিজেকে চালু রাখতে পারেন না। সব সময় পা টলে, হাত কাঁপে, জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলেন। কলেজের ও পাড়ার সকলেই ব্যাপারটা জেনে গেছে। বিভাগীয় বড়কর্তা ও অধ্যক্ষ তাঁকে স্নেহ করেন, তাঁরা ছ'মাসের ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই শর্তে যে এর মধ্যে তিনি চিকিৎসা করে এই অভ্যাস থেকে মুক্ত হবেন; অন্যথায় চাকরী থাকবে না। নমিতাও জানিয়েছে যে ছ'মাসের মধ্যে নেশা না ছাড়লে ও স্বামীকে পরিত্যাগ করবে।

এই ইতিহাস আমি চন্দ্রকান্তবাবুর বন্ধু ও নমিতার কাছ থেকে সংগ্রহ করি। নমিতা মেয়েটি বেশ দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিমতী। প্রথম দিনই ও আমাকে খুব অল্প কথায় জানালো যে সব রকম চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হয়েছে। তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে ঝুমুরের মাথা ছুঁয়ে প্রতিদিন শপথ করেন চন্দ্রকান্তবাবু, আর পিল খাব না, আর পিল খাবো না, আর পিল খাবো না। দুটো দিন বড় জোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, তারপর যা ছিলেন তাই। ডাক্তাররা আবার আস্কারা দিয়ে ওঁর অভ্যাসটা কায়েমী করে দিচ্ছেন। তাঁরা বলেন—হঠাৎ একসঙ্গে ছেড়ে দিলে 'উইথড্রয়াল সিম্পটম' দেখা দিতে পারে, একটু একটু করে মাত্রা কমিয়ে ছাড়তে হবে। একবার নার্সিং হোমে তিন মাস আটক রেখে চিকিৎসা করা হয়েছে; বেরিয়ে এসে দু'একদিন বাদেই আবার যথারীতি নেশায় মেতেছেন। এত ওষুধ পান কোথা থেকে? ঐ ওষুধগুলো তো বিনা পয়সায় দেবার নয়। নমিতা হেসে বলল টাকা দিলে এই শহরে সবই পাওয়া যায়। এই তার শেষ চেষ্টা। এরপর আর কান্নাকাটিতে ভুলবে না। ঝুমুরকে নিয়ে ও দশে মার কাছে চলে যাবে। ঐ স্বার্থপর অমানুষের মুখ দেখতেও তার ঘৃণা হয়।

চন্দ্রকান্তবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম চাকরী হারানোর ভয়ের থেকে স্ত্রী-কন্যাকে হারানোর ভয়টাই তাঁকে বেশী করে পেয়ে বসেছে। আমাকে তিনি নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি নিজেকে ভালবাসেন বটে কিন্তু স্ত্রী-কন্যাকেও ভালবাসেন। মাসীকেও ভালবাসতেন। তাঁর অভিযোগ নমিতাই তাঁকে ভালবাসে না। সে সব বিষয়ে নিজেকে তাঁর থেকে বড় মনে করে।

আমিতো আগে এমন ছিলাম না। লজ্জা ভয় আমার ছিল বটে। কিন্তু ক্লাসে লেকচার দিতে ভয় হত না, তার জন্য পিল খেতে হত না। নমিতা চলে গেলে আমি কার কাছে থাকব? মাসীমা বেঁচে থাকলে আমি এত

ভাবতাম না আমি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর কাছে থাকতে পারতাম। ও বলে আমি নাকি পশুর মত শুধু নিজেকেই ভালবাসি, ওকে ভালবাসি না। ঝুমুরকে ভালবাসি না। নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে পিল খাই। ওদের ভালবাসি। অবিশ্যি তা ওরা বুঝতে পারে না। বলে ওদের নিয়ে বেড়াতে যাই না, সিনেমায় যাই না, জিনিস কিনে দিই না।

—মাঝে মাঝে আপনি ওদের মারধোর করে থাকেন শুনলাম।

একদিন, কি বড়জোর দু'দিন। ডাক্তার আমাকে তিন বড়ি করে বলেছিল। ও আমার বরাদ্দ ডোজ দেয়নি, তাই একটা পেপার ওয়েট তুলে —এই বলে মুঠো থেকে গোটা কতক বড়ি মুখে পুরে, আর এক ঢোক জল খেলেন ভদ্রলোক। আমি ইচ্ছে করেই বাধা দিলাম না। ওকে প্রাণখুলে কথা বলতে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

—ছোট মেয়েটার হাত মচকে দিয়েছিলেন একদিন।

সেতো 'একস্‌পেরিমেন্ট'। আমি দেখতে চেয়েছিলাম ঝুমুর নিজেকে ভালবাসে কিনা। হাত মুচড়ে ধরলাম ও চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, বুঝলাম সে নিজেকে ভালোবাসে, আমি নিজেকে ভালবাসি, ঝুমুরকেও ভালবাসি, নমিতাকেও ভালবাসি।

এতক্ষণে 'ড্রাগের' ক্রিয়া শুরু হল। জড়িয়ে জড়িয়ে টেনে টেনে চন্দ্রকান্ত বলতে লাগলেন : যাদের ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণ, যারা নিজেকে ভালবাসে না তারা অন্যকেও ভালবাসতে পারে না। বৃষ্টির জলের মত ভালবাসা ঈশ্বরের করুণা, নদীনালা ছাপিয়ে যাবার পরই জলধারা উপচে ওঠে, পাড়ের সব কিছুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। ভালবাসাও তেমনি নিজেকে ছাপিয়ে অন্যকে সঞ্জীবিত করে। নিজেকে ভালবাসা স্বার্থপরতা কেন হবে ? নিজেকে ভাল না বাসলে আমাকে ভালবাসবে কি করে ? আমি নিজের মধ্যে প্রেমের দেবতাকে অনুভব করি। আমার মন ভালোবাসায় ভরা। দেহমন উপচে সেই ভালোবাসার ধারা নমিতাকে, ঝুমুরকে স্নান করিয়ে দেবে—কিন্তু নমিতা আমাকে সুযোগ দিচ্ছে না।

একটা হতাশার ভঙ্গি করে চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন। নেশা ওঁর ভালমতই হয়েছে।

—আপনি কি সত্যিসত্যি ভালবাসতে পারেন ? যে ভালবাসে সেতো, অন্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারে। আপনি যাদের ভালবাসেন তাদের অনুরোধ তুচ্ছ নেশাই ছাড়তে পারছেন না ! এ কি রকম ভালোবাসা !

—আমি নেশা কেন, সব ছাড়তে পারি কিন্তু একটি শর্তে।

কি সে শর্ত ?

চোখের পাতা জুড়ে আসছে অতি কষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন :

এই সভ্য মানুষের সমাজ থেকে আমাকে বাইরে কোথাও যদি নিয়ে যায় আমি নেশা ছাড়তে পারি। আমি এইসব মানুষের মধ্যে থাকতে চাই না। কোন পাহাড়ের গুহার মধ্যে কিম্বা কোনো জনহীন দ্বীপের মধ্যে গিয়ে থাকলে আমি নেশা ছাড়াই বাঁচতে পারি। আমি এই রেষারেষি এই প্রতিযোগিতার সমাজে থাকলে বাঁচবো না।

—সমাজের বাইরে কি কেউ থাকতে পারে?

—সমাজ ছাড়াই মানুষ বাঁচতে পারে, নিজেকে জানতে পারে, চিনতে পারে।

—ঈশ্বর ছাড়া কেউ তা পারে না।

—তাহলে আমি ঈশ্বর। চন্দ্রকান্ত চেয়ার-থেকে দাঁড়িয়ে উঠলেন। স্থির দৃষ্টিতে সামনের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলে চললেন: তা হলে আমি ঈশ্বর, আমি এ যুগের ঈশ্বর। সমাজের বাইরে আমি বেঁচে থাকব বিশ্বসৃষ্টির অনেক আগে আমি আমাকে আমার ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। আমি আমার সেই অজাতশত্রু মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। শুধু আমি আকাশ আর সমুদ্র। আমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে আমার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করতে আমার আত্মজনকে হত্যা করতে অন্য কোনো প্রাণী তখনও সৃষ্টি হয় নি। মাঝে মাঝে পিল খেয়ে আমি একটা স্বপ্ন দেখি। বিশাল এক রণক্ষেত্র, শহরের বুক চিরে মুহুর্মুহু কামান গর্জে উঠছে। বিরাট এক ট্যাঙ্কের কামানের ওপর দাঁড়িয়ে খোলা তলোয়ার হাতে আমি চলেছি। একচক্ষু দৈত্যের মত সামনের সার্চলাইট থেকে আলো ফেলে গর্জন করে ছুটে চলেছে ট্যাঙ্ক। সারিবাঁধা ক্ষুদে মানুষের দল মাটিতে শুয়ে পড়ে আমার কাছে, তাদের ঈশ্বরের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছে। ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়ে তাদের কাতর আর্তনাদ আমার কানে পৌঁছুচ্ছে না। আমি ওদের জীবন-বিধাতা ওরা আমাকে হিংসে করে, ভয় করে। কিন্তু আমি ওদের জীবন ভিক্ষা দিতে পারি না, তাহলে আমি বাঁচবো না। আমাকে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে আমাকে ওরা—আমাকে ওরা—

কথা একেবারে জড়িয়ে গেল। টলতে টলতে পাশের সোফায় গিয়ে দেহটা এলিয়ে দিলেন চন্দ্রকান্তবাবু। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের কোণে জল। সোফায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলেন।

পরের দিন অনেকটা শান্ত দেখলাম চন্দ্রকান্তকে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বাবার হত্যাকাণ্ড বালক চন্দ্রকান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। টুকরো টুকরো করে তাঁকে কেটে ফেলতে দেখেছেন। তখন তিনি উঠোনের একপাশে খড়ের গাদার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। দেখতে দেখতে বোধহয় চেতনা হারিয়েছিলেন জ্ঞান হলে মনে পড়ে পাড়ার এক প্রৌঢ়ার কোলে নৌকোর মধ্যে বসে। তিনি

আরও বললেন, তাঁরা গ্রামের জমিদার ছিলেন, তাঁর ঠাকুরদার আমলে নাকি গরীব প্রজাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত।

—এক প্রজন্মের ঋণ অন্য প্রজন্মে শোধ করেছে প্রজারা—এই সব ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারি?

অনেকটা স্বাভাবিকভাবে কথা বললেন। মনে হল বোধ হয় সেদিন পিল খেতে ভুলে গেছেন।

সকলকে আমি হিংসে করি, ভয় করি। নমিতাকেও হিংসে করি বোধহয়। নিজেকে হীন মনে হয়, অভিশপ্ত মনে হয়। বিয়ে না করাই বোধহয় ভাল ছিল। কিছুতেই আমি নিজেকে নমিতার সমকক্ষ ভাবতে পারি না। এই পিল খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো অসামাজিক কাজ সজ্ঞানে করেছি বলে মনে পড়ে না। তবু কেন মনে হয় আমি কলঙ্কিত। আমাকে হারিয়ে দেবার জন্য হীন প্রতিপন্ন করার জন্য সকলেই ষড়যন্ত্র করছে? মনে হয় প্রথম-দিন থেকেই অমল ঘোষ আমাকে কৃপার চোখে দেখছে। তাই তো সেদিন পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম ওকে শাস্তি দিতে। বিয়ের পর নমিতা অতিমাত্রায় সহানুভূতি দেখাত, বড্ড বেশি ভালবাসার কথা বলত। আমি সহ্য করতে পারতাম না। মনে হত সব বানানো সব সাজানো। নমিতাকে আমি মিথ্যে বলেছি, বিতর্ক-সভার অনেকে আগে থেকে বিয়ের পরদিন থেকেই আমি পিল খেতে শুরু করি। এম এ পরীক্ষার সময় এক বন্ধুর পরামর্শে কিছুদিন রাত জাগবার জন্য ঐ পিল খেয়েছিলাম। বিয়ের পর মনে হল, পিল না খেয়ে আমি নমিতার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারব না, ওর গায়ে হাত দিতে পারব না, ওকে চুমু খেতে পারব না। তখন শুধু সন্ধ্যার সময় এক-আধটা খেতাম। সেদিন বিতর্ক সভার আগে গোটা চারে এক সঙ্গে খাই। তারপর যখন অমল ঘোষ আমার থিসিসের বিষয় নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দিতে শুরু করল, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে অন্যের অলক্ষ্যে আরো গোটা চার পাঁচ পিল খাই। 'আত্মপ্রেম ও করুণা'—এই নিয়ে আমার গবেষণা। ডাক্তারবাবু, আমি কি সুস্থ হতে পারব? পিল ছাড়তে পারব? নমিতা আমাকে হয়তো অনুকম্পার চোখে দেখে, হয়তো ভালবাসে না। কিন্তু আমি ওদের ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না। আমাকে এই মারাত্মক আসক্তির হাত থেকে কি বাঁচাতে পারবেন?

৬

আত্মমর্যাদার অন্বেষণে

প্রসূনবাবুর মুখে স্ত্রী লতিকার সঙ্গে তাঁর মনান্তরের বিবরণ শুনলাম।

প্রায় দশ বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে, তখন ওর বয়স ছিল ষোলো, আমার বত্রিশ। প্রথম বছর পাঁচেক বেশ শান্তিতেই ছিলাম, কিন্তু গত পাঁচ বছরে ওর অত্যাচারে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। বছরে তিন-চার বার ও একেবারে ক্ষেপে যায়। সামান্য কথাকাটাকাটি থেকে একেবারে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। ছেলেদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে, বাধা দিতে গেলে আমার গায়েও ডুচার ঘা দিতে কসুর করে না। চ্যাঁচামেচির ফলে বাড়ী শুদ্ধ লোক জড় হয়, মাঝে মাঝে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে পড়ে, আশে-পাশের বাড়ীর বৌঝিরা জানালা দিয়ে উঁকিঝুকি মারতে থাকে। আমি রেগে কোন কথা বললে হন-হন করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সোজা ট্যাকসি করে যায় ভবানীপুর থেকে দমদমে দিদির বাড়ী। ছেলেটার বয়স আট, মেয়েটার পাঁচ। এখন ওরা মায়ের জন্য কান্নাকাটি করে না। কিন্তু প্রথম প্রথম ছেলেটা তখন চার, মেয়েটার এক বছরও পেরোয় নি, ওদের কান্নাকাটিতে বিব্রত হয়ে আমি ফোন করে ও দিদির বাড়ী গিয়ে মান ভাঙ্গিয়ে ওকে নিয়ে আসতাম। অনেক বার আমাকে সম্মান খুইয়ে দমদম ছুটতে হয়েছে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে। বাড়ীতে এর জন্যে আমার পজিশন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা দুই ভাই। আমিই বড়। ছোট ভাই আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, বাবা-মাও আমাকে ভালবাসেন—তাঁদের কথা বলছি না। আমার পজিশন নষ্ট হয়েছে বৌমার কাছে। বৌমা লেখাপড়া জানা বড় ঘরের মেয়ে। ওর বাবার বিরাট কারবার, খানকতক বাড়ী আছে এই শহরে। লতুর পাগলামিটা ছোট ভাইয়ের বিয়ের পরই শুরু হয়েছে। তাতেই লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। বৌমাকে ও হিংসে করে আর সেটা বাড়ি শুদ্ধ সবাই বুঝতে পেরেছে।

—কি নিয়ে হিংসে করে? একটু বুঝিয়ে বলুন।

—তা হলে আর একটু গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। আমাদের সোনা-রূপোর কারবার। তিন পুরুষ ধরে আমরা ব্যবসাই করে আসছি। গুরুর আশীর্বাদে এই কলকাতা শহরে আমাদের খানচারেক দোকান, কারখানায়

পঁচিশ-তিরিশজন লোক কাজ করে। এ ছাড়া আমরা আজকাল রপ্তানীর কারবারেও নেমে পড়েছি। দোকানগুলো সব বাবা দেখাশুনো করেন আর নতুন ব্যবসাটা পুরোপুরি ছোট ভাই-এর হাতে। আমি ডাক্তারবাবু একটু শান্তিপ্রিয় মানুষ, ঐসব কারবারের ঝুটঝামেলা আমার সহ্য হয় না। ছোটবেলা থেকে ধর্ম-কর্মের দিকেই আমার ঝোঁক।

আর এই নিয়ে ওর যত আক্রোশ। আমি কেন পূজুরী বামুনের মত থাকব? কেন বড় ভাই হয়েও বাড়ীতে আমার প্রেষ্টিজ নেই?...দিনরাত্র এই সব নালিশ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা।

—আপনি কি ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে একেবারেই থাকেন না? বাড়ীর কোন কাজ আপনি দেখাশোনা করেন?

—ব্যবসা ছাড়া কি বাড়ীর আর কোন কাজ নেই? অনেকটা জায়গা নিয়ে আমাদের বাড়ী। ভাড়া দেবার জন্যও বাবা খানকতক বাড়ী করিয়েছে। এ-সবের মেরামতি তদারকি আমাকেই করতে হয়। তাছাড়া গৃহদেবতা আছেন, তাঁর নিত্যকর্মের সব ব্যবস্থাই তো আমাকে দেখতে হয়। এই সব লতুর কাছে কাজই নয়। রেগে গেলে বলে এ সব নাকি দারোয়ান গোমস্তার কাজ। গড়িয়াতে আমাদের একটা বাগান আছে, ফুলফল, তরিতরকারীর তত্ত্বতলাশ করতে সপ্তাহে দু-তিন দিন সেখানে যেতে হয়। সেটা নাকি মালির কাজ। আসলে বৌমাকে ও দেখতে পারে না। বৌমা কেন রোজ গাড়ী করে ঘুরবে, বৌমা কেন এত বড় ঘরের বউ হয়ে মাষ্টারনীর মত ছেলে পড়াতে যাবে।

—আপনার ছোট ভাই-এর বউ কি কাজ করেন?

—বয়স্কদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে গাড়ী করে দুপুরবেলা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। গাড়ীখানা ওর বাবা দিয়েছেন। আমার স্ত্রী খুব দরিদ্র পরিবারের মেয়ে, বৌমাকে তাই ও একেবারে দেখতে পারে না! এখন ভাবি—কেন যে মায়ের কান্নাকাটিতে বিয়ে করতে রাজি হলাম। বাড়ী শুদ্ধ সবার নার্ভের ওপর দারুণ চাপ পড়ছে, লতুর এই পাগলামি আমরা সহ্য করতে পারছি না। ডাঃ সাহা বলেছেন ওকে মনের রোগের হাসপাতালে পাঠাতে, কিন্তু আমরা রাজী হতে পারছি না। মা-বাবা তো ভাবতেই পারেন না যে তাঁদের বাড়ীর বউ পাগলা গারদে থাকবে। চারিদিকে একেবারে ঢি ঢি পড়ে যাবে, আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। আমরা ডাক্তার সাহাকে বলে দিয়েছি—না। এমনি বাড়ীতে রেখে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না কি?

—রোগীকে আমি দেখি নি, জানি না। আমি কি করে বলব? তিনি যে পাগল—এ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত হলেন কি করে?

এইবার একটু হাসলেন ভদ্রলোক। পাঞ্জাবীর হাতা তুলে দেখালেন তাঁর

বাঁ হাতের অনেটা জায়গা ব্যাণ্ডেজ করা রয়েছে। নতুন কীর্তি। ছেলেটাকে কাঁচের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিল হাত দিয়ে আটকে দিতে, ক্ষেপে গিয়ে পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে ওর হাতে কয়েকবার আঘাত করেছে। ডু-একটা ষ্টিচ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হয়। ছেলেটাকে নিয়ে তিন চার মাস অন্তর দমদম যায়। এযাবৎ বরাবর দু-একদিনের মধ্যেই দমদম থেকে ফিরে এসেছে। যখন ফিরে আসে তখন ওকে দেখলে মনেই হবে না যে দু দিন আগে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তাণ্ডব নৃত্য করে গেছে। পাগলামির ঝোঁক যেমন হুট করে আসে, তেমনি ধাক্কাটা ঝট করে চলে যায়। এবার কাটছে না। আজই ওর দিদি ফোন করেছিলেন—এবার অন্য রকম হয়ে গেছে, কিছুতেই ভবানীপুর ফিরবে না, ভিক্ষে করে খাবে তবু শ্বশুরবাড়ীর অন্ন মুখে তুলবে না।

—চিকিৎসাতে তিনি রাজী হবেন কি?

—ওর দিদি বলেছেন রাজী করাতে পারবেন। আমার বাড়ীতে ফেরার জন্যে নয়, রাগ কমানোর জন্যে ও-চিকিৎসা করতে রাজী আছে। রাগ পড়ে গেলে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে করতে বলে—আমি কি করব? আমি যে সামলাতে পারি না। রোজ সকালে উঠে ঠাকুরের কাছে ও নাকি প্রার্থনা করে, রাগ কমানোর জন্যে ঠাকুরকে ডাকে, কিন্তু রাগ কমে না। ওষুধপত্রও অনেক খেয়েছে শুধু ঘুম বেড়েছে—আর কোন ফল হয় নি। ওষুধের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মারধোর চেঁচামেচি করে না—এই পর্যন্ত।

লতিকা যা বলল তার সারমর্ম এই: আমার ছেলে-মেয়েদের হেনস্থা করা হয় ও বাড়ীতে। কারণ কি জানেন? আমরা গরীব। ছেলে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াত, কিছুতেই সংসার করবে না, পড়াশুনো কাজকর্মে কোন দিন মন ছিল না। শ্বশুর ভাবলেন যেমন করে হোক ছেলের বিয়ে দিতে পারলে বুঝি তাকে ঘরমুখো করতে পারবেন। এক বিয়ে বাড়ীতে আমাকে দেখে আর গান শুনে শাশুড়ীর খুব পছন্দ হল। তখন সত্যিই দেখতে ভাল ছিলাম, গানের গলাটাও ভগবান ভালই দিয়েছিলেন। ভজন গাইতে গেলে এখনও চোখের জল আটকাতে পারি না। স্বামীকে অনেক কসরৎ করে ওঁরা আমার গরীব দিদির বাড়ীতে এনে আমার গান শোনালেন। স্বামী ঠাকুরদেবতার গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। চেহারা দেখে নয়, উনি বলেছেন গান শুনে ওঁর মন টললো, বয়সের ফারাকটা তখন আর ওঁর কাছে তেমন কিছু একটা বেশি মনে হল না। উনি রাজী হলেন। শ্বশুর-শাশুড়ী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বংশের বড় ছেলেকে ঘরমুখো করতে পেরে ওঁরা সত্যি খুশী হলেন। বিয়ের পর পাঁচ বছর স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। রূপকথার সেই ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ে যেন রাজরাণী হল। আমাকে ঘিরে রোজ সন্ধ্যায় আসর বসত। আমি ভজন গাইতাম, পদাবলী শোনাতাম, বাড়ীর ঝি-চাকর-দারোয়ান-ড্রাইভার সব উঠোনে

জড় হয়ে আমার গান শুনত। শাশুড়ী আর স্বামী নিয়মিত হাজির হতেন গানের আসরে। স্বামীর উড়োনচণ্ডীপানা অনেকটা কমল, তীর্থভ্রমণের নেশাটা কাটল। আমাকে নিয়ে ফি বছর গরমে পাহাড়ে, শীতে কোন জায়গায় বেড়াতে যেতেন। চার বছরে আমি দুটো বাচ্চার মা হলাম। এই সময় নানা বিদ্যা-বিশারদ হয়ে কান্তি বিদেশ থেকে ফিরল। তাকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল। নতুন ব্যবসা শুরু করল সে। সেই ব্যবসা-সূত্রে আলাপ হল গীতার বাবার সঙ্গে। কিছু দিনের মধ্যেই গীতার সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হল। গীতা বি. এ পাশ; গীতা গাড়ী চালায়। গীতা পিয়ানো বাজায়, বাড়ীর সবাই রাতারাতি গীতার ভক্ত হয়ে উঠল। আমার ছেলেটাকে তো গীতা একেবারে বশ করে ফেলল। কাকীর কাছে নাওয়া-খাওয়া, কাকীর সঙ্গে গাড়ী করে বেড়ানো, কাকীর কাছে ঘুমুনো—আমার সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায় চুকেই গেল। শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী সকলকেই যেন তুক করল গীতা। জানেন বোধ হয় ওদের গয়নার দোকান আছে। নতুন ডিজাইন তৈরী করে গীতা। ঠাকুরপোর বাইরে গয়না, খেলনা পাঠাবার ব্যবসার ব্যাপারেও গীতার পরামর্শ নিতে হয়। এতসব করেও গীতা দুপুরে গাড়ী করে অন্য-বাড়ীর কাজের লোকদের লেখা-পড়া শেখাবার স্কুলে যায়, নিজে মাষ্টারী করে। আমার স্বামী?—শুধু স্বামী কেন বাড়ীর সবাইয়ের মুখে শুধু গীতার প্রশংসা। আমার গানের আসরের শ্রোতা কমতে লাগল, বছর খানেকের মধ্যে আসর উঠেই গেল। বিলিতি বাজনার টং টং শোনবার জন্যে ভিড় জমতে লাগল গীতার ঘরের আশেপাশে। এক সন্ধ্যায় পিয়ানোর বাজনা শুনতে শুনতে আমার মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল। হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে একটা কিছু বাজাতে গেলাম, ভাল লাগল না, সব যেন কেমন বেসুরো বেয়াড়া হয়ে গেল। এই সময় স্বামী কি একটা কাজ করে ঘরে ঢুকলেন। ভাবলাম বোধ হয় পিয়ানোর আসর থেকে আমার ভজন শুনতে এসেছেন। আমি ওর ফেভারিট গানটা—যেটা শুনে উনি বিয়েতে মত দিয়েছিলেন, সবে ধরেছি এমনি সময় উনি বললেন, লতু তোমার কাছে মাথা ধরার কোনো ট্যাবলেট আছে? আমার ড্রয়ারে দুটো ট্যাবলেট ছিল খুঁজে পাচ্ছি না। গীতার পিয়ানো শুনতে আজ এক্সপোর্ট কণ্টেনারের বড় কর্তারা এসেছে কিন্তু ও মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

আমার গান বন্ধ হয়ে গেল, মনে হল আমার গলাটা যেন উনি দুহাত দিয়ে চেপে ধরেছেন। মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল, হারমোনিয়ামের ডালাটা দিয়ে টেবল ল্যাম্পের ওপর আঘাত করলাম, বাল্বটা ভেঙ্গে গেল, ঘর অন্ধকার কিন্তু আমার চোখের সামনে আলোর ঝিলিমিলি।

প্রথম দিনের ইতিবৃত্ত বলতে বলতে মেয়েটির চোখেমুখে অস্বাভাবিক ভাব ফুটে উঠল। মুখে কে যেন সিঁদুর লেপে দিয়েছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে

আসছে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল: আমার ভয় হচ্ছিল, অতি কষ্টে সামলে নিয়েছি। এইরকম হয় বুঝলেন। তখন আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না। সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। তখন বোধ হয় আমি মানুষ খুন করতেও পারি। আমি পাগল নই ডাক্তার বাবু, আমার মধ্যে কে যেন ভর করে তখনকার মত জ্ঞানগম্যি লোপ পায়। মাথা ঠাণ্ডা রাখার অনেক ওষুধ খেয়েছি। অনেক তেল মেখেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমি চাই না আমি আমার খোকনকে মারি, আম চাইনা চ্যাচামেচি করে বাড়ির লোকের হাসির খোরাক জোগাই, কিন্তু আমি কিছুতেই রাগ সামলাতে পারি না। এর জন্য দায়ী কে জানেন? ঐ উনি—এই বলে স্বামীর দিকে আঙুল তুলল।

—উনি কি আপনাকে অযত্ন করেন?

ওঁর যত্ন-অযত্নের কি দাম আছে? বাড়ীর দারোয়ানের যেটুকু ক্ষমতা আছে ওঁর সেটুকুও নেই। বাড়ীর বড় ছেলে হয়েও ওঁর কোনো ক্ষমতা নেই। মার্কেটে যেতে গেলে একটা গাড়ী পাব না, সিনেমায় যেতে গেলে ট্যাকসী ডাকতে হবে, অথচ বাড়ীতে তিন তিনখানা গাড়ী। আমার দরকার—

এইখানে স্বামী বাধা দিলেন। তিনখানা নয় দুখানা; একটাতো গীতার নিজস্ব। আমার ছেলেমেয়েকে গীতা নিজে গাড়ী করে স্কুলে নিয়ে আসে; অন্য দুখানা আপিস-দোকানের কাজে রাত আটটা পর্যন্ত আটকে থাকে।

আমাকে বলতে হল, ওঁকে ওঁর কথা বলতে দিন প্রসূনবাবু বাধা দেবেন না। আচ্ছা আপনি শ্বশুরবাড়ী ফিরতে চাইছেন না কেন? রাগ কমানোর চিকিৎসা তো বাড়ী থেকেই হতে পারে।

ওখানে আমাকে কেউ চায় না। ছেলে-মেয়েদেরও ওঁরা বুঝিয়েছেন—আমি পাগল, আমার কাছে আসতে নেই। তাছাড়া ওখানে আমার অবস্থা দাসীবাদীরও অধম। একটা শাড়ী কিনতে হলেও আমাকে দরবার করতে হয় স্বামীর কাছে, স্বামীকে দরবার করতে হয় তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে—

আবার বাধা দিলেন প্রসূনবাবু: মিথ্যে কথা বলো না, কোন জিনিসের জন্য তোমাকে দরবার করতে হয় নি কোনদিন। ডাক্তারবাবু আমাদের সেই সেকেলে যৌথ পরিবার। কাপড়জামা কেনাকাটার ব্যাপার বছরে দুবার। পুজোতে আর নববর্ষে। মাঝে কারুর কোন শখ হলে বাবাকে জানাতে হয়। এর মধ্যে অন্যায় কি আছে—বলুন তো?

গীতা তোমার বাবার কাছে হাত পাততে যায়? সেদিন ওর ছোট বোনকে দেড় হাজার টাকার রেকর্ড প্লেয়ার দিল, তোমার বাবার কাছে দরবার করেছিল সে জন্যে? ঠাকুরপোর অ্যাকাউন্টে টাকাটা খরচা লেখা হল? আর

আমার বেলায় পঞ্চাশ টাকার একটা শাড়ীর জন্যে তিন দরবারে ধর্ণা দিতে হয়—উত্তেজিত হয়ে উঠল মেয়েটি।

—আমি সেকেলে মানুষ, আজে-বাজে জিনিষ কিনে টাকা নষ্ট করতে আমার ইচ্ছে করে না। আমার নিজের বছরে দু'খানা ধুতি আর তিনটি হাফসার্টের বেশি কিছু দরকার হয় না। রেকর্ড প্লেয়ার টেপরেকর্ডার, হাজারো রকমের গ্যাজেট নিয়ে মেতে থাকা এ যুগে একটা ব্যাধি। মানুষের প্রয়োজন ইচ্ছেমত বাড়ানো যায়। আমার তাতে সায় নেই। স্বামী গম্ভীরভাবে মত প্রকাশ করলেন।

—নিজের বেলায় আর নিজের বৌ-এর বেলায় যত ধর্মজ্ঞান আর বক্তৃতা। ঠাকুরপোর বেলায়, গীতার বেলায় কই—এসব বক্তৃতা কোথায় তোলা থাকে? ভণ্ড তপস্বীর মুখোশ খুলে দিতে আমার এতটুকুও আটকাবে না বলে দিচ্ছি। ক্ষমতা নেই তাই বল! তা না যত সব বড় বড় কথা!—হাঁপাতে লাগল মেয়েটি।

স্বামীর কোন উত্তেজনা নেই। আমি ইঙ্গিতে তাঁকে বাইরে যেতে বললাম।

স্বামী বাইরে যেতেই লতিকা টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কয়েক মিনিট ধরে কাঁদল, তারপর চোখ মুছে, চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে ভাঙা গলায় বলতে লাগল: আসলে গরীবের মেয়ে বলে স্বামী আমাকে নিজের লোক ভাবতে পারেন না, মনে মনে আমাদের বাড়ীর সবাইকে ও'দের থেকে ছোট মনে করেন। শ্বশুর-শাশুড়ী অন্য রকম, তাঁরা সত্যিই ভালমানুষ, আমাকে গরীব বলে কোনদিন অবহেলা করেছেন বলে মনে হয় না।

—তবে আপনি ও বাড়ীতে ফিরে যেতে চান না কেন?

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—কি করে যাই বলুন। এবার রাগের মাথায় শ্বশুরমশাইকে যা তা বলে গাল দিয়েছি। একটা গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিলাম, ভাগ্যি ভাল, তাঁর গায়ে লাগে নি। আমি যেতে চাইলেও স্বামী আমাকে নেবেন না।

—কি হয়েছিল সেদিন? কেন এত রেগে গিয়েছিলেন?

অশ্রুসজল চোখে মেয়েটি ঘটনার বিবরণ দিল: ছেলেমেয়েকে ওদের কাকী আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, আমার চেয়ে ওরা কাকীকে বেশি ভালবাসে আমারই দোষ। অত মারধোর করলে ভালবাসবে কি করে? তাছাড়া বাড়ীর কাজের লোকেরা পর্যন্ত যাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাকে ওরা শ্রদ্ধা করতেও পারে না। সেদিন গীতাদের বাড়ীতে ও বাড়ীর সবার নেমন্তন্ন, আমারও। গীতার দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন হচ্ছে খুব ঘটা করে। রাত পর্যন্ত আমি ভালই ছিলাম, গীতার বাড়ী যাব বলে ভল্ট থেকে গয়নাগুলো

আনিয়ে রেখেছি, শাড়ী ব্লাউজ গুছিয়েছি, সকাল সকাল তিনটে গাড়ী করে আমরা বেরিয়ে পড়ব ব্যবস্থা হয়েছে। হঠাৎ সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে রেডিওতে সেই গানটা শুনলাম। যেটার কথা একটু আগে আপনাকে বলেছি। স্বামীর খাটের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত ছোঁয়ালাম আমার সারা গায়ে কি একটা শিহরণ……মনে হল যেন দশ বছর আগের সেই দিনটাতে ফিরে গেছি। ভোরের নরম আলো মৃদু বাতাস আমাকে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল। ও'র ঘুম ভাঙছে না দেখে রাগ হল। একটু জোরে ধাক্কা দিতে উনি ধড়মড় করে উঠে বললেন—কী ব্যাপার? আমি বললাম রেডিওতে সেই গানটা হচ্ছে। হাই তুলে বললেন, রেডিওটা বন্ধ করে দাও, মিছিমিছি ঘুম ভাঙিয়ে দিলে—বলে আবার শুয়ে পড়লেন। আমার ভেতরটা কেমন করে উঠল। রেডিওটাকে তুলে নিয়ে মেঝের ওপরে ফেলে দিলাম। বেশ জোরে শব্দ হল। স্বামীর ঘুম ভাঙল না, ভাঙলেও উনি সাড়া দিলেন না। আমার রাগ-অভিমান জানাবার জায়গা নেই ভেবে বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। তখনি দুমদাম করে তেতালায় উঠে গীতার দরজায় ঘা দিলাম। চোখ মুছতে মুছতে গীতা বেরিয়ে আসতেই বললাম—খোকনকে তুলে দাও এখুনি। ওর চোখে মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল কিনা দেখবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমি ঘরে ঢুকে ছেলেটাকে টেনে তুলে টানতে টানতে নিজের ঘরে এনে কাপড় জামা পরে ওকে রেডি হতে বললাম। ততক্ষণে স্বামী জেগে উঠেছেন, গীতা নেমে এসেছে, খোকন কান্না জুড়ে দিয়েছে মেয়েটাও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। নিশ্চয়ই সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড, কিন্তু সে সব বোঝার মত মনের অবস্থা ছিল না।

কোথায় যাবে এত সাত সকালে? একটু বাদেই তো গীতাদের বাড়ী যেতে হবে। স্বামী বার বার এই সব কথা বলছিলেন, সবটা আমার কানে যাচ্ছিল না। সুটকেস গোছাতে গোছাতে বললাম, স্বপ্ন দেখেছি দিদির খুব অসুখ, আমাকে এখুনি যেতে হবে। গীতা বলল, লোক পাঠিয়ে খবর নিতে। স্বামী বললেন তিনি পাশের বাড়ীতে ফোন করে খবর নিচ্ছেন, স্বপ্ন দেখেই ছুটতে হবে কেন? আমি কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলাম। ওরা আমায় চেনে কাজেই বাধা না দিয়ে বলল,—তুমি যাবে যাও কিন্তু ছেলেমেয়েকে নিতে পারবে না। ওরা যেতেও চায় না। আমি তখন ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছি আর বোধ হয় বলছি—যেতে হবে, যেতে হবে। আমার ছেলে আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাব কেউ বাধা দিতে পারবে না। কখন শ্বশুরমশায় এসে ঘরে দাঁড়িয়েছেন টের পাই নি। তিনি বোধ হয় একটু রুক্ষভাবে বলেছিলেন—এ সব পাগলামি ছেড়ে দাও বউমা, আমি এখুনি দারোয়ান পাঠিয়ে দমদম থেকে খবর আনছি।

গাড়ী করে যাবে, গাড়ী করে আসবে, এক ঘণ্টার মধ্যে তুমি দিদির খবর পেয়ে যাবে। আমার মনে আছে, বেশ মনে আছে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম আর বলেছিলাম : বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে অসভ্য ইতর সব। ভোর বেলায় হল্লা করতে এসেছেন আমার ঘরে। তারপর টিপয় থেকে জলভরা গেলাশটা ছুড়ে মেরে নিজের স্যুটকেশটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

লতিকা আবার আস্তে আস্তে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

৭

বিপর্যস্ত অবচেতন

সরাসরি মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম : তুমি এরকম করলেতো পাড়ায় তিষ্টুতে পারবে না। বাড়ীওয়ালা বড়লোক, পাড়ার লোকেরা তার হাতধরা, তাকে চটিয়ে ও-বাড়ীতে থাকবে কি করে ?

—আমি ও বাড়ীতে থাকতে চাই না ; ওকেতো রোজ বলছি বাড়ী বদলাও, ও-আমার কথায় কান দিতে চায় না।

—চাইলেই কি আজকাল খুশীমত বাড়ী বদলানো যায় ? তপন বলছিল, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করে পাঁচশো টাকা অগ্রিম দিয়ে অনেক তদ্বির তদারক করে বাড়ী পেয়েছে, এখনও ছ'মাস হয়নি, বাড়ী যদি ভাগ্যক্রমে কোথাও মিলেও যায়, অগ্রিম টাকাটাইতো জলে যাবে। কিছু'দিন অন্তত মুখ বুজে চুপচাপ থেকে যাও।

মেয়েটি ফোঁস করে উঠল : ওরা আমাদের ঘরের দিকে ধোঁয় পাঠাবে, আমার রান্নাঘরে নোংরা ফেলবে, আমাকে পাগল বলবে আর আমি মুখ বুজে চুপচাপ থেকে যাবো ? না—সে আমি পারব না, আপনি বললেও না। বড় লোক বলে যা খুশী করবে, যা ইচ্ছে বলবে ? আমিও অমনি বানের জলে ভেসে আসিনি, আমার মামাও একটা কম কেওকেটা নয় ! হ্যাঁ—

ওর স্বামীর দিকে তাকাতেই সে বলল : ওদের রান্নাঘর দোতলায়, ফ্ল্যাট একতলায়, ওদের ধোঁয়া আমাদের ঘরে কি করে আসবে বলুনতো ?

স্ত্রী, মানে তপতী উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আমার টেবিল থেকে একখানা মোটা বই তুলে উঁচু থেকে টেবিলের ওপর ফেলল, টেবিলের আলোটা উল্টে গেল, ছাইদানিটা মেঝেতে ছিটকে পড়ল। তপন—ওর স্বামী দ্রুতপদে এসে ওর হাত চেপে ধরল, ও-বোধহয় আর একখানা বই তুলে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রমাণের চেষ্টায় ছিল। বাধা পেয়ে তপতী জোর করল না, নির্বিকার সরল মানুষের মত বইখানা যথাস্থানে রেখে নিজের চেয়ারে বসে আলোটা ঠিক করল, নীচু মেঝে থেকে ছাইদানিটা তুলে রাখল। ঠাণ্ডা গলায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে পাখাটা আর একটু জোরে চালিয়ে দিতে বলল।

আমার ইঙ্গিতে তপন পাখাটার গতিবেগ বাড়িয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল।

—আচ্ছা তপতী, তুমি বইখানা অমনি করে তুলে ফেলে দিলে কেন? বইটার ওপর অত রাগ কেন?

—রাগ বই-এর ওপর কেন হতে যাবে? রাগ আমার বাড়ীওয়ালার ওপর। ওরা আমাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করে বাড়ী থেকে তুলে দিতে চায়, অগ্রিম টাকাট মেরে দেবার মতলব। আমিও দেখতে চাই কিভাবে ওরা আমাদের বাড়ীছাড়া করে! ও-বলছিল পাড়ার লোকেরা বাড়ীওয়ালার হাত-ধরা,—তাই না? একেবারে বাজে কথা। ক্ষুদে, বেন্দা, সান্টু—পাড়ার ডাকসাইটে সব ছেলে কটাকে আমি হাত করেছি। তারা আমাকে এই কালই বলছিল, দাওনা দিদি ফিষ্টির জন্যে ক্লাবকে গোটা কুড়ি টাকা; ঐ ব্যাটাকে গঙ্গা পার করে খড়দায় রেখে আসি। আমার স্বামী টাকা খরচ করতে চায় না, হাড়কিপটে। দেখুন না. আমার শাড়ীটার তিন জায়গায় রিপু করতে হয়েছে, কিছুতেই শাড়ী কিনে দেবে না। বাচ্চাটার গরম জামা নেই, শীতে কুঁকড়ে থাকে। আমাকে নিয়ে ট্যাকসি করে কোলকাতায় আসতে বললে আঁতকে ওঠে; বলে—যাতায়াতে তিরিশ টাকা লেগে যাবে! খরচ যদি করতে পারবে না, তবে বিয়ে করেছিল কেন? বিয়ের আগে কত কথা, কত আশ্বাস, কত আদর, কত ভালবাসা। আর এখন শুধু বকুনি আর গালাগালি; উঠতে বসতে শোনাবে যে আমার চিকিৎসায় ও-একেবারে ফতুর হয়ে গেল। চা ফুরোলে চা কিনবে না, বলবে—আমি একমাসের চা এক সপ্তাহে খরচ করেছি। চিনি ফুরোলো বলবে, আমি সান্টুকে শরবত করে দিয়েছি। তা ঐ ক্ষুদে বেন্দা সান্টুইতো আমার একমাত্র ভরসা। এই শত্তুরপুরীতে ওরা ছাড়া আর আমার আপনার বলতে কে আছে বলুন? ওরা আছে বলেই বাড়ীওয়ালার গুণ্ডারা আমাকে আর বাচ্চাটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারছে না। ওরা যদি চায়, আমি কি না দিয়ে পারি? এক কাপ চা, এক গেলাস শরবত খাওয়ালে যদি তুমি ফতুর হয়ে যাও তবে বিয়ের আগে অত লম্বা লম্বা কথা বলেছিলে কেন?

—বিয়ের আগেতো ও জানত না যে তোমাকে বিয়ে করে ওকে বাড়ী ছাড়তে হবে, পরীক্ষা না দিয়ে চাকরীতে ঢুকতে হবে, দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটে থাকতে হবে। ও ভাবতে পারেনি যে তোমার অসুখ করবে, ওষুধ ডাক্তারে মাসে মাসে অতগুলো করে টাকা বেরিয়ে যাবে—

তপতীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, গলার স্বরে অকৃত্রিম দরদ ফুটে উঠল।

—ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় ডাক্তারবাবু। সকাল আটটায় দুধ এনে

বাজার করে শুধু দুটো ভাত আর আলুসেদ্ধ মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে; আর রাত্ত দশটায় বাড়ী ফেরে চাকরী টিউশানী সেরে। খাটতে খাটতে ওর প্রাণ বেরিয়ে গেল। আমাকে বিয়ে না করলে ও রাজার হালে থাকতে পারত!

—এর পর বাড়ী এসে যদি শোনে তোমার সঙ্গে বাড়ীওয়ালার ঝগড়া হয়েছে, তা হলে ওর কষ্ট আরো বেড়ে যায়—তাই নয় কি? যদি শোনে তুমি সারা দুপুর ঐসব বাজে ছেলেদের—

—বাড়ীওয়ালাদের ছেলেটা মিথ্যে করে লাগায়। ক্ষুদে সান্টুরা ভাল ছেলে, ওরা থিয়েটার করে চাঁদা তুলে বস্তীর গরীবদের সাহায্য করে, আরো অনেক ভাল কাজ করে ওরা, ওরা সত্যিই ভাল ছেলে।

—তোমার মত অল্পবয়সী মেয়ে রোজ যদি ছেলেছোকরাদের বাড়ী ডেকে এনে চা খাওয়ায়, গল্প করে, তাহলে লোকে সেটা ভাল চোখে দেখে না। আমিতো জানি তপন আমাকে বলেছে ওরা খুব ভাল ছেলে; কিন্তু তোমাদের ছোট শহরে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা কেউই পছন্দ করে না। পাড়ার লোকেরা নিন্দে করে, তপনকে কথা শোনায়।

—পাড়ার লোকেরা আমার দলে, যা কিছু কুচলি কাটবার সে ওই বাড়ীওয়ালারা কাটে। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। ওদের ভয়েইতো আমি ক্ষুদে বেন্দাদের ডেকে আনি। ওরা না থাকলে বাড়ীওয়ালা ঠিক আমাদের ঘরে ঢুকে আমাকে অপমান করবে। ও বলে, দরোজা বন্ধ করে ঘুমোবে। আহা, নিজেদের হাতে তৈরী দরোজা ভেঙে ঘরে ঢোকা ভারী যেন একটা শক্ত ব্যাপার। আমার ভয় করে বলেইতো ওদের ডাকি, ওদের ডাকি বলেইতো ওদের চা শরবত খাওয়াতে হয়।

—তপন পুলিশে ডায়েরী-করে রেখেছে, বাড়ীওয়ালা তোমাকে কিছু বলতে সাহস পাবে না। তুমি ছেলেগুলোকে আর ডেকে এনো না। কেমন?

আপনি কোলকাতায় আমাদের একটা ঘর দেখে দিন, তাহলে আমার আর ভয় করবে না। বাধ্য হয়ে আশ্বাস দিতে হল। মেয়েটা কিছুটা আশ্বস্ত হল। কয়েকটা দিন আমার আশ্বাসের ফলেই হোক আর ওষুধের গুণেই হোক তপন-তপতী শান্তিতে দিন কাটাল। আবার দুসপ্তাহের মধ্যে গোলমাল। স্বামী-স্ত্রী হাজির। একটুকরো কাগজে ঘটনার বিবরণ লিখে তপন আমার হাতে দিল।

কাল অফিস থেকে ফিরে বাড়ীর গলিতে ঢুকতেই শোনে যে তপতী তার বাচ্চাটাকে নিয়ে দরোজায় তালা লাগিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। ভারী বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটেছে দুপুরে। সান্টুর সঙ্গে লুডো খেলছিল তপতী, এমনি সময় অন্য ক্লাবের ছেলেরা এসে হল্লা করে; সান্টু পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়ে বেদম প্রহার খায়। কোনোমতে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের ক্লাবে খবর দিতেই ক্ষুদে বেন্দার দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে

আরে, দুই ক্লাবের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধে ; ওদের বাড়ীর সামনের খোলা জায়গাটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ ভ্যান আসতে রণে ভঙ্গ দিয়ে যোদ্ধারা অন্তর্ধান করে। এবার শুধু বাড়ীওয়ালা নয়, পাড়ার সকলেই প্রায় একমাত্র রায় দিয়েছেন যে তপনকে দশ দিনের মধ্যে বাড়ী ছাড়তে হবে ; অন্যথায় তাঁরা যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

এদের বিবাহপূর্ব ইতিহাস একেবারে মামুলি নয়। তপন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে পাড়ার সরস্বতী পুজো, দুর্গাপুজোর পাণ্ডাগিরি করে, উদ্বৃত্ত চাঁদা দিয়ে গানের জলসা বসায়, পাড়ার ক্লাবে নাটকের রিহার্সাল চালায়। চালাক-চতুর ভাল ছেলে বলে পাড়ায় সুনাম ছিল। তপতীরা উদ্বাস্তু। এ-পাড়ায় আসার পর থেকেই তপতীর দিকে পাড়ার তরুণদের নজর পড়ে। ওর চেহারা, চলাফেরা, কথাবার্তার মধ্যে পুরুষকে আকৃষ্ট করবার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকার দরুন শুধু ছেলেমহলে নয়, বড়োদের মধ্যেও দস্তুরমত আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে তপতী। মফঃস্বলের ছোট শহরে কইয়ে-বলিয়ে মেয়ে খুব বেশি থাকে না। তার ওপর আবার যদি সে সুন্দরী হয় ও নাচতে জানে তবে তাকে নিয়ে তরুণদের মধ্যে মুখরোচক জল্পনা-কল্পনা চলাই স্বাভাবিক। তপতী শহরের অনেক তরুণের ঘুম নষ্ট করল, অনেক কবিতার উৎস হয়ে উঠল, অনেকে ওকে ভালবেসে ফেলল। বলা বাহুল্য তপন তাদের মধ্যে একজন। তপতীকে ঘিরে যে-স্তাবকের দল গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে সব দিক থেকেই তপনই শ্রেষ্ঠ। বড়ঘরের ছেলে, স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, চেহারাও এমন কিছু খারাপ নয়। বহুমুখী প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে বরমাল্য গলায় পরার সম্ভাবনার আনন্দে যখন তপন মশগুল, তখন মায়ের মুখে বাড়ীর অভিমত শুনল। চাল নেই, চুলো নেই, উদ্বাস্তু কলোনির ওই পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তার বাবা-কাকারা আদৌ রাজী নন। বিয়ে করলে বাড়ী ছাড়তে হবে। কোলকাতার বন্ধুদের উৎসাহে আর নিঃসন্তান মাসীমার অর্থ সাহায্য পেয়ে বাড়ীর মতামত অগ্রাহ্য করে বেকার তপন তপতীকে বিয়ে করে বসল। বিয়ের পর বছরখানেক ঐ শহরেরই অন্য প্রান্তে ঘর ভাড়া করে মাসীমার টাকায়, নিজের আংটি ঘড়ি ইত্যাদি বিক্রী করে বেপরোয়া আনন্দে দিন কাটাল স্বামী-স্ত্রী। বন্ধুদের উৎসাহ ও মাসীমার সাহায্যস্রোতে ভাঁটা পড়তে শুরু করতেই দুজনের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত। ছেলে পড়িয়ে সামান্য যা পেত তার সঙ্গে মা-মাসীর মাঝে মাঝে দেওয়া অর্থ-সাহায্য যোগ করেও আধুনিক ফ্লাটের ভাড়া জোগানো সম্ভব হল না। এর মধ্যে একটা ছোট সওদাগরী আপিসে চাকরী মিলেছে, কিন্তু আবার মায়ের মৃত্যুতে ও-দিককার সাহায্য বন্ধ। একটি বাচ্চা হয়েছে তপতীর, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। বাবা-কাকার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কোনো

দিক থেকে সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই। কাজেই ওরা অল্প ভাড়ার বাড়ীতে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। তপতী অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছে; দারিদ্র্যকে সে ভয় পায়, ঘৃণা করে। অনেক প্রেমিকের মধ্যে তপনকে বাছাই করে নিয়েছিল তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার কথা ভেবে। তপতী ভালভাবে বাঁচতে চায়। আগের মত বস্তী বাড়ীতে থাকার কথা এখন সে ভাবতেও পারে না। তার মনে হতে লাগল যে তপন তাকে ঠকিয়েছে। আর তপনের প্রেমের নেশা অনেকদিন কেটে গেছে। আশা করেছিল এম-এতে ভাল করবে, অন্তত বেসরকারী কলেজের মাস্টারী জুটিয়ে পড়াশুনা গবেষণায় মন বসাবে। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যেতে চায়নি। প্রেমের জন্যে অত বেশি ত্যাগ করতে হবে জানলে সে বোধহয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামত না। আমাকে খোলখুলি এত কথা সে বলেনি, কিন্তু আমি তার হাবভাব দেখে এইরকমই অনুমান করেছিলাম।

তপতীকে সে প্রায়ই বলত যে তাকে বিয়ে করে সে যে স্বার্থত্যাগ করেছে তপতী তার মূল্য বোঝে নি, বুঝবেও না।

তপতী ক্রমশ খিটখিটে বদমেজাজী হয়ে উঠতে লাগল। তপনকে মুখের ওপর কিছু বলত না বটে, কিন্তু তার রাগের ঝাঁঝ গিয়ে পড়ত ঠিকে ঝিয়ের ওপর। বিনাকারণে গালমন্দ কেন সহ্য করবে ঠিকে লোক? সেও সমানে উত্তর দিত। দুজনের চেঁচামেচিতে বাড়ীওয়ালা-গিন্নি অতিষ্ঠ হয়ে দুচার কথা বলতে বাধ্য হতেন; আর তার পরই প্রকাশ পেত তপতীর রণচণ্ডী মূর্তি। ভয়ে বাড়ীওয়ালা-গিন্নি পাঁচিলের দরোজা বন্ধ করে দোতলায় উঠে শাসাতেন। তপতী মাঝে মাঝে বাচ্চাটাকে কোলে করে দরোজায় তালা ঝুলিয়ে নিজের মায়ের কাছে চলে যেত, কখনও বা ভাতের হাঁড়িতে জল ঢেলে, মেয়েটাকে কোলে নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে বসত। মাঝে মাঝে চাকরি থেকে ফিরে তপন বাড়ীতে ঢুকতে পেত না—তালা বন্ধ। মাইল দুয়েক ঘুরে শ্বশুরবাড়ী থেকে তপতীকে নিয়ে আসতে হত। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকত। সে-রাত্রে দোকান থেকে পুরী কচুরি কিনে পেট ভরাতে হত। একদিন চরমপত্র জারি করল তপন। এবার যদি এসে সে তপতীকে বাড়ীতে না পায়, তবে সে তপতীকে আর ঘরে ঢুকতে দেবে না। তাকে তার মায়ের কাছেই চিরকাল থাকতে হবে। তপতী ভয় পেয়ে দুপুরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করল বটে কিন্তু ঝগড়া বন্ধ করল না। রোজই ঝগড়া করত রোজই ভয় পেত। নিজের ঘরের দরজায় খিল দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারত না; বড় বড় দুটো টিনের বাকস টেনে এনে খিলকে জোরদার করত। এই অবস্থায় একদিন জানালার দিকে চোখ পড়তে দেখল সান্টু একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে; চোখাচোখি হতেই চট করে সরে গেল। দেয়ালে টাঙানো

আর্শিতে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সাণ্টুর অমনি করে তাকিয়ে থাকার কারণ। তাড়তাড়ি আলনা থেকে একটা ব্লাউজ টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে জানালাটা পুরো খুলে দিল। পরের দিনও সাণ্টুকে ঐ অবস্থায় দেখে ওর মনে হল বাড়ীওয়ালার ভয় তাড়াবার উপায় পাওয়া গেছে। দুপুরে দরোজা বন্ধ করা ছেড়ে দিয়ে তখন থেকে সাণ্টু আর তার দুই বন্ধু ক্ষুদে বেন্দাকে মাঝে মাঝে ঘরে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে লুডো খেলা শুরু করে দিল। তারা চা-পানে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে দিদিকে শোনাতে লাগল—দিদির জন্যে দরকার হলে তারা জান দিতে রাজী। পাড়ায় এই নিয়ে প্রথমে গুঞ্জন, পরে কলরব শোনা গেল। ছুটির দিনে তপনের আর বাইরে বেরুবার উপায় রইল না। যেখানে যায় সেখানেই শোনে এই কথা। দু' একদিন লক্ষ্য করল, তার উপস্থিতিতেই শুধু শাড়ী দিয়ে দেহ আবৃত করে—জানালা দিয়ে তপতী সাণ্টুর দলের সঙ্গে কথা বলছে। ধৈর্যধারণ করতে না পেরে এই সময় থেকে তপতীর গায়ে হাত তুলতে শুরু করল তপন। সাণ্টুর দলকে শাসিয়ে, স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে এবং মারধোর করেও অবস্থার কোনো হেরফের হল না। সাণ্টুরা একদিন না এলে তপতী নিজে গিয়ে ওদের আড্ডায় হাজির হত।

এ খবর তপন পেল পাড়ার অন্য ছেলেদের কাছে। বেশির ভাগ সময়েই গায়ে কাপড় দিতে ভুলে যেত তপতী। খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকত না, রাতের ঘুম বন্ধ। এতদিনে তপনের মনে হল তপতী বোধ হয় অসুস্থ, মানসিক রোগে ভুগছে।···

তপনের লেখা আগের রাতের ঘটনা পড়ে আমি ওকে বাইরে যেতে বললাম। তপতী আগের দিনের মতই চঞ্চল অস্থির; একগাদা ছেঁড়া কাগজের প্যাকেট খুলে পড়ার ভঙ্গীতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। বারদুয়েক ডাকার পর সাড়া দিল।

—সাণ্টুকে তুমি ডেকে এনেছিলে? ছিঃ ছিঃ লোকে কি মনে করছে বলতো!

—সাণ্টু যদি দরোজায় এসে ধাকা মারে কড়া নাড়ে, আমি খুলে না দিয়ে আর কি করতে পারি? খুলে না দিলে বাড়ীওয়ালা গিন্নী দেখতে পেত আর পাড়ার লোক ডেকে এনে দেখাত!

—দিনে দুপুরে ওর এত সাহস হল কি করে? তপন পুলিশের কাছে ডায়েরী করেছে, পাড়ার লোকরা ওদের ওপর নজর রেখেছে—

—আমার খুশী আমি ওকে ডেকে আনব। ওকে ডেকে না আনলে বাড়ীওয়ালারা সেদিন আমার ঘরে আগুন দিয়ে আমাকে পুড়িয়ে মারত। তিন লিটার পেট্রল কিনে ওদের রান্না ঘরে জমা করেছে, আমার নিজের চোখে দেখা। আপনি আমার বাবার মত, আপনাকে আমি কত ভক্তি করি; কিন্তু

আপনি আমার কোনো কথা বিশ্বাস করেন না। জানেন ও আমাকে ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচে। অফিসে ও বদলী হতে চাইছে; আন্দামানে বদলী হয়ে যাবে। বাচ্চাটাকে ওদের বাপের বাড়ীতে রেখে আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে। সান্টু বলছিল যে পাগলাগারদেও পাঠাতে পারে। তাহলেই ও আর একটা বিয়ে করতে পারে। আমার শরীরে কিছু নেই, আমাকে ওর মনে ধরছে না, আমাকে ও ভালবাসে না। একবারও আগের মত আদর করে বলে না— আমরা দুজন তপন-তপতী কপোত-কপোতী প্রায়/ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যাব চলে নিঃসীম নীলিমায়।" আমি যে সুন্দর সে কথা বলতেও ওর আটকায়। সান্টু কিন্তু জানে আমি সুন্দর, হ্যাঁ সান্টু আমাকে বলেছে।···

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে ও ডুকরে কেঁদে উঠল। পাশের ঘর থেকে তপন ছুটে এল। আমার কথায় তপনের সান্ত্বনায় কিছুটা শান্ত হয়ে দেওয়ালের ধারের সোফাটায় গিয়ে বসল; তখনও শিরা বের করা হাত দিয়ে চোখ মুছছে পরে সোফায় শরীর এলিয়ে ও বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল।

তপনকে বললাম: তোমার কিছুদিন ছুটি নেওয়া দরকার। শৈশব থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে তোমার স্ত্রী। আসল ভয় ওর তোমাকে নিয়ে। ওকে বিয়ে করে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে তোমাকে তাই ওর ধারণা হয়েছে তুমি ওকে সুযোগ পেলেই পরিত্যাগ করবে। তোমার দুঃখকষ্টের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে; তার ফলে নিজের ওপরে অন্যের ওপরে রেগে যাচ্ছে। তুমিও অর্থাভাব মেটাতে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ; ওর মনে নিরাপত্তাবোধ জাগাতে পারছ না। মানুষ ডোববার আগে তৃণখণ্ড ধরেও বাঁচবার চেষ্টা করে; তপতীও ঐসব পাড়ার বকাটে ছেলেদের আশ্রয় করে সংসার সমুদ্রে কোনমতে ভেসে থাকতে চাইছে। তোমাকে কে কি বুঝিয়েছে জানি না—তবে আমার মনে হয় না যে ঐসব ছেলেদের সঙ্গে ওর কোনো দৈহিক সম্পর্ক ঘটেছে। আমি মনে করিনা যে ও নিম্ফোম্যানিয়ায়' ভুগছে; আমি বিশ্বাস করি না যে 'মরবিড সেক্সুয়াল ডিজায়ার' ওকে সান্টুদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ও এক জায়গায় নোঙর ফেলে ঝড়ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। মনে মনে ও ভাবে ওর শীর্ণ দেহে পুরুষকে আকৃষ্ট করার মত কিছু নেই, তাইতেই আরো ভয় পেয়েছে, আরো জোর করে তোমাকে আটকে ধরতে চাইছে। বাড়ীওয়ালা ওর সাময়িক আশ্রয়নীড় ভেঙ্গে দিয়ে ওকে নিরাশ্রয় করবে—এই ভয়ে ও অস্থির উন্মাদ হয়ে গেছে। তুমি ছুটি নাও, ওর কাছে কিছুদিন থাক। অন্য কাজ এখন মুলতুবি রাখ।

—কিন্তু আমার তো ছুটি পাওনা নেই। তাছাড়া যাদের পড়াই তাদের

অনেকের পরীক্ষা এসে গেছে। ওষুধপত্তর দিয়ে যা হোক কিছু ব্যবস্থা করুন স্যার।

তপন আমার কথামত ব্যবস্থা করতে পারল না। কয়েকদিন পরে হন্তদন্ত হয়ে এসে জানাল যে আগের দিন তপতী বাচ্চাটাকে কোলে করে ওর অফিসে এসে হাজির হয়; ও তখন অফিসের কাজে বাইরে ছিল। সেখানে সে আবোল তাবোল বকেছে; ওর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মামাকে দিয়ে অফিসের সকলকে তপনকে ছুটি না দেবার জন্য জেলে পাঠাবে বলে শাসিয়েছে। অফিসের বড়সাহেব ওকে হাসপাতালজাত করতে পরামর্শ দিয়েছেন। সব দায়িত্ব তিনি নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তপনকে একটু উল্লসিত মনে হল। এতদিন পরে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে বেচারা। চিকিৎসার সব খরচ অফিস থেকেই দেওয়া হবে। হাসপাতালে খাওযাদাওযা নিশ্চয়ই ভাল দেবে, ওর শরীরটা হয়ত সারবে। এই কথাগুলো বলে এই প্রথম তপনকে ঈষৎ হাসতে দেখলাম।

তপনের আশা কিন্তু পূর্ণ হল না। সেইদিনই বাড়ী গিয়ে দেখল বাড়ীর সামনে ছোটোখাটো ভিড় জমে গেছে। ত্রস্তপদে বাড়ীতে ঢুকে দেখে বাথরুমের কাপড়জামা রাখার লোহার রডে শাড়ীগলায় তপতীর দেহটা ঝুলছে। বড়সাহেব আর তপনের ইংরেজি কথাবার্তার অর্থ ও বুঝতে পোরছিল। এটা তার হাসপাতালে না যাবার শেষ চেষ্টা।

৮

ভ্রান্তি

—না ডাক্তারবাবু, আমি যাব না, আপনার এখানে থাকব, আপনি আমার বাবার মত—আমাকে যেতে বলবেন না!

—আহা, তোমাকে তো শ্বশুরবাড়ী যেতে হচ্ছে না, মাসীমার কাছে থাকবে, ভয় কি?

—না ডাক্তারবাবু, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না, আমি এখানে থাকব। আপনার মেয়ের সঙ্গে শোবো, আমি আপনার সব কথা শুনব—আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

আমার হাত ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল মেয়েটি। বড় বড় চোখ দুটো তুলে আমার দিকে ভয়ার্ত শিশুর মত তাকিয়ে আমার কাছে আশ্রয় চাইল সাতাশ বছরের মেয়ে অনীতা।

অতি কষ্টে অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে সেদিনকার মত মাসীমার সঙ্গে বাড়ী পাঠালাম। মেসোমশাইকে থাকতে বললাম আলোচনার জন্য।

ওরা বেরিয়ে যেতে মেসোমশাই সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। রকম-দেখে ভদ্রলোক বেশ ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন: সারবে তো ডাক্তারবাবু?

—সারবে বলেই তো মনে হয়। আচ্ছা একবার গোড়া থেকে ব্যাপারটা বলুন তো। কতদিন বিয়ে হয়েছে? ঠিক কবে শশুর বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে?

মনে মনে হিসেব করে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন: ঠিক ছত্রিশ দিন হল বিয়ে হয়েছে। ফুলশয্যার পর আসতে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম কেমন লাগল, ওরা লোক কেমন, বরকে পছন্দ হয়েছে কিনা;-যেমন সবাই করে। তখন অপছন্দ হয়েছে একবারও বলেনি। তারপর কিছুদিন আমাদের কাছে থেকে বরের সঙ্গে চলে গেল তাদের বাড়ী। যাবার সময় নাকি খুবই কান্নাকাটি করেছিল, তা সে তো সব মেয়েই করে থাকে। আমাদের কোনো সময়েই মনে হয়নি যে, ও তিনদিনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে একলা পালিয়ে আসবে। এসে অবধি ঐ অবস্থা। কোনো সময় কবিতা বলছে, কোনো সময় নাটক করছে, কোনো সময় ছড়া কাটছে। ওর মাসী তো কেঁদেকেটে অস্থির। দিনরাত খালি কথা বলছে। স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই। পাড়ার ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন দিলেন, ঘণ্টা দুয়েক ঘুম হল। পরের দিন মানে গতকালও ঐ অবস্থা। একদণ্ড

এক জায়গায় দাঁড়াবে না, বসবে না। খালি পায়চারী আর বকবক। ভাল কথা বলে দেখলাম, ধমকধামক দিয়ে দেখলাম—কিছুতেই থামানো গেল না। কাল রাতে ইঞ্জেকশন দিয়েও কোনো ফল হয়নি। সেই ঘণ্টা দুয়েক মাত্র বিছানায় শুয়েছিল। নিজে তো ঘুমুবেই না, ওর মাসীকেও ঘুমুতে দেবে না। আমিও দু'রাত জেগে কাটিয়েছি।

—তাহলে তিনদিন আগে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। ওর শ্বশুরবাড়ী থেকে খোঁজখবর করছে না?

—সেইদিনই ওরা ফোন করে জানতে পারে—আমার কাছে এসেছে। ওদের ওখানে থাকতে পাগলামি করেছে বলে মনে হল না। ওদের বলে এসেছে যে মেসোমশায়ের, মানে আমার ব্যাঙ্কে গিয়ে একবার দেখা করে চলে আসবে। কাল ওর স্বামী এসে ওর অবস্থা দেখে অবাক। নিয়ে গিয়ে ওদের চেনা ডাক্তার দেখাতে চাইল, আমার স্ত্রী রাজী হলেন না।

—সম্বন্ধ করে বিয়ে, তাই না? সম্বন্ধটা কে এনেছিল?

—আমার ব্যাঙ্কের এক সহকর্মী। তিনি ওদের অনেকদিন ধরেই চেনেন, একই গ্রামের বাসিন্দা। আমিও ছেলে দেখেছি, ছেলের সঙ্গে কথা বলে আমার বেশ ভালই লেগেছে। আমার ব্যাঙ্ক থেকেই টাকা নিয়ে একটা প্রেস করেছে, ভালই চলছে। বড় ভাই বাইরে থাকেন। মা আর ছেলে নিয়ে সংসার। অনীতা সুখেই থাকবে ভেবেছিলাম।

—আপনারাই ওকে মানুষ করেছেন? বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়েছে কতদিন?

—ওর তখন তিন বছর বয়স। দুর্ঘটনায় একসঙ্গে দুজনের মৃত্যু হয়। ওদের ট্যাকসির সঙ্গে একটা বাসের ধাক্কা লেগে ট্যাকসিটা গুঁড়িয়ে যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা মারা যান। আশ্চর্যভাবে অনীতা বেঁচে যায়। সেই থেকেই আমাদের কাছেই মানুষ। আমাদের মেয়ে নেই, ওই আমাদের মেয়ে। বছর পাঁচেক আগে প্রাইভেটে বাংলায় এম-এ পাশ করেছে, সেই থেকে আমরা বিয়ের চেষ্টা করছি। এতদিনে যদিওবা বিয়ে দিতে পারলাম, কিন্তু ওকে সুখী করতে পারলাম না।

—আপনি ঠিক জানেন—ওর আগে কোনাদিন এই ধরনের অসুখ হয়নি?

—আপনার কাছে গোপন করতে যাব কেন? ওদের মাতৃকুল-পিতৃকুলেও কারুর মনের রোগের কোনো ইতিহাস নেই। তিন বছর থেকে আমরা মানুষ করছি, আমরা ঠিকই জানি, কস্মিনকালেও ওর এরকম অসুখ হয়নি। আপনি কি বুঝলেন? সারবে তো? শ্বশুরবাড়ী পাঠানো যাবে তো?

—এখনও বিশেষ কিছু বুঝিনি। ওর এখন যা অবস্থা তাতে ওর কাছ থেকে কোনো কিছু জানা যাবে না। ওষুধগুলো ঠিকমত খাইয়ে যান, দিন সাতেক পরে নিয়ে আসবেন।

সাতদিন পরে অনীতাকে একটু শান্ত মনে হল। চোখ দুটোতে তখনও কিন্তু ভয়ার্তা ভাব।

—একদম ঘুম হচ্ছে না। ওরা নিতে এসেছিল, আমি যাইনি। আপনার কাছে আমাকে থাকতে দিন ডাক্তারবাবু—নিচু হয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরতে চাইল।

কোনক্রমে শান্ত করে একথা-সেকথার পর মুখ থেকে যা শুনলাম, তার সঙ্গে আমার ধারণা কিছুটা মিলল। স্বামীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের ভয় ওকে অস্থির করেছে। কিছু কিছু মেয়ের মধ্যে এই ভয় অতিমাত্রায় থাকে। আমাদের দেশে 'ডেটিং' জাতীয় প্রথা এখনও চালু হয়নি। খুব কম মেয়েরই বিয়ের আগে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা থাকে। অনীতা ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পায়নি। অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞ মেয়ে বন্ধুও ওর কেউ নেই। প্রথমে বিয়েতে মত ছিল না। মেসোমশায়ের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজী হয়, বিয়ের আগে স্বামীকে একবার দেখেছিল—পছন্দ হয়নি, কিন্তু সে কথা লজ্জায় মাসীমার কাছে বলতে পারেনি। ওর মেসোমশায়-মাসীমা নিজের মেয়ের মত আদরযত্নে মানুষ করলেও ওর বাবা মায়ের অভাব ঠিকমত মেটাতে পারেন নি। ওদের কাছে না চাইতেই যা পেয়েছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। আবদার করে কোনো দিন কোনো কিছু চায়নি, অভিমান বা রাগ করার কোনো উপলক্ষই ঘটেনি। ওর কথা থেকে বোঝা গেল—মেসো-মাসীকে ও ঠিক নিজের বাপ-মায়ের মত কোনোদিনই মনে করতে পারেনি। কয়েক বছর আগেও রোজ রাত্তিরে ও বালিশে মুখ গুঁজে মা-বাবার কথা ভেবে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে। শৈশবের ছোটখাটো স্মৃতির টুকরোগুলো সযত্নে অন্তরের গোপনতম প্রদেশে সুরক্ষিত রেখেছে। ফুলশয্যার দিন অনেক চেষ্টা করেও স্বামী ওর মুখ খোলাতে পারেনি। কিছুটা বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কয়েক বছর পরে সেই রাত্রে আবার ও অঝোরে কেঁদেছে। নিজেকে কেন জানি সে-রাত্রে নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হয়েছে। জানালা দিয়ে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছোটবেলার মত বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে যে মা আর বাবা সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে তাঁদের অনুর দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ইচ্ছে সত্ত্বেও ওর কাছে আসতে পারছেন না, ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। তবুও অভিমানে ওর চোখ ফেটে জল আসে, ওঁরা অসহায়—ইচ্ছা সত্ত্বেও আসতে পারছেন না জেনেও রাগ হয়। আবার বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে।

সেবারে স্বামী বোধহয় কিছুটা অনুকম্পাভরে আর বেশিদূর অগ্রসর হননি। দ্বিতীয়বার তিনি জোরজবরদস্তি করবেন ভেবে ও ভয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে চায়নি, এই বোধহয় প্রথম মাসীমার কাছে আব্দার করে আরো কিছুদিন থাকতে চায়। কিন্তু ওর কান্নাকাটিতে কোনো ফল হল না। গাড়ীতেই স্বামীর কাছে তিন

দিন সময় চেয়ে নিয়েছিল মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে। স্বামী প্রার্থনা মঞ্জুর করায় কৃতজ্ঞতায় ওর অন্তর ভরে যায়। অনেক চেষ্টা করে স্বামীর মাকে মা বলে ডাকে, তিনদিনের মধ্যে সেবাযত্ন করে তাঁর হৃদয় জয় করে।তৃতীয় দিনে কাজে বেরুবার আগে স্বামী ওকে মনে করিয়ে দিল যে, সেই রাত্রে ওদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে, দেহের মিলন ওদের মনের মিলনকে মধুময় করে তুলবে। আতঙ্কে অন্তরাত্মা শিউরে উঠলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে অনীতা সম্মতি জানায়। তারপর মেসোমশাই-এর সঙ্গে দেখা করার কথা বলে, শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলেই ও বেরিয়ে পড়ে। ট্রেনের মধ্যেই ওর কেমন যেন লাগতে থাকে। ভয়ের পাশাপাশি বুকের মধ্যে আনন্দেরও সাড়া জাগে। কোথায় যেন একটা আনন্দের ঝরনার অনেক দিনের বন্ধ মুখ খুলে গেছে মনে হয়। প্রথমে গুণ গুণ করে, তারপর একটু উঁচু গলাতেই গান ধরে, আশেপাশের লোকজন ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনে হয়। ও গ্রাহ্য করে না, আরো উঁচু গলায় গান ধরে। শিয়ালদা স্টেশনে ওকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে যায়। ও রেগে গিয়ে তাদের যা-তা বলে তিরস্কার করে। এমনি সময়ে মেসোমশায়ের এক বন্ধু ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ওকে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করেন, সব কথা ওর মনে নেই। তারপর তিনি অনেক কষ্টে পুলিশের সাহায্য নিয়ে একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন, এইটুকু শুধু ওর মনে আছে।

—তুমি স্বামীকে ভয় পাচ্ছ কেন? যতদূর শুনলাম সে তো খুবই বিবেচক। তোমার সঙ্গে এ পর্যন্ত কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। বিয়ে যে কালে হয়েছে শ্বশুরবাড়ী যেতেই তো হবে।

—না, আমার ভয় করে। আমি আপনার বাড়ীতে থাকব। রান্নাবান্না করব, বাসন মাজব, আপনার সব কথা শুনব। আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু আমাকে থাকতে দিন। আপনাকে অনেকটা আমার বাবার মত দেখতে।

—তোমার স্বামীর মত না নিয়ে তো তোমাকে রাখা যায় না; সেটা বে-আইনী হবে। সে আমার নামে মামলা ঠুকে দিতে পারে……

—সে কিছু বলবে না, সে খুব ভাল মানুষ। আর তার সঙ্গে তো আমার আসল বিয়ে এখনো হয়নি। আমি ওদের বাড়ী গেলে মরে যাব। আমার ঘুম হবে না, খিদে হবে না। আমি কাজ করতে পারব না, তখন ওরা আমায় বকবে, মারবে, মেরে ফেলবে।

—এখনই তো আর যেতে বলছি না। কাল তোমার স্বামী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাকে বলে দেব যে দু'সপ্তাহ পরে তুমি ওদের ওখানে যাবে। এর মধ্যে তোমার ঘুম হবে শরীর ভাল হয়ে যাবে। তুমি সুস্থ না হলে তো আর তোমাকে যেতে বলছি না।

—না আমি কোনোদিন সুস্থ হব না। মেসোমশাই জোর করে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে ওরা আমাকে যন্ত্রণা দেবে, আমাকে সিঁড়ির ঘরে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখবে। ওরা ভাবছে আমাকে ভূতে পেয়েছে। রোজা ডেকে আমাকে কাঁটাতারের বেত দিয়ে মারবে। আমার খুব লাগবে। না, আমি যাব না—বলে কেঁদে উঠল অনীতা।

পাশের ঘরে মেসোমশাই আর মাসীমা ছিলেন। মাসীমার জিম্মায় অনীতাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। মাসীমাকে বেশ ভয় পায় মনে হল। তিনি ডাকতেই একবার করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

মেসোমশায় চিন্তান্বিত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: খুব মুস্কিল হয়েছে ডাক্তারবাবু। কাল জামাইবাবাজী বেশ মেজাজ দেখিয়ে গেলেন।

—কি বলছে? অসুখ সারলেও ওকে গ্রহণ করবে না?

—শুধু তাই নয়। আমার নামে মামলা করবে বলে শাসিয়ে গেছে। আমি নাকি জেনেশুনে একটা উচ্ছিষ্ট মেয়েকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি।

—উচ্ছিষ্ট? ওঃ। ওর বুঝি ধারণা হয়েছে যে অনীতা অন্য কাউকে ভালবাসে বলে শ্বশুর ঘর করতে চাইছে না।

—হ্যাঁ, আর এই ধারণা মেয়েটাই কাল দুপুরে ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—প্রেমিকের পরিচয় কিছু পেয়েছেন?

—না, ওর মাসী অনেক চেষ্টা করেও ওর মুখ থেকে কোনো কথা বের করতে পারেন নি। তবে স্বীকার করেছে যে সে ঐ ধরণের কথা জামাইকে বলেছে। আচ্ছা, এ নিয়ে কি মামলা হয়?

—উকিলরা বলতে পারে। তবে আমি ওর কথার কোনো মূল্য দিতে রাজী নই। মনে হয়, ও স্বামী-সঙ্গ এড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে তাকে একটা কাহিনী তৈরী করে শুনিয়েছে।

—স্বামী কি বাঘ না ভাল্লুক যে তার সঙ্গ এড়াবার জন্য নিজের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটাতে যাবে! আপনি কি মনে করছেন বলুন। ও-কিন্তু আপনাকেও অনেক মিথ্যে কথা বলছে। ওর মাসী বলছেন, ওর ঘুম হচ্ছে; খাওয়া-দাওয়া করছে; অথচ ও আপনার কাছে বলে চলেছে যে ওর ঘুম হচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না। আমার মনে হয়; ও অসুখের ভান করছে।

—ভান করে ওর লাভ?

—সেইটেই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। এক লাভ, এখানে থাকলে যাকে ও ভালবাসে, তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু এই কেলেঙ্কারীর পর ওকে আমরা এ-বাড়ীতে কি করে রাখব ভেবে পাচ্ছি না। কি মুস্কিলেই যে পড়েছি।

—আচ্ছা যদি প্রেমট্রেম সত্যিই করে থাকে, আপনারা কিছুই বুঝতে পারলেন না; জানতে পারলেন না;—এ কি হয়? প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছে, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেখেননি, কোনোদিন কারুর কাছে ওর নামে গুজব শোনেন নি; রাত করে কোনোদিন বাড়ীতে ফেরেনি।—এ সব কথাতো আপনিই বলেছেন। ঠিক কিনা?

একটু চিন্তা করে ভদ্রলোক মুখ নীচু করলেন; একটু লজ্জা পেয়েছেন মনে হল। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বাঁচালেন ডাক্তারবাবু। নিজের মেয়েকে—ওকে নিজের মেয়ে মনে করেই এসেছি আমরা; খারাপ ভাবতে গিয়ে বুক ফেটে যাচ্ছিল। বিপদে পড়লে মানুষের মতিচ্ছন্ন হয়। না; চব্বিশ বছর ধরে ওকে দেখছি; ও-নিজের মুখে বললেও ঐ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। বুঝতে পারছি আপনার কথাই ঠিক। ও প্রলাপ বকছে। আচ্ছা; এ রোগটা কি ডাক্তারবাবু?

—রোগটা এক ধরনের পাগলামি। ডাক্তাররা নাম দিয়েছেন—'হানিমুন সাইকোসিস।' 'হানিমুন'কে বাংলায় যেন কি বলে? মধুচন্দ্রিমা তাই না? আর 'সাইকোসিস' মানে উন্মত্ততা, পাগলামি। আপনা থেকেই বেশিরভাগ রোগী ভাল হয়ে যায়। তবে আপনাদের অনীতার অসুখের মধ্যে বোধ হয় আরো একটু জটিলতা আছে। ও স্বামীকে যে কাহিনী শুনিয়েছে, সেটাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। দেখতে হবে কাহিনীটা নিছক স্বামীকে তাড়াবার মতলবে ওর মাথায় গজিয়েছে, না কল্পিত কাহিনীটি ওর ভ্রান্তি এবং অমূলদর্শনের (delusion and hallucination) নিদর্শন।

ওঁকে বিদায় দিয়ে অনীতাকে ডাকলাম। তাকে বললাম,—তুমি আমাকে বাবার মত মনে কর; অথচ স্বামীকে যা বলেছ আমার কাছে সেকথা গোপন করেছ। তুমি বিয়ে ভেঙে দিতে চাও বুঝলাম। কিন্তু নিজের মাথায় মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা না চাপিয়েও তো স্বামীর থেকে আলাদা হতে পারতে। অনীতা একটুও সঙ্কুচিত না হয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলল: মিথ্যে কেন হবে? আমি যা বলছি তা সত্যি। জল্পেশদাকে আমি ভালবাসি। তিনিও আমাকে ভালবাসেন। তিনি কত সুন্দর কত ভাল। আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারব না।

—একথা বিয়ের আগে মাসীমা-মেশোমশাইকে বলনি কেন? তাহলে তাঁরা তার সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারতেন, এই বিয়েটা ঘটত না। আমার কাছে একবারও ঐ জল্পেশদার নাম করোনি। কেন?

—আপনারা গুরুজন। গুরুজনের কাছে কি এসব কথা বলা যায়? তাছাড়া জল্পেশদার সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? তাঁর অনেকদিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর মেয়ে এবার হায়ার সেকেণ্ডারী দিচ্ছে।

—তুমি এসব জেনেশুনে তাঁকে ভালবেসেছ, না তিনি খবরগুলো গোপন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল কোথায়? আলাপ হল কি করে?

—তিনি গোপন করার মত মানুষ নন। আমি সব জানতাম তিনিই আমাকে বলেছেন। তাঁর বৌয়ের কথা মেয়ের কথা তাঁর ছোটবেলার কথা। আলাপ হয়েছে তাঁর দোকানে উল কিনতে গিয়ে। চুলের ফিতে সেফটিপিন উল পাউডার তেল সাবানের মস্তবড় দোকান আছে তাঁর। দোকানে ঢুকলেই ভারী সুন্দর একটা গন্ধ পেতাম, আমার খুব ভাল লাগত। যেমন সুন্দর জল্লেশদা তেমনি সুন্দর তাঁর দোকানের গন্ধ। শুধু দামী পাউডার সেন্ট মিশোলেই আপনি ঐ গন্ধ তৈরী করতে পারবেন না। সবাই ঐ গন্ধ তৈরী করতে পারে না। আরো কত সেন্ট পাউডারের দোকান আছে তো ষ্টেশনের ধারে; কোথাও ঐ গন্ধ আপনি পাবেন না। ঐ গন্ধ প্রথম যেদিন নাকে যায় সেদিনই মনে হল এ গন্ধ আমার চেনা খুব চেনা। আমার মায়ের ড্রেসিং টেবিলের ধারে গেলে ছোটবেলায় ঐ গন্ধ পেতাম। যেদিন আমরা গাড়ী করে বিয়েবাড়ী যাচ্ছিলাম যেদিন বাসের ধাক্কায় আমাদের গাড়ীটা চুরমার হয়ে যায়, সেদিন মায়ের গায়ে আমার ফ্রকে ঐ সেন্ট ঐ পাউডারের গন্ধ ছিল। জল্লেশদার দোকানে ঐ গন্ধ পাবার পর রোজ একবার করে তাঁর দোকানে যেতাম ঐ গন্ধ শুঁকতে। দুপুরবেলায় মাসী ঘুমিয়ে পড়ত। আমি খিড়কির দরজা দিয়ে জল্লেশদার দোকানে যেতাম। তখন খদ্দের থাকত না, শুধু আমি আর জল্লেশদা। কত আদর করতেন আমাকে জল্লেশদা। লজেন্স দিতেন, টফি দিতেন, তাঁর বাবা-মার গল্প করতেন। ওঁরও খুব অল্পবয়সে মা-বাবা একসঙ্গে মারা যান। আমরা দুজনে একইরকম; একই গন্ধ ভালবাসি, একই রঙ ভালবাসি...এসব কথার একটাও মিথ্যে নয়। আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি, দারুণ ভালবাসি। আমি কি আর কাউকে ভালবাসতে পারি।... আমাকে আপনি আপনার বাড়ীতে থাকতে দেবেন তো? জল্লেশদা বেঁচে থাকলে কি আপনাকে এত বলতাম। আপনি আমার বাবার মত, আমি আপনার সব কাজ করব; আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

সব শুনতে মেসোমশায়ের মনে পড়ল জল্লেশদার কথা। ওঁর বাড়ীর উল্টোদিকে একটা ছোট ষ্টেশনারী দোকানের মালিক জল্লেশদার দোকানে সত্যিই অনীতা রোজই গিয়ে গল্প করত, তাঁর কাছ থেকে লজেন্স বিস্কুট আদায় করত। ওর যখন পাঁচ কি ছয় বছর বয়স। সেই সময়ই জল্লেশবাবুর মৃত্যু হয়। দোকানটাও উঠে যায়। তখন জল্লেশদার বয়স ছিল চল্লিশের বেশি।

অনীতার স্বামী লোক ভাল। তাকে সব বুঝিয়ে দিতে খুব বেগ পেতে হয়নি। জল্লেশদার কাহিনী শোনার দিন পনেরোর মধ্যে অনীতার ভ্রান্তি কেটে যায়। স্বামীর ঘরে যেতে তখন আর আপত্তি হল না তার।

৭

সুরের উন্মাদনা

—মায়ের চেহারা আমার চেয়ে অনেক ভাল, সত্যিকারের রূপসী বলা চলে মাকে। মায়ের পাশে দাঁড়ালে ছেলেরা আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না, মাকেই দেখতে থাকবে। হ্যাঁ মনে হবে আমার বোন খুব জোর বছর চার-পাঁচেকের বড়। অপরিচিত কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে সঙ্গীত সমাজের পরিচালিকা শান্তিদেবীর আমার বয়সী মেয়ে থাকতে পারে। আমাদের ছোট শহরের অনেকেই জানে না শান্তিদেবীর মেয়ে আছে। দশ বছর বয়স থেকে আমি কলকাতার এক স্কুল বোর্ডিং-এর বাসিন্দা, সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করার আগে মায়ের কাছে গেছি মাত্র দুবার,—তাও দিন তিনেকের জন্য। গরমের আর পুজোর ছুটিতে মা কলকাতায় আসতেন সাধু মামাকে নিয়ে। হয় আমরা তিনজন ছুটিতে কোনো জায়গায় বেড়াতে যেতাম, না হয় মা আমার সঙ্গে কলকাতার কোন হোটেলে ছুটিটা কাটিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতেন। আমার জন্মস্থান প্রায় আমি ভুলতেই বসে-ছিলাম। স্কুল ছাড়ার পরীক্ষার পর আমি মাকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাক্স বিছানা নিয়ে, সোজা গিয়ে দেশের বাড়ীতে হাজির হলাম। এখন ভাবি না গেলেই বোধহয় ভাল ছিল।

এই অবধি বলেই মেয়েটি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মনে হল, অন্য কিছু ভাবছে বা শুনছে। ওর স্বামীর কাছ থেকে জেনেছিলাম মাঝে মাঝে একটা বাজনার শব্দ কানে আসে, আর তারপরই মেয়েটির সারা দেহে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। পাশের চেয়ার থেকে উঠে এসে স্বামী ওর কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকানি দিলেন, ওর নাম ধরে ডাকলেন, মেয়েটি সাড়া দিল না। ওর চোখ দুটো তখন সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ, পলক পড়ছে না। সারা শরীর শক্ত আর ভারী হয়ে গেছে—ওর হাত ধরে আকর্ষণ করতেই সেটা বোঝা গেল। স্বামী ইঙ্গিতে জানালেন, জয়ার ফিট হয়েছে। এখন কিছুক্ষণ ওর এই অবস্থা চলবে। দেহ কঠিন হয়ে থাকবে, চোখ দুটো ঐ দেওয়ালে আটকে থাকবে, ডাকে সাড়া দেবে না কথা বলবে না, মাথা নাড়বে না। ডাক্তারী শাস্ত্রে এই অবস্থানকে বলে ক্যাটালেপসি।

জয়ার অসুখ বেশ পুরনো। পাঁচ বছরের মধ্যে দুবার নার্সিংহোমে থাকতে হয়েছে, প্রথমবার মাস তিনেক, দ্বিতীয়বার মাসখানেক। আগের তুলনায় এখন বেশ কিছুটা ভাল আছে, কিন্তু অসুখটা পুরো-পুরি সারছে না। প্রতি

বছর এই পুজোর সময় অসুখ বাড়ে। কাজ কর্মে অনিচ্ছা, স্নানাহারে অরুচি, সব সময় অস্থিরতা, কথা বার্তা কমে যায়, ঘুম একেবারে হয় না,—আরো অনেক কিছুর একটা ছোটো-খাটো ফিরিস্তি দিলেন ওর স্বামী প্রবীরবাবু। মফঃস্বলের একটা স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক এই প্রবীরবাবু। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ চেহারা, বক্তব্য অল্প কথায় গুছিয়ে বলতে পারেন, দেখে মনে হয় বেশ রুচিবান ও বুদ্ধিমান। তাঁর মুখে শুনলাম এই 'ক্যাটলেপটিক ফিট'টা আগে ছিল না, বছর দুয়েক হল হচ্ছে। এই ফিট হবার আগে জয়া একটা গান শুনতে পায়, কথাগুলো বুঝতে পারে না, কিন্তু সুরটা খুবই পরিচিত মনে হয়—যেন আগে কোথাও শুনেছে। নতুন উপসর্গ হবার পর ওকে আর কিছুতেই নার্সিং-হোমে পাঠান যাচ্ছে না, ওষুধও খেতে চাইছে না। বারবার স্বামীকে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলছে। ওর ধারণা এ অসুখ কোনদিনই সারবে না। প্রবীরবাবুর জীবনটাকে ও নষ্ট করে দিতে চায় না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর মার কাছে ফিরে যাবে জয়া। সেখানে ও সুখে থাকবে না ঠিকই, কিন্তু প্রবীরবাবু তো এই চিররুগ্ন স্ত্রীর ভার বহনের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

—কিন্তু আমি জানি মার কাছে জয়া থাকতে পারবে না। কিছুদিন থাকার পর হয় পালাবে কিম্বা আত্মহত্যার চেষ্টা করবে। মায়ের কবল থেকে ওকে উদ্ধার করবার জন্যই আমি ওকে বিয়ে করি।

আমার নির্দেশে প্রবীরবাবু জয়ার জীবন-ইতিহাস খুলে বললেন।

ছোটনাগপুরের একটা ছোট শহরে জয়ার বাড়ী। বাড়ীটা ওর মাতামহের ছিল, বর্তমানে মায়ের অধিকারে। জয়ার মা অবাঙ্গালী খৃষ্টান। ডাকসাইটে সুন্দরী, গানবাজনায়ও খুব নাম। কয়েক বছর হল বাড়ীতেই একটা গানের স্কুল খুলেছেন, স্কুলটা ভালই চলছে। বছর পঁচিশেক আগে জয়ার বাবা একটা অভ্রখনিতে চাকরি নিয়ে ঐ শহরে আসেন, তাঁরও গানবাজনার খুব শখ ছিল। সেই সূত্রে জয়ার মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, পরে বিবাহ হয় মাস ছয়েকের মধ্যে। জয়ার বাবা বাঙ্গালী হিন্দু, বিবাহটা তাই শাস্ত্রমতে হয়নি। বিবাহের পর দশ বছর ওঁরা কোন মতে বিবাহবন্ধনটা টিকিয়ে রেখে-ছিলেন। শুনেছি, রোজই ওঁদের মধ্যে খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল। ইতিমধ্যে জয়ার মা'র বাবার মৃত্যু হয়েছে, জয়ার বাবা যে কোম্পানীতে কাজ করতেন, সেই কোম্পানীও লালবাতি জ্বেলেছে। জয়ার বাবা বাধ্য হয়ে নিজের বাসা তুলে দিয়ে স্ত্রীর বাড়ীতে এসে উঠেছেন। তাঁর জমান টাকা ছিল না, কাজেই খাওয়াপরার জন্য স্ত্রীর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। জয়ার দাদামশাই বেশ মোটারকমের ব্যাঙ্কব্যালান্স রেখে যান, জয়ার মা-ই তাঁর একমাত্র সন্তান। সবদিক থেকেই জয়ার মার মুক্ত জীবন যাপনের সুযোগ ছিল এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তিনি কোন সময়েই দ্বিধা করেন নি। এ অবস্থায় যা হবার

তাই হল। জয়ার যখন ৮।৯ বছর, তখন ওর বাবা-মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। বাবা ঐ শহর ছেড়ে চলে গেলেন, তখন থেকে জয়া তাঁর কোন খবর জানে না। জয়ার মা বলেন কুম্ভমেলায় ভিড়ের চাপে তিনি মারা গেছেন—এ খবর তিনি নাকি নির্ভরযোগ্যসূত্রে পেয়েছেন। জয়াও এতদিন তাই বিশ্বাস করে এসেছে। বছরদুয়েক আগে মায়ের বাক্সে একটা চিঠি পায়, সেটা পড়ে বুঝতে পারে বাবার মৃত্যু-সংবাদটা বানান। তখন থেকেই ঐ গান শুনছে আর ঐ রকম ফিট হচ্ছে।

—আপনার সঙ্গে জয়ার কি করে পরিচয় হল?

—কোলকাতা থেকে পরীক্ষা দিয়ে ও বাড়ী চলে আসে, ওর মুখেই শুনেছেন। সেও প্রায় বছর-ছয়েক হতে চলল। সেই সময়ে আমি ওখানকার খৃষ্টান মিশনের স্কুলে চাকরী পাই। ঐ স্কুলটা বলতে গেলে জয়ার দাদুর ব্যাক্তিগত চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল। তিনি কিছু টাকাও স্কুলের জন্য রেখে যান। স্কুলে জয়ার মায়ের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। জয়া কলকাতা থেকে ফিরে এসে স্কুলের প্রাইমারী বিভাগে অবৈতনিক শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেয়। সেই সময় থেকে ওর সঙ্গে আমার আলাপ। স্কুলটা ও জয়াদের বাড়ী শহরের বাঙ্গালী পল্লী থেকে বেশ কিছুটা দূরে শহরের একপ্রান্তে। জয়ার গানের স্কুলে কিছু বাঙ্গালী মেয়ে গান শিখতে আসত বটে, কিন্তু শহরের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে ওঁর মেলামেশা ছিল না। হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন। ওঁর স্বাধীনভাবে চলাফেরা, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ইত্যাদির জন্যই বোধহয় ওঁর নামে বদনাম রটেছিল। জয়া বাড়ী ফিরে এসে সেটা জানতে পেরে নিজেকে গুটিয়ে নিল। স্কুলের দু-একজন বৃদ্ধ পাদরী শিক্ষক ও আমার সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে মিশত না। আমার সঙ্গে ক্রমশ হৃদ্যতা জন্মাল। আমাকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে চা খাওয়াত, গান শোনাত বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করত। মাঝে মাঝে ওর মা এসে আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন তবে বেশিক্ষণ থাকতেন না। পুজোর ছুটি হয়েছে, কলকাতায় যাব বলে গোছগাছ করছি, এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে জয়াদের বাচ্চা চাকরটা একটা চিরকুট নিয়ে উপস্থিত। জয়ার মা জানিয়েছেন, জয়ার অবস্থা খুব খারাপ, এখুনি ডাক্তার নিয়ে যেন চলে আসে। দিন দুয়েক আগেও ওদের বাড়ীতে এক গানের মজলিশে উপস্থিত ছিলাম, তখন জয়াকে সুস্থ দেখেছি। এর মধ্যে এমন কি হল যে অবিলম্বে ডাক্তার দরকার? ছেলেটার কাছে শুনলাম হুঁস নেই, খুব শক্ত-ধরনের কিছু অসুখ করেছে। মিশনের ডাক্তার নিয়ে গিয়ে দেখি, জয়ার মা আর গানের স্কুলের জন্য একজন শিক্ষক জয়াকে ধরে ধরে হাঁটাবার চেষ্টা করছেন। জয়ার চোখ বন্ধ, চুল খোলা, কাপড়চোপড় ভেজা। শোনা গেল জয়া আফিম খেয়েছে। ডাক্তারবাবু বেশ অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করার ফল

বললেন, এখন আর ভয়ের কিছু নেই বমির সঙ্গে বোধহয় বেশির ভাগ আর্সেনিক বেরিয়ে গেছে। এখন ঘুমুলেই ভাল হয়ে উঠবে। ওষুধপত্র কখন কি দিতে হবে শিক্ষক ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু উঠলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

—জয়া বিষ খেল কেন জানতে পেরেছিলেন ?

—পরের দিন জয়ার কাছেই সব শুনলাম ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। জয়া আমাকে ছাড়তে চাইল না। বাড়ীতে একটা চিঠি লিখে দিলাম, ওখানেই থেকে যেতে হল।

জ্ঞান হবার পর জয়াই সেদিনকার ঘটনা এবং আরো অনেক কিছু বেশ গুছিয়ে বলল :

বাড়ীতে এসেই বুঝলাম মা আমাকে কাছে পেয়ে একটুও খুসী হতে পারেননি। আমাকে বারবার কোলকাতায় ফিরে যেতে বললেন। আমারও কেমন যেন একটা জেদ চেপে গেল, আমি কিছুতেই রাজী হলাম না। সময় কাটছে না দেখে স্কুলে পড়ানোর ভার নিলাম। সেখানে প্রবীরের সঙ্গে পরিচয় হল, ওকে প্রথমদিন দেখেই ভাল লাগল। দু-চারদিনের মধ্যে মায়ের সম্বন্ধে নানা রকমের কথা কানে আসতে লাগল। দু-একটা উড়ো চিঠি হাতে এল। মা আর মার্গ সঙ্গীতের শিক্ষক ভার্গবজীকে নিয়ে অনেক খারাপ খারাপ কথা লেখা ছিল চিঠিতে। ভার্গবজী এসেছেন মাস কয়েক আগে। বাড়ী রামপুর। কিছুদিন আগে লক্ষ্ণৌ-এর এক জলসায় ভার্গবজীর গান শুনে মার খুব ভাল লাগে। তাঁর অনুরোধে আমাদের স্কুলে এসে যোগদান করেন। এসব কথা মায়ের কাছে শোনা। আমি ঐসব চিঠিপত্র বা গুজবে প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি বটে, কিন্তু মন খারাপ লাগছিল। ক্রমশ আমার মনে সন্দেহ ঢুকল। গান শেখার সময় মা ভার্গবজীকে নিয়ে নিজের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। এই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগত না। মাকে কিছু বলতেও লজ্জা করত। মনের শান্তি ক্রমশ নষ্ট হয়ে গেল। এ নিয়ে প্রবীরের সঙ্গে আলোচনা করব ঠিক করলাম, কিন্তু কিছুতেই কথাটা তুলতে পারলাম না। নিজের মাকে নিয়ে—ছিঃ। এমনি সময় পুজোর ছুটি এসে গেল। প্রবীর চলে যাবে, কথা বলার গল্প করার কেউ থাকবে না,—এইসব চিন্তা মনে নিয়ে একদিন হাঁটতে হাঁটতে বড় সড়ক ধরে অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। ফিরতে রাত হয়ে গেল। আউট-হাউসের কাছে একটা রিকসা দেখলাম। রাত তখন নটা। এত রাত্রে কে আবার এল ? ভাবতে ভাবতে বসবার ঘর দিয়ে মায়ের ঘরের সামনে এসে দেখি দরজাটা বন্ধ। মা কি তবে অতিথির সঙ্গে শোবার ঘরে বসে কথা বলছেন ? বাচ্চা ছেলেটা, রান্নার মেয়েটা কাউকেই ধারে কাছে দেখতে পেলাম না। এত রাত্রে দরজা খোলা রেখে ওরা কোথায় গেল ? এইসব সাতপাঁচ

ভাবছি, এমনি সময় দরজার খিল খোলার শব্দ শুনলাম। তার পর যে দৃশ্য দেখলাম তা আপনাকে আমি বলতে পারব না। কয়েক সেকেণ্ড বোধ হয় আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম, কথা বলার শক্তিও আমার ছিল না। ভার্গবজী দ্রুত পায়ে আমার পাশ কাটিযে বাইরে চলে গেলেন। মা বেশবাস ঠিক করতে করতে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমার লজ্জা করে না জয়া ছিঃ। মায়ের ঘরের দরজায় আড়ি পাততে এসেছ। ছিঃ।' তাঁর কথাগুলো জড়ানো, মা নিয়মিত আফিম খেতেন, বুঝলাম আফিমের মাত্রা আজ একটু বেশি হয়েছে। মা বাথরুমে গিয়ে দরজা দিলেন। আমি এর মধ্যেই, কি করব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। মায়ের আফিমেব কৌটো কোথায় থাকে আমি জানতাম। কৌটো থেকে সবটা আফিম নিয়ে এক গেলাস জলের সাহায্যে আফিমের ডেলাটা পেটের মধ্যে চালান করে দিলাম। পেটের মধ্যে অস্বস্তি বোধ হল, গা গুলিয়ে উঠল, নিজের ঘরে ঢোকবার আগেই মুখ নাক দিয়ে একগাদা তেতো টক জল বেরিযে এল। মেঝের ওপরেই শুয়ে পড়লাম। জ্ঞান হলে দেখলাম প্রবীর পাশে বসে। আমার জন্যে সেবার ওর পুজোর ছুটিতে কোলকাতা যাওযা হল না।

পরেব ঘটনাগুলো কিছুটা প্রবীরবাবু, কিছুটা জয়ার কাছে শোনা। একদিনে নয়, চার পাঁচদিনে টুকরো টুকবো শুনেছি। পাঠকদের সুবিধের জন্য গুছিয়ে একসঙ্গে পবিবেশন করছি।

জয়ার কাছে আফিম খাওযার ইতিহাস শোনার পর প্রবীরবাবু ওকে কোলকাতায় গিয়ে কলেজে ভরতি হবার জন্যে তোড়জোর করতে বলেন। জয়া রাজী হয না। ওর ধারণা ও চলে গেলে মা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে যাবেন, আরো কুৎসা রটবে, এ শহরে ও আর মুখ দেখাতে পারবে না। মাকে যেমন করে হোক এই পথ থেকে ফেরাতে হবে। সেই দিনের পর দরজা বন্ধ করে সঙ্গীতচর্চা কযেকদিন মাত্র বন্ধ ছিল। পরে নিয়মিতভাবে রোজ দুপুরে মায়ের ঘরে ঘণ্টা দুয়েক ধরে খেয়াল ধ্রুপদের নিঃশব্দ আলাপন সুরু হল। জয়া স্কুল ছেড়ে রোজ দুপুরে বাড়ীতে থাকা আরম্ভ করল; কিন্তু সঙ্গীতরসের ফল্গুধারা বয়েই চলল। জয়ার চোখের সামনেই এখন দুপুরে দরজা বন্ধ হতে লাগল। প্রবীর জয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করত, অনেক করে বোঝাত, কিন্তু কিছুতেই তাকে বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী করাতে পারল না। বিরক্ত হয়ে ও দেখা সাক্ষাৎ এক রকম বন্ধ করেই দিল। জয়ার মাথায় ইতিমধ্যে নতুন মতলব গজিয়েছে। সে ভার্গবের কাছে মার্গসঙ্গীত চর্চা সুরু করেছে। সঙ্গীত স্কুলের ছুটি হবার পর সে গান শেখার জন্য ভার্গবকে আটকে রাখতে সুরু করল; ভার্গবের মনকে সঙ্গীতসাধনা দিয়ে জয় করার সংকল্প নিয়ে জয়া উঠে পড়ে লাগল। ভার্গবের সঙ্গীত প্রীতির মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না। তরুণী

শিষ্যার সাধনাকে সফল করাতে সব রকম সাহায্য করতে রাজী হলেন। চল্লিশোর্ধা মায়ের চেয়ে কন্যাকে তিনি বেশি উপযুক্ত শিষ্যা মনে করলেন। মায়েরও এক এক সময় মেয়ের কণ্ঠে রাগ-রাগিণীর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা দেখে মনে হত; উপযুক্ত শিক্ষা পেলে জয়া একদিন ভারত-বিখ্যাত হতে পারে। গানের প্রতি সহজাত আকর্ষণ থাকার দরুন দুপুরে ভার্গব-সঙ্গ বঞ্চিত হয়েও মা কন্যার ওপর রুষ্ট হতে পারলেন না। কিছুদিন এই রকম চলার পর তিনদিনের জন্য একটা কাজে মাকে জেলাশহরে যেতে হয়। সেই সময় দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ও তখন থেকে জয়ার রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। সেই সন্ধ্যায় একটা খুব শক্ত ও সূক্ষ্ম কাজ আয়ত্ত করতে পেরে ভার্গবের উচ্ছ্বসিত প্রসংসার বন্যায় জয়া ভেসে অন্য এক জগতে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে শুধু কিন্নর কিন্নরীর মেলা, আর সঙ্গীতের জাদুখেলা। ভার্গবের অনুরোধে এই সিদ্ধিলাভের অনুষ্ঠানকে আরো আনন্দময় করে তুলতে জয়া এক গেলাস সিদ্ধির শরবত পান করেছিল। সিদ্ধির নেশা সঙ্গীতের নেশাকে আরো তীব্র করে তুলল। সুর তাল মূর্চ্ছনা সব মিলে এক মাদকতাময় পরিবেশ তৈরী হল। জয়ার কণ্ঠ নীরব, কিন্তু কানে কিন্নরলোকের সঙ্গে সঙ্গীত ভেসে আসছে; চোখ বোজা, কিন্তু চোখের সামনে বৃন্দাবনে গোপিকাদের মিলন দৃশ্য ফুটে উঠেছে; পরিজাতের গন্ধে ওর মন মাতাল হয়ে উঠেছে। এই সিদ্ধিলাভের জন্য গুরুদেবকে কি দক্ষিণা দিতে পারে সে? গুরুদেব যা চাইবেন তাই দিতে সে রাজী। ভোরে ঘুম ভাঙতে, নেশা কাটতে জয়া বুঝতে পারল গুরুদেবকে সে এমন সম্পদ দিয়ে বসে আছে, যে আর তার এই জগতে থাকা চলে না।

এবার প্রবীরবাবুর জবানবন্দীতে শুনুন।

.—প্রথমে মিশন হাসপাতাল, সেখান থেকে জেলা হাসপাতাল। প্রাণের আশঙ্কা চলে গেল, কিন্তু মনের রোগ ধরা পড়ল। কোলকাতায় পাঠান হল। মনের ডাক্তাররা বললেন—স্কিজোফ্রেনিয়া। তিন মাস নার্সিং হোমের চিকিৎসার পর বাড়ীতে আনা হল। আগেই বলেছি পুরো ভাল হল না। আরো একবার নার্সিংহোমে যেতে হল। ওর মা কতটা জেনেছিলেন বলতে পারি না। ভার্গবের সঙ্গে মেলামেশায় ওঁর আপত্তি দেখলাম না। কাজেই আবার বিপদ ঘটল। এক সন্ধ্যায় একটা সুটকেসে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে আমার কাছে এসে ট্রেনে তুলে দিতে অনুরোধ জানাল কোথায় যাবে জানে না, কোথায় থাকবে জানে না। শুধু এইটুকু জানে এখানে সে থাকবে না। আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, এবার সুযোগ পেয়ে প্রস্তাব করলাম। ও রাজী হল। ওর মাকে, 'খুসী না' হয়েও মত দিতে হল; মিশনের যাজকদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করার উপায় ওঁর ছিল না। আপনি অত বিস্মিত হচ্ছেন কেন ডাক্তারবাবু! এরকম ঘটে না? আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল, ওকে বিয়ে করে,

ভালবেসে ওকে আমি সারিয়ে তুলতে পারব। সেরে প্রায় উঠেওছিল। বিয়ের পর বেশ ভালই ছিল। আমরা আলাদা জায়গায় বাসা নিয়েছি। মায়ের সঙ্গে যাতে দেখা না হয়, সে ব্যবস্থাও সাধ্যমত করেছি। কিন্তু বছর দুয়েক আগে মায়ের একটা বড় দরের অসুখ করে, ওকে দেখতে চান। দিন চারেক গিয়ে মায়ের কাছে থাকে। সেই সময় একটা পুরনো বাকসে একখানা চিঠি দেখে। ওর বাবা মাকে লিখেছেন। তা থেকে বুঝতে পারে কুম্ভমেলার গল্পটা বানানো। তখন থেকে ঐ গান শুনছে আর ফিট হচ্ছে। বছরে মাস দুয়েক পুজোর সময় থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অসুস্থ থাকে; তারপর আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কয়েকদিনের মধ্যেই জয়ার কাছ থেকে জানতে পারি ওর বাবা কি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: জয়ার বিয়ের খবর পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর কন্যার রক্তে মায়ের রক্তের ভাগ কম; সে মায়ের মত সঙ্গীতের নেশায় মত্ত হয়ে স্বামী ও সন্তানকে অবহেলা করবে না, উন্মার্গগামী হবে না। আরো জানতে পারি যে গানের সুর শুনে ওর ফিট হয় সে সুর ভার্গবজীর কণ্ঠে শুনেছিল সেই মাদকতাময় সন্ধ্যায়।

১০

একটি বিচিত্র প্রেমের কাহিনী

আত্রার মনীষা অজয়বাবুকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে। অজয়বাবু আতঙ্ক রোগে ভুগছিলেন। বাড়ী থেকে বাইরে যাবার ক্ষমতা ছিল না। কোনো রকমে ট্যাক্সি করে অফিসে পৌছে দিলেও তিনি কাজকর্মে মন বসাতে পারতেন না। ফেরবার সময় ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কিনা, বাড়ী থেকে কোনো লোক নিতে আসতে পারবে কিনা এই চিন্তাতে তিনি আচ্ছন্ন থাকতেন। তাছাড়া আরো ভয় ছিল উর্ধতন অফিসারকে। তিনি যদি ডেকে পাঠিয়ে কোনো কিছু জানতে চান তাহলে কি হবে? চেয়ার থেকে উঠে করিডর দিয়ে অফিসারের ঘরে যাবার কথা ভাবলেই তাঁর হৃৎকম্প হত। গত ছয় মাস ধরে কোনো কাজকর্মই করতে পারেন নি; অধিকাংশ ফাইলই অসম্পূর্ণ; কোনো খবরই দিতে পারবেন না —এই কথা মনে হতেই তাঁর হাত পা কাঁপতে থাকত। আটাশ বছর ধরে এই অফিসে কাজ করেছেন, কর্মঠ ও জনপ্রিয় অজয়বাবুকে সকলেই ভালবাসত। পাশের চেয়ারের সহকারী আন্তরিক সমবেদনা দেখিয়ে বলত—না এলেই পারতেন অজয়দা, আমি যেমন করে হোক চালিয়ে নিতাম। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসেও অজয়বাবু তখন ঘামছেন, নিজের নাড়ীর গতিবেগ নিরিখ করছেন, মনে হচ্ছে এখনই তাঁর হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে। তাঁর চোখ মুখের চেহারা দেখে সহকারী ভয় পেয়ে যেত, তাঁকে ধরে মেডিকাল অফিসারের কাছে নিয়ে যেত। তিনি বুকে ষ্টেথো বসিয়েই বলতেন—বাড়ী চলে যান অজয়বাবু, অবস্থার উন্নতি না হলে অফিসে আসবেন না। অফিসের গাড়ীতে সহকারীর পাশে বসে অজয়বাবু বাড়ী ফিরে আসতেন। বাড়ীর লোকেরা মুখ ভার করে তাঁকে ধরে নিয়ে তাঁর দোতলার ঘরে পৌছে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত। পারিবারিক চিকিৎসককে খবর দিত। তিনি এসে যখন পরীক্ষা করতেন, তখন অজয়বাবুর দেহে কোনো উপসর্গ খুঁজে পেতেন না। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক, হার্ট সাউণ্ড নরম্যাল, ঘাম শুকিয়ে গেছে। গত ছ'মাসে সব কিছু অনুসন্ধানী পরীক্ষা চালিয়েও ডাক্তার পাল অজয়বাবুর দেহে কোনো রোগের চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারেন নি। শহরের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ অজয়বাবুকে পরীক্ষা করে কোনো হদিস পাননি। 'ট্র্যাংকুইলাইজার' 'এ্যান্টিডিপ্রেসান্ট' ইত্যাদি সব রকম ওষুধ খাইয়েও কোনো ফল পাওয়া যায় নি। ডাঃ পালের

হতাশ হয়ে মাথা নাড়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকতো না। বাচ্চা পরিচারক-টিকে ঘরের সামনে বসিয়ে রেখে দশ বার দিন ঘরের মধ্যে কাটাতেন অজয়বাবু। সংলগ্ন বাথরুমে গেলেও বাচ্চাকে দরজার সামনে থাকতে হত, বাথরুমের দরজা আধখোলা থাকত, না হলে অজয়বাবু ভয় পেতেন। খাওয়াদাওয়ার পর্বটা ঘরের মধ্যে চলত। এরপর কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে আবার অফিসে যাবার চেষ্টা করা হত, ফল আগের মতই হত। অফিসে গিয়েই প্রত্যাবর্তন করতে হত। একটা বিভাগের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, কাজেই সহকারী ফাইল-পত্তর নিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে বসেই বিশেষ জরুরী কাজের পরামর্শ নিয়ে যেত।

মণীষা দেবীই রোগীর প্রাথমিক ইতিহাস বললেন। এরপর আমার প্রশ্নের জবাবে যখন বললেন যে অজয়বাবুরা দুই ভাই, উনিই জ্যেষ্ঠ, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, অবিবাহিত—তখন আমি একটু বিস্ময় বোধ করলাম। আমার মনে হয়েছিল মণীষা অজয়বাবুর স্ত্রী। বিস্ময় দমন করে রেখে অজয়বাবুর পারিবারিক ইতিহাস শুনলাম।

ছোট ভাই বিবাহিত ; দুটি সন্তান স্ত্রী ও মাকে নিয়ে একই বাড়ীতে বাস করেন। মাস আষ্টেক আগে পর্যন্ত অজয়বাবু পরিবারেরই একজন ছিলেন। বর্তমানে পৃথকান্ন। অজয়বাবুর টাকাতেই বাড়ীটি তৈরী, সংসার খরচার বেশীর ভাগই অজয়বাবুই জোগাতেন। আলাদা হবার পরও মায়ের খরচা বাবদ ছোট ভাইকে মাসে মাসে বেশ কিছু টাকা জোগান দিচ্ছেন। মা-ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ নেই, আবার খুব যে প্রীতির সম্পর্ক আছে, তাও বলা চলে না। অজয়কে অফিসে পাঠানো নিয়ে ভাই ভাইপোদের যথেষ্ট উৎসাহ আছে, কেননা অজয়বাবুর মোটা মাইনের চাকরীটা গেলে তাঁরাও কম বিপন্ন হবেন না। কিন্তু তাবলে অজয়ের অসুখ নিয়ে তাঁরা যে বিশেষ ভাবিত, তা মনে হয় না। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা ইত্যাদি সাহায্য যে তাঁরা করেন না, তা নয় ; কিন্তু সেই করার মধ্যে কোন আন্তরিকতা আছে বলে মণীষার মনে হয় না। আলাদা হলেন কেন ? যখন খবর পেলেন অজয়বাবু উইল করেছেন এবং তাঁর স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির তিন চতুর্থাংশ অন্যের নামে লিখে দিয়েছেন তখন থেকে মা-ভাইয়ের মনোভাব বদলে গেছে।

—অজয়বাবুর এই বয়সে উইল করবার ইচ্ছে হল কেন ? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মণীষা বললেন যে ওঁর ধারণা উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না, তাই উইল করেছেন।

—কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে সম্পত্তি দান করেছেন বুঝি ?

—না, একটু মুখ নীচু করে থেকে পরক্ষণেই সোজাসুজি আমার চোখে চোখ রেখে মণীষা বললেন : না, সব কিছু আমার নামে লিখে দিয়েছে।

এবার আর বিস্মিত হলাম না। এঁদের সম্পর্কটা কিছুটা আঁচ করতে পারলাম। কোনো প্রশ্ন না করে রোগীর দিকে মনোনিবেশ করলাম। নিয়মমাফিক পরীক্ষার পর বুঝলাম ভদ্রলোক আতঙ্ক রোগে ভুগছেন। কারণটা সঠিক না ধরতে পারলেও এইটুকু বুঝলাম তাঁর মৃত্যুভয়ের সঙ্গে মণীষা সম্পর্কিত। সামান্য কিছু ওষুধ দিয়ে এক সপ্তাহ পর অভিভাবন চিকিৎসার জন্য আসতে বললাম। আর জানালাম যে অজয়বাবুর এই ভয়ের আরম্ভ কবে থেকে, সে সময় তাঁর কোন সমস্যা ছিল কিনা, তিনি ছোটবেলা থেকেই উৎকণ্ঠপ্রবণ ছিলেন কি না, তাঁর বর্তমান সমস্যা কিছু আছে কিনা—এই সব বিস্তারিত লিখে আনলে অভিভাবন চিকিৎসার সুবিধে হবে।

পরের দিন নারীকণ্ঠের ফোনে জানলাম যে অজয়বাবুর অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেছে, আমাকে একবার তাঁর বাড়ী যেতে হবে।
—আমি স্পষ্ট বললাম যে আমি রোগীর বাড়ীতে যাইনা এবং আমার চিকিৎসা আমার এখানে না এলে করা সম্ভব হবে না।

মণীষাই ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন যে রুগীর ভয় খুব বেড়ে গেছে। গতকাল নাকি পাড়ার একজন সদ্য পাশ করা ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ওঁরা এসেছিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে সিরিঞ্জ, ইনজেকশনের ওষুধ ইত্যাদি ছিল। তাই অজয়বাবু কোনমতে যেতে পেরেছিলেন। আজ ডাক্তারটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর ধারণা বের হলেই গাড়ীতেই তার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে।

এই সব ক্ষেত্রে ভয়কে প্রশ্রয় দিলে রোগীর অপকারই হবে, উপকার কিছুই হবে না—এই বলে ফোন রেখে দিলাম। চারদিন পরে আদ্রার এক চিকিৎসক অজয় ও মণীষাকে বাড়ীর গাড়ী করে আমার কাছে এনে হাজির। আসার আগে তিনি ফোনে জানালেন যে মণীষা ও অজয়ের সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে; তার জন্যে অজয়ের এই অসুখের উৎপত্তি হতে পারে। তিনি সব কথা ওদের খোলাখুলি বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। ডাক্তার দুবে ওদের বাইরে রেখে ভেতরে এসে আমাকে আবার সেই কথা বলে বিদায় নিলেন এবং অজয়কে বলে গেলেন যে ঘণ্টাখানেক পরে এসে তিনি ওদের বাড়ী নিয়ে যাবেন। ডাক্তার দুবে ওদের সত্যিই স্নেহ করেন। ওদের ভালমন্দের সঙ্গে জড়িত একজন আদর্শ পারিবারিক চিকিৎসক।

ব্যাপারটা আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম। সবটা জেনে সত্যিই অবাক হলাম। অজয় কিন্তু বার বার মৃদুকণ্ঠে অথচ দৃঢ়ভাবে জানাল যে তার মনে কোনো অপরাধবোধ নেই। মণীষা কালই তাদের সম্পর্কের কথা খোলাখুলি জানাতে চেয়েছিল, অজয়ই প্রয়োজন নেই মনে করে নিষেধ করেছিল। অজয়ের কথায় এবার তার ভয়ের ইতিবৃত্ত বিবৃত করছি।

—আমার সঙ্গে মণীষার সম্পর্ক বৈধতার পর্যায়ে উন্নীত করবার জন্য মণীষা তার স্বামীর কাছে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা তুলেছিল বছর খানেক আগে। আমরা দুজনেই আশা করছিলাম তার স্বামী এই প্রস্তাবে সম্মত হবেন। ও তখন স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে শ্রীনগর গেছে। আমার বাড়ীর লোকরা আমাদের অবৈধ সম্পর্ককে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মণীষার বিবাহ বিচ্ছেদের পর আমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে এই কথা জানার পর থেকে তাদের আচরণে পরিবর্তন ঘটল। আমার বাড়ী ও টাকাকড়ি আমার অবর্তমানে ছোটভাই এর ছেলেমেয়েরা পাবে—এই ধারণাই তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। মণীষা বছরে প্রায় ৩।৪ মাস স্বামীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে বাস করত, এতে প্রথম তাদের শুচিবোধ আহত হলেও মুখ ফুটে তারা এ নিয়ে কোনো কিছু বলে নি। শেষের দিকে ব্যাপারটা তাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, আমার পরিবারের সকলেই বোধ হয় সংস্কারমুক্ত ও আমার প্রতি অনুরক্ত। এখন ধারণা আমার পালটে গেছে। যাক সে কথা। রোজ আশা করছি মণীষার কাছ থেকে ওর স্বামীর সম্মতিসূচক খবর পাব এবং মণীষার সঙ্গে আমার সম্পর্ককে সামাজিক করে তোলার সুযোগ আসবে এবং মণীষা আমার কাছে বারো মাস থাকবে। সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। ভোর বেলাতেই খবর পেলাম আমার এক বন্ধু এক হাসপাতালের এমার্জেন্সীতে আছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বেরুতে যাচ্ছি এমনি সময় ডাকে মণীষার চিঠি পেলাম। স্বামী পারিবারিক কলঙ্কের ভয়ে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী নন। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। মেয়েও নাকি সব কথা জেনে গেছে এবং তাকে আর শ্রীনগর যাতায়াত না করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে। মনটা দমে গেল। হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম বন্ধুটির মৃত্যু হয়েছে। আরও জানতাম রাত্তিরে সিনেমা দেখে ফেরবার পথে সহসা সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়, পথচারীরা তাকে গাড়ী করে হাসপাতালে আনে। করোনারী থ্রম্বসিসে তার মৃত্যু হয়েছে। সেইদিন বাসে উঠে প্রথম আমার মনে হল, আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বুকের কাছে একটা ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। অফিসের সময়কার বাসের ভিড়ে আমার খুবই কষ্ট হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে অস্বস্তি ও ভয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। ভিড় ঠেলে কোনো রকমে বাস থেকে নেমে পড়লাম। রাস্তার ধারেই বসে বসে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে একটা গাড়ী করে বাড়ী ফিরে এলাম। তার পর থেকেই মাঝে মাঝেই আমার অফিস যেতে ভয় হতে লাগল। বাসে ওঠা বন্ধ। গাড়ী করে কোনোরকমে অফিস যেতাম। ফেরবার সময় যেদিন গাড়ী পেতাম না বাধ্য হয়ে বাসে উঠতে হত। প্রায়ই কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস থেকে নেমে পড়তাম। এই সময় মণীষা লিখল সে বাড়ী আসছে। তার স্বামীর গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না। স্বামী

তাকে যে মাসোহারা দিতেন, তা আর সে ছোঁয় না। আমি যেন তাকে কিছু টাকা পাঠাই।

—এইবার আমাকে কিছু বলতে দাও অজয়। না হলে ডাক্তারবাবুর মনে ভুল ধারণা জন্মাতে পারে। আমার স্বামী আমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার কোনোদিন করেন নি। মাসোহারা নেবার দাবী আমার নেই বলেই আমি নিতে অস্বীকার করেছিলাম। আইনসম্মত বিচ্ছেদে রাজি না হলেও নীতিগতভাবে আমাদের বিচ্ছেদে তিনি স্বীকৃত হলেন, তাই আমি তাঁকে টাকা পয়সার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য নিতে অস্বীকার করায় তিনি দুঃখিত হলেও, আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। স্বামীর বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই।

এইবার আমি মুখ খুললাম: আপনারা কাহিনীটা মাঝখান থেকে শুরু করেছেন, তাই সব কিছু বুঝতে পারছি না। গোলক ধাঁধার মত লাগছে। এবার মণীষা গোড়া থেকে ইতিহাস বলতে শুরু করল:

—শৈশব থেকে অজয়ের সঙ্গে আমার চেনা। শহরের উপকণ্ঠে একপাড়াতেই আমরা থাকতাম। ওদের বাড়ীতে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। অজয়ের এক ভাগ্নী ওদের বাড়ীতে থেকে আমার সঙ্গে এক স্কুলে পড়ত, সেই সূত্রেই যাতায়াত। আর্থিক অবস্থা আমাদের স্বচ্ছল ছিল। বাবা বড়দরের সরকারী চাকরী করতেন, মা ছিলেন এক বনেদী ঘরের মেয়ে। আমার তিন দাদাই আমার থেকে বয়সে বেশ বড়। আমি সর্বকনিষ্ঠ, তাই সবার প্রশ্রয় ও সব ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। মামার বাড়ী পাটনায়। সেখানে মামাদের বাগানে আমি গাছে চড়ে ছেলেদের সঙ্গে পেয়ারা পাড়তাম; এমন কি পায়ে দড়ি বেঁধে নারকোল সুপুরি গাছেও অনায়াসে উঠে যেতাম। মামাদের কাছে আমি বন্দুক রিভলবার চালাতে শিখি। লক্ষ্য অব্যর্থ হয়ে উঠেছিল। বারো তের বছরে আমি বুঝতে পারলাম অজয়কে আমি ভালবাসি। গল্প উপন্যাসের ভালবাসা কি তখনও আমি জানি না। রোজই অজয়কে একবার না দেখে আমি থাকতে পারতাম না। অজয় তখন কলেজে ঢুকেছে; রোজ বার ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারার দিকে পাড়ার সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাত। আমি ভোরে উঠেই ওদের বাড়ী গিয়ে ওর ব্যায়াম করা দেখতাম, সঙ্গে থাকত ওর ভাগ্নী। অজয়ের শান্ত মেজাজ ও নম্রস্বভাবের জন্য পাড়ার সকলেই ওকে ভালবাসত। আমার ভালবাসা যে তাদের থেকে অন্য ধরনের, সে বোধটা এল যখন স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠেছি—বয়স তখন পনেরো। তখন আমার বাড়ন্ত চেহারার দিকে পাড়ার ছেলেদের নজর পড়েছে; গল্প উপন্যাস পড়তে শুরু করেছি। 'চন্দ্রশেখর', 'দেবদাস' পড়া শেষ। আমার ওপর তখন অভিভাবকদের নজর পড়েছে, ঘন ঘন অজয়দের বাড়ী যাওয়া নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মা

একদিন স্পষ্টই বললেন যে অজয়দের বাড়ীতে যখন তখন যাওয়া নিয়ে পাড়ায় নিন্দে হচ্ছে, দাদারা খুবই রেগে গেছেন, ওখানে আর যাবি না। আমি কোনো কথা না বলে তখনই মেজদার সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেলাম। শরীর খারাপ ছিল বলে চারদিন অজয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি; শরীরমন দুইই ক্লান্ত ছিল। গিয়ে শুনলাম অজয় কোলকাতায় গেছে, বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে গেছে। জেনে আমার মনমেজাজ খুবই খারাপ হয়ে গেল। আমাকে না জানিয়ে এর আগে কোনো দিন বাইরে যায়নি। ওদের বাড়ীর লোকরাও আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বললেন না। ওর মা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, যে অজয় নাকি চায়না যে আমি যখন তখন ওদের বাড়ী যাই। পাড়ার ছেলেরা ওকে আর আমাকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে, ওর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। আরো বললেন, তাঁরা আমাদের মত বড় লোক নন, পাড়াপড়শির মুখ চেয়ে তাঁদের চলতে হয়। আমি একটি কথা না বলে বাড়ী চলে এলাম। সাতদিন বাড়ীর বাইরে গেলামনা, স্কুলেও না। কেউ কিছু বললে উত্তর দিতাম না। এর মধ্যে ঝিকে দিয়ে দু খানা চিঠি পাঠিয়েছি অজয়ের নামে। ওর তরফ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি তখন বুঝতে পারিনি দাদাদের চক্রান্তে চিঠিগুলো অজয়ের হাতে পৌছায়নি। দিন দশেক পরে ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদলাতে আমাকে নিয়ে কাশ্মীর যাওয়া হল। আমি সত্যিই বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কি অসুখ বলতে পারব না। আমি সব সময় যেন আধাঘুমন্ত থাকতাম। কি হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছি, কে কি বলছে, কিছুই বুঝতে পারতাম না। অজয়ের ওপর ক্রোধে ও অভিমানে প্রথম কয়েকদিন চোখ দিয়ে যে জল ঝরেছিল, সে জল কখন শুকিয়ে গেছে টের পাইনি। কাশ্মীরে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে বাবার এই বন্ধুর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। কি করে কি হল আমার ঠিক মনে নেই। আমার যে বিয়ে হল বুঝলাম কিন্তু তার অর্থটা ঠিক মত বুঝতে পারলাম না। আমার স্বামী কাশ্মীরেই চাকরী করতেন। সেখানে আমাকে রেখে মা-ছাড়া বাড়ীর আর সবাই চলে এলেন। আমার স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হলাম কিছুদিনের মধ্যে। বছরখানেক পরে যেদিন বুঝলাম বেশ কয়েকমাস আগে স্বামীর সন্তান আমার গর্ভে এসেছে তখন আমার চেতনা ফিরে এল। একদিন সকালে উঠে আমার গত কয়েকমাসের ঘটনা একসঙ্গে মনে পড়ল। অজয়দের বাড়ী থেকে ফিরে এসে তন্দ্রায় সেই যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আজ যেন সেই ঘুম ভাঙল। আমি যার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি, তাকে আজ যেন প্রথম দেখলাম। শান্ত সৌম্য সুদর্শন পুরুষ। এর কাছে সব খুলে বলা চলে। খেলাঘরের বর বউ খেলতে খেলতে অজয়ের সঙ্গে আমার সত্যিকারের বিয়ে হয়ে গেছে; আমি তাঁকে জানালাম। তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারব না। এ বিয়েটা অসিদ্ধ।

আমাকে মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ জানালাম। ধীরভাবে তিনি সব শুনলেন। সামান্য অস্থিরতা প্রকাশ পেল হাবভাবে। তারপর বললেন, "আমাকে তোমার আগেই সব বলা উচিত ছিল, তা হলে আমি তোমাকে এই বিপদে ফেলতাম না। তোমাকে ছোটবেলায় দেখেছি, তোমার বাবা আমার চাকরী করে দিয়েছেন। তাই এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। তোমার বাবা বোধ হয় জানতেন না এসব।" আমি বললাম : "সবটা জানতেন না, আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সন্দেহ করেই বোধ হয় আমাকে একরকম জোর করে ধরে এনে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। বিয়ে দিয়েছেন যখন তখন আমি নিশ্চয়ই অসুস্থ ছিলাম, আমি বুঝতে পারিনি কি ঘটছে। বোধশক্তি চিন্তাশক্তি রহিত আমার দেহটার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে; এ বিয়ের কোনো মূল্য-নেই। স্বপ্নের মধ্যে বিয়ে হয়েছে আমার, এ বিয়ে অসিদ্ধ—বেশ জোর দিয়েই আমি কথাগুলো বললাম।" তিনি বললেন—"কিন্তু আমাদের সন্তান তো স্বপ্ন নয়। তার কথা ভেবেছ কি? আমি তোমাকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারি, কিন্তু এই সন্তানের জন্য তোমাকে সারা জীবন আমার বউ সেজে থাকতে হবে। আমার সমাজ, আমার পরিবার জানবে আমরা স্বামীস্ত্রী।" অন্য লোক হলে, এখন বুঝি, আমাকে তখনই ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করত। আমার যাবার জায়গাও খুঁজে পেতাম না। বাপের বাড়ী, অজয়ের বাড়ী কোনো বাড়ীতেই আমার জায়গা হতনা। সতেরো বছর বয়সে আমাকে বোধহয় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হত।

কাহিনী বিস্তার না করে সংক্ষেপে সারাংশ বলছি। মণীষা বেশ কয়েক বছর কাশ্মীরে কাটানোর পর একদিন সহসা বাল্যসঙ্গিনী অজয়ের ভাগ্নীর সঙ্গে দেখা হবার ফলে জানতে পারলো যে অজয় অবিবাহিত এবং মণীষার বিয়ের খবর জানে। মণীষাকে অজয়ের মা মিথ্যে সংবাদ দিয়েছিলেন; অজয় মনীষার কোন চিঠি পায়নি। মণীষার মাথাটা সেদিন ঘুরে উঠেছিল। কয়েক দিন ধরে নিজের সঙ্গে লড়াই করে বুঝল অজয়কে দেখবার ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার ইচ্ছাকে দমন করতে সে সমর্থ। বছর দশেক পরে বাবার মৃত্যু সংবাদ এল। এই সময় স্বামীর মত নিয়ে কোলকাতায় এসে অজয়ের সঙ্গে দেখা করে বুঝতে পারল তারা পরস্পরের প্রতীক্ষাতেই দিন গুণছিল। স্বেচ্ছায় মণীষা অজয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করল। বৃদ্ধা মা মণীষাকে আশ্রয় দিলেন বটে কিন্তু দাদারা মণীষার আবির্ভাবকে সুনজরে দেখলেন না। যে দিন মণীষা প্রথম অজয়ের ঘরে রাত কাটাল, সেইদিন বাড়ী ফিরতে বড়দা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন যে অজয়কে তিনি গুণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করবেন। তিনি একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি, কাজটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। মণীষা ঠাণ্ডা গলায় বলল, অজয়ের গায়ে হাত দিলে সে দাদার পুত্রকন্যাকে গুণ্ডা দিয়ে

নয়, নিজের হাতে গুলি করে মেরে সে আত্মহত্যা করবে। দাদা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে তার নিশানা অব্যর্থ। দাদা মণীষাকে চিনতেন, ঘাবড়ে গেলেন। বৃদ্ধা মা সব শুনে বললেন, মণীষা যেন এ বাড়ীতে আর না আসে; সে অজয়ের বাড়ীতেই থাকুক। মণীষা রাজী হল না। রাত্রিবাস সে অজয়ের বাড়ীতে করলেও, দিনের বেলায় সে নিজের বাড়ীতে থাকবে—এ বাড়ীতে তার অংশ সে ছাড়বে না। লোক জানাজানি ও কেলেঙ্কারীর ভয়ে দাদা এই শর্তে রাজি হলেন। বছরে মাস চারেক কোলকাতায়, মাস আষ্টেক কাশ্মীর—এই ভাবে মণীষা বছরদুয়েক কাটিয়ে দিল। স্বামীর সঙ্গে কিন্তু তারসামাজিক সম্পর্ক বজায় রইল, দৈহিক সম্পর্ক আগেই ছিন্ন হয়েছিল। স্বামী পুজো আর্চা ও শাস্ত্রচর্চায় মন দিলেন। মণীষার সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ বাধল না। মেয়েকে হস্টেলে রেখে মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন এবং আইনসম্মত বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজি হলেন। পরে মেয়ের বিবাহ ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে শেষ মুহূর্তে তিনি মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত মণীষাকে অপেক্ষা করতে বললেন। সেই খবর শোনার পর থেকেই অজয়ের মনের অসুখের সূত্রপাত—একথা আগেই বলা হয়েছে। অসুখের খবর পেয়েই মনীষা আদ্রায় চলে এসে অজয়ের বাড়ীতে উঠে তার চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ভার নিয়েছে। অজয়ের বাড়ীর লোকদের ভ্রূকুটি, পাড়াপড়শিদের টিটকারি, দাদা বউদির অবহেলা—কোনো কিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। এবার একটানা ছ মাসের ওপর সে অজয়ের বাড়ীতেই আছে।

অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন রোগীর থেকে রোগীর সঙ্গীনীর কথাই ডায়েরীতে বেশী কেন? ঐ রকম রোগ চিকিৎসকদের কাছে নতুন কিছু নয়; এবং সম্মোহন অভিভাবনের সাহায্যে এই ধরনের রোগীদের আতঙ্ক সহজেই দূর করা যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। কিন্তু এই ধরণের কাহিনী আমার কাছে সত্যিই অসাধারণ। গোপন অবৈধ প্রেমের ঘটনা অনেক শুনেছি, প্রথম রিপুর তাড়নায় সুস্থ স্নেহপরায়ণ স্বামীর অজ্ঞাতে পরপুরুষের কাছে দেহ সমর্পিত কিছু অসুস্থ নারীর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছে। তাদের ঘৃণা না করলেও শ্রদ্ধা করতে পারিনি—বড় জোর তাদের প্রতি অনুকম্পা বোধ করেছি। স্বামিত্বের অধিকারে স্ত্রীকে ভালবেসেও তাকে মর্যাদা দিতে না পারায় অনেক স্ত্রী অসুখী অসুস্থ হয়ে থাকেন। —পুরুষপ্রধান সমাজে স্ত্রীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করেন বেশির ভাগ পুরুষ। স্বামীর দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম নিগ্রহ সহ্য করে, চোখের জল গোপন করে, দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যাচ্ছেন স্ত্রী; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপাত-তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে নিত্য কুরুক্ষেত্র ঘটছে; মাঝে মাঝে রাতের মিলন ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সম্পর্কহীন স্বামী-স্ত্রী জীবন যাপন করেছেন —এই সব ঘটনার সঙ্গেই আমরা বেশি পরিচিত। উচ্চবিত্ত ও অভিজাত

শ্রেণীর মধ্যে আবার দেখা যায় স্বামী তাঁর ব্যবসা, চাকরী, আড্ডায় নিমগ্ন, স্ত্রী তাঁর সমাজ সেবা বা মার্কেটিং নিয়ে ব্যস্ত। ব্রেকফাষ্ট টেবিলে ছাড়া কদাচ তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। বিরোধ সংঘাত কমই ঘটছে। ঘটলে তার স্বাভাবিক পরিণতি বিবাহ বিচ্ছেদে। দাম্পত্য জীবনে বিশৃংখলা সমাজের অন্য স্তরের বিশৃংখলার মত বেড়েই চলেছে। মণীষার জীবনী আমার এই সীমিত অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়েনি বলেই ডায়েরীতে তার কাহিনী বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। সমাজের ভয় আজ নেই বটে; কিন্তু সামাজিক অনুশাসন তুচ্ছ করে মাথা উঁচু রেখে অতি সহজে বিবাহ বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারেন যিনি, এবং তার জন্যে বিন্দুমাত্র গ্লানি বা অপরাধ যিনি বোধ করেন না অথবা সংঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন না—তাঁকে সাধারণের পর্যায়ে ফেলা চলে না। নাটক নভেলে বা প্রবন্ধে বড় বড় বিপ্লবী বুলি আওড়ানো কঠিন নয়। কিন্তু স্বামীকে শ্রদ্ধেয় মনে করে, কন্যার প্রতি অসীম স্নেহ বুকে চেপে, কিশোর বয়সের খেলাঘরের বিয়েটাকে কোনো রকম সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া মেনে নেওয়া—বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের স্বল্পশিক্ষিত, রাজনৈতিক পার্টি বা স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোনো নারীর পক্ষে সত্যিই অভিনব ঘটনা। মণীষা 'উওম্যানস্ লিব' জাতীয় কোনো আন্দোলনের অথবা নরওয়ে সুইডেন আমেরিকার নারীদের আচার আচারণ সম্পর্কে কোনো সংবাদ জানতেন বলে ডায়েরীতে উল্লেখ নেই। তাঁর স্বামীর টাইপ আমার কাছে খুব অপরিচিত নয়, তবু একথা অনস্বীকার্য যে এরকম উদার মানুষও খুব বেশি নেই। তিনি হোমোসেক্সুয়াল বা অন্য নারীতে আসক্ত ছিলেন না—এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম মণীষাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

মণীষা সমাজের বা পরিবারের বিরুদ্ধে ঠিক বিদ্রোহ করেনি; তার শৈশব-ইতিহাসে সমাজ বা মাতাপিতার প্রতি বিদ্বেষের কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। মণীষার দেহ বয়সের অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তি পরিণত হয়েছে, কিন্তু এক জায়গায় সে কিশোরীই রয়ে গেছে। তার বিয়ের আগে যে মানসিক অবস্থার কথা শুনেছি, সেটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়। সেই জন্যই কি মণীষা মনের দিক থেকে কিশোরীই রয়ে গিয়েছিল? অনেক চিন্তা করেও এই মেয়েটির চরিত্র আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি—একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। এরকম বিচিত্র প্রেমের কাহিনী মাত্র কিছুদিন আগে আর একটি আমাকে শুনতে হয়েছে। বলা বাহুল্য সেও এই চিকিৎসা প্রসঙ্গে, দুটি কাহিনীর মধ্যে কিছুটা মিল আছে। তবে সে কাহিনী বর্ণনার সময় এখনও আসেনি।

কাহিনীটির স্থান ও পাত্রপাত্রীর পরিচয় সঠিক নয়; কিন্তু কাল ও ঘটনার বিবরণের মধ্যে কোনো কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়নি। অনেকদিন মণীষার কোনো খবর জানিনা। তবে আমার মনে সে অক্ষয় আসন পেতে বসে আছে।

১১

দাম্পত্য থেকে মুক্তিইচ্ছা

কতোদিন বিয়ে হয়েছে? —পাঁচ বছর। লাভ ম্যারেজ না নেগোশিয়েশানস্ ম্যারেজ? —লাভ ম্যারেজ। সন্তান ক'টি? —একটি, তিন বছরের।

এইভাবে প্রশ্নোত্তরের ফলে জানা গেল যে, মিলন এর সঙ্গে মিলির বিবাহ বন্ধন ঘটেছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক জল ঘুলিয়ে। মিলিকে পার্বতীর মতো কঠোর তপস্যা করতে না হোক, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে অনেক। বিধবা মা ও একটি মাত্র ছোটো ভাই নিয়ে তাদের ছোটো সংসারটি ছিল একান্ত-ভাবে মিলির উপার্জন নির্ভর। মিলনের মা এসে মিলির মায়ের হাত চেপে ধরে যখন ভিজে গলায় বললেন যে তাঁর একমাত্র সন্তান মিলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই বিয়ের ওপর; তখন মিলির মা রাজি না হয়ে পারলেন না। মাস নয়েক ধরে এই বিয়ে নিয়ে লাখ লাখ কথা হয়েছে; মিলির মায়ের কাছে এই প্রস্তাব সরাসরি কেউ তুলতে সাহস পায় নি। না মিলন না মিলি। বিয়ের পর মিলির চাকরি করা চলবে না, মিলনের কাজের জায়গায় যেতে হবে। একটি নার্সিং হোমের সেবিকা মিলি খুব কাজের মেয়ে। সেখানে মাস ছয়েক চিকিৎসার জন্য থাকতে হয়েছিল মিলনকে। মোটর দুর্ঘটনায় বড়ো রকমের চোট লাগে মাথায়, দু-পায়ের লম্বা হাড়, কয়েকটি পাঁজরের হাড়ও ভেঙেছিল। মস্তিষ্কের আঘাতটা ছিল বড়ো রকমের। জ্ঞান আসতেই সময় লেগেছিল দিন তিনেক। রক্ত লেগেছিল কতো বোতল, তার সঠিক হিসেব দিতে পারেন নি মিলন মিত্র। অন্য একটি চেয়ারে বসেছিলেন বিষণ্ণ মিলি।

অনেকক্ষণ ধরে, ভেবে ভেবে, পুরনো ইতিহাস জানাচ্ছিলেন মিলনবাবু।

—মিলির সঙ্গে পরিচয় নার্সিং হোমের কেবিনে। নার্সিং হোমের প্রধান সেবিকাকে প্রথম দিকটায় আমার ভাল লাগে নি, ওর গার্জিয়ানি স্বভাবের জন্য। আমি একটু বেশি স্বাধীনতা প্রিয়। মা-বাপের শাসন মানতে চাই নি বলে আমাকে বোর্ডিং স্কুলে রাখা হয়েছিল। সেখানকার ধরাবাঁধা খবরদারিই বোধ হয় আমাকে আরও উচ্ছৃঙ্খল, আরো বেপরোয়া করে তুলেছিল। স্কুলে থাকতেই আমি নেশা করতে শিখি। বিড়ি, সিগারেট থেকে গাঁজার বিড়িতে প্রোমোশন ঘটে। বাবা কড়া পাদ্রীর মতো আমাকে সদাচারী করার চেষ্টা করতেন, আর মা তার অগাধ স্নেহসাগরে ঢেকে রেখে বাবার কড়া নিয়মানুবর্তিতার বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দিতেন। আমি কলেজে পড়বার সময় এক

ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে 'ড্রাগ'-এর নেশা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম। পাকাশয়ের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে সময় বেশি নিয়ে থাকে, তাই ডাক্তার বন্ধু আমাকে ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করতে শেখালেন। আমি নিজের উরুদেশে ইনজেকশন করে নেশার ওষুধ দ্রুত মস্তিষ্ককোষে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলাম। 'ইনস্ট্যাণ্ট আপ', মানে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভূলোক থেকে দেবলোকে আরোহণের কৌশল আয়ত্ত করলাম। বাবা তিনপুরুষকে গোল্লায় পাঠাবার মতো যথেষ্ট অর্থ রেখে গতায়ু হলেন। আমি অনেকগুলো খনির মালিক হয়ে তত্ত্বাবধানের জন্য নতুন একখানি 'রেসিংকার' ৬০ মাইল বেগে চালিয়ে, পাহাড়ি রাস্তায় সাড়া জাগিয়ে চরকির মতো ঘুরতে লাগলাম। মোটর-গাড়ি আর আমার দেহগাড়ির—দুয়েরই জ্বালানি আরো বাড়াতে লাগল। ৫ গ্যালন পেট্রল আর অন্তত ৫টা ইনজেকশন হলো আমার দৈনিক বরাদ্দ।

বাধা দিতে বাধ্য হলাম। আত্মকাহিনী সংক্ষিপ্ত করার ইঙ্গিত দিতে মিত্র-মশাই জ্বলে উঠলেন: আপনার সময়ের মূল্য মাফিক চার্জ করবেন, আমার বক্তব্যে বাধা দেবেন না।

—আস্তে কথা বলুন। আপনার হুকুম চালাবেন খনির ম্যানেজারদের ওপর। এখানে আমার নির্দেশ মতো না চললে আমি আপনাকে বাইরে যেতে অনুরোধ করব।

কথায় কাজ হলো। একবার উঠে দাঁড়িয়ে মিত্র মহাশয় মিসেসের দিকে তাকালেন। মিসেস চোখ নামালেন। মিত্র বসে পড়ে একটু নরম গলায় বললেন: বেশ, আমি চুপ করছি। আপনিই যা হয় বলুন।

—রাগ করবেন না মিঃ মিত্র। দরকারি কথাগুলো আগে জেনে নিয়ে আপনার জ্বালানির হিসেব-নিকেশ শোনা যাবে। আচ্ছা, মিঃ মিত্র, মিসেস মিত্রের এই মনমরা ভাব কবে থেকে দেখছেন? মিসেস মিত্র, আপনি যদি কষ্ট করে বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করেন, তাহলে ভাল হয়।

মিসেস মিত্র মুখ নিচু করে বাইরে গেলেন। মিঃ মিত্রের দিকে তাকাতে তিনি বললেন: বছর খানেক হবে। হ্যাঁ মনে পড়েছে, সেদিন আমি বিলাসপুর থেকে ফিরেছি। গিয়ারটা 'ট্রাবল্' দিচ্ছিল তাই স্পিড তুলতে পারি নি। সাতটায় পৌঁছে মিলিকে তাক লাগিয়ে দেব ভেবেছিলাম। মনটা তাই ভাল ছিল না। বেলা ৯টায় পৌঁছে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি মিলি বিছানায়। কোনোদিন ৬টার পর ওকে বিছানায় থাকতে দেখি নি। অবাক হওয়া স্বাভাবিক। ডাকা-ডাকি করতে চোখ মেলে তাকালো। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। গিয়ারের জন্য আমার দেরি হয়ে গেছে শুনেও ওর মুখে কোনো রেখা ফুটলো না। খুব মৃদু স্বরে ওকে ওর মায়ের বাড়িতে রেখে আসতে অনুরোধ করলো। আমি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

—কেন মায়ের বাড়ি যেতে চাওয়ার মধ্যে অবাক হবার কি আছে।

—বিয়ের পর চার বছর ও আমার অভিভাবক হয়ে ঘরসংসার চালিয়েছে, আমার দেহযন্ত্র চালাবার ফুয়েল চার্জ শূন্যের কোটায় নামিয়ে এনেছে। বিগত এক বছরের মধ্যে নতুন ইনজেকশনের দাগ খুঁজতে আমাকে অনাবৃত করে নি। ওর মা কোলকাতা থেকে এসে মাঝে মাঝে থেকে গেছেন, ও কোনোদিন আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় নি। অবাক হবো—এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

—আপনি নেশা ছেড়ে দিয়েছেন। খুব ভাল কথা। অন্য কোনো ব্যাপারে ওকে আঘাত দিয়েছেন কি-না ভেবে দেখুনতো?

—আঘাত? ওকে আঘাত দিলে আমার রেসিং কারের ফুয়েল বন্ধ হয়ে যাবে, এ জেনেও আমি ওকে আঘাত করতে যাবো?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু স্পষ্ট করে বলুন।

—ও, হো। আমাদের বিয়ের চুক্তির কথা আপনাকে বলা হয় নি। আমিতো সব জানাতে চেয়েছিলাম, আপনি মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিলেন। চুক্তি হয়েছিল যে, আমি দিনে ৬০ মাইলের বেশি গাড়ি চালাতে পারবো না। ওরই এক নিকটাত্মীয় আমার বাড়ির ম্যানেজার। গাড়ি গ্যারেজ থেকে বের হবার সময় একবার মাইল মিটার দেখে নোট বুকে লিখে রাখে আবার গ্যারেজে ঢোকাবার সময় মিটার নোট করে। বেশি হলে পরের দিন কম চালাতে হয়। আর চুক্তি ছিল কোনো ব্যাপারে ওর অবাধ্য হলে তিনদিনের ফুয়েল বন্ধ থাকবে। আমি ইনজেকশন নেওয়া ছেড়েছি, কিন্তু টপ স্পিডে গাড়ি চালানোর অভ্যাস ছাড়তে পারি না, পারবোও না।

এ রকম অদ্ভুত চুক্তির কথা এর আগে কোনোদিন শুনি নি। কিছুক্ষণ ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ওঁকে বলে যেতে অনুরোধ করলাম। উনি বলে চললেন।

—আমিও আপনার মতো প্রথমটায় ভেবেছিলাম বোধ হয় আমি ওর মনে কোনো আঘাত দিয়েছি, বোধ হয় কোনো শর্ত ভঙ্গ করেছি। অনেক খুঁজে পেতে দেখলাম। না, আমার দিকে কোনো ত্রুটি হয় নি। ত্রুটি ওর। ওর আমার প্রতি আকর্ষণ নেই। তাই ও মায়ের কাছে ফিরে যেতে চায়। এখন ওঁর মায়ের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি কোনো শর্ত ভঙ্গ করি নি, ও শর্ত ভঙ্গ করে আমার কাছ থেকে চলে যেতে চায়। আমি—হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলবো। লজ্জা-টজ্জা আমার নেই। আমি কান্নাকাটি করলাম, তিনদিন না খেয়ে রইলাম। ওর মতের পরিবর্তন হলো না। কিন্তু মনের পরিবর্তন ঘটলো। কয়েকদিনের মধ্যে ওর মুখের হাসি চোখের জ্যোতি মিলিয়ে গেল। মায়ের কাছে যাবার কথা বলে, কিন্তু নিজে থেকে তোড়জোড় করে না।

কোলকাতায় নিয়ে এলাম। অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না। খায় না, ঘুমোয় না। আমার মা এলে তবু একটু নড়ে চড়ে বসে, ওর মা এলে মুখ ফিরিয়ে শোয়।' বিড়বিড় করে বলে, তিনি ওর জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। বন্ধু ডাক্তারদের পরামর্শে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আমার এখানে অবাধ স্বাধীনতা। আমার গাড়িটা এনেছি, মাইল মিটার কেউ চেক্ করে না; ইচ্ছে করলে এক দৌড়ে ১০০ মাইল ঘুরে আসতে পারি। কিন্তু ভাল লাগে না। আমার আর গাড়িটার ক্রমশঃ বাত ধরে যাচ্ছে। 'আপনি একটা কিছু করুন।

কে রোগী? স্বামী না স্ত্রী? খুবই মুস্কিলে পড়লাম।

—আপনি বাইরে গিয়ে মিসেস মিত্রকে পাঠিয়ে দিন। একটু ইতস্তত করে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন মিসেস মিত্র। বিষাদের প্রতিমা। তার সঙ্গে কথাবার্তার সারাংশ বিবৃত করছি।

—আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, ওর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। পেথিড্রিনের মোহ থেকে মিঃ মিত্র মুক্ত হয়েছেন। ব্রেকে হাত না দিয়ে 'রেকলেস্ ড্রাইভিং'-এর আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে ওকে আমি পঙ্গু করতে চাই না। আমার পুরনো নার্সিং হোমে ফিরে যেতে চাই। ওর বাড়িতে আমার কোনো কাজ নেই। আর কাজ ছাড়া আমার চলবে না। ওর ওখানে জীবন্মৃত হয়ে থাকতে পারব না। আর সব বুঝতে পেরে উনি আজকাল দেরি করে বাড়ি ফেরেন। মনে মনে তিনিও বোধ হয় পরিত্রাণ চান।

এর পর কিছু একান্ত গোপনীয় খবর জানার জন্য আমার তরুণ সহকারীকে বাইরে যেতে বললাম। শিক্ষিতা সেবিকার মুখ থেকে শুনলাম, বছর খানেক ধরে তিনি স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হতে পারেন নি। ইচ্ছা বা কামনার উত্তাপ অনুভব করছেন না। তিনি নিশ্চয়ই যৌনশীতলা রোগে ভুগছেন। স্ত্রীর তুলনায়, সেবিকার ভূমিকাই তাঁর উপযুক্ত। স্বামীগৃহে সেবা কার্যের প্রয়োজন আর নেই। তাই তিনি নির্বিবাদে বিদায় অভিলাষী।

তাকে বাইরে পাঠিয়ে মিত্রমশাই-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নতুন এক মানুষের সন্ধান পেলাম। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হুকুমদারী ভঙ্গিতে জানালেন যে, মিলি তার সঙ্গে মিলনে অনিচ্ছুক; পেথিড্রিন ছাড়ার পর থেকে আমার মিলির ওপর আসক্তি বাড়তে থাকে। আসক্তি বাড়ার পর থেকে ও আমাকে এড়িয়ে চলছে। ও বুঝতে পারছে না যে, সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি ওকে ভালবাসতাম। কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গি একই রকম, কিন্তু আমার মনে হলো অন্য একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। মানুষটার বাইরে রুক্ষ, কর্কশ 'রেসিং কার'-এর গতিতে চলতে অভ্যস্ত; কিন্তু অন্তর শান্ত, পত্নীপ্রেমে সমাহিত। সব শেষে যখন বললেন—আমি গত কয়েক মাস রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ বসে থেকে অনেক

রান্ত করে বাড়ি ফিরি। বারোটার পর বাড়ি এসে স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে দেখে মন খারাপ কম হওয়াই স্বাভাবিক—তখন সেই ভিজে গলায় তাঁর আন্তরিক ভালো-বাসার আভাস পেয়ে অভিভূত হলাম।

আর এক দফা বাক্যালাপ হলো মিসেসের সঙ্গে। মিঃ মিত্রের মনোভাব কিছুটা তাঁকে জানিয়ে বললাম : উনি কিন্তু আপনাকে সত্যিসত্যিই ভালোবাসেন। ভালোবাসতে পারেন নি, তাই নেশা করেন। আপনাকে ভালবেসে নেশা ছেড়েছিলেন। আপনি ওকে ছাড়লে আবার হয়তো ইনজেকশনের সিরিঞ্জ হাতে তুলে নেবেন। আপনি ভেবে দেখুন মিসেস মিত্র। আপনার এতদিনের সেবা ও সাধনা সব বৃথা হবে।

মিলি মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখ তুললেন যখন, তখন তাঁকে অন্য রকম দেখাল। শরীরের সব রক্ত মুখে এসে জমেছে। সেই পাণ্ডুর বিষণ্ণ ভাবের লেশ মাত্র নেই। উত্তেজনা-আবেগে শরীরটা কাঁপছে।

—আমি পারবো না ডাক্তারবাবু। ওর ভালবাসার আতিশয্য আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। ও-নেশা করলে তবু কিছুটা স্বাভাবিক থাকে, কোনো মতে সামাল দিতে পারি। কিন্তু নেশা ছাড়ার পর থেকে ওর দানবিক শক্তি এসেছে ; সেই দানবকে আমি ভয় পাই। পেথিড্রিন দানবটাকে সরিয়ে রাখতো। পেথিড্রিন ইনজেকশন ওর নেশা নয়, ওকে শান্ত করার ওষুধ। না, না—আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে নিজের জায়গায় যেতে দিন, আমার চিকিৎসার দরকার নেই।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস মিত্র। যাবার চেষ্টা করলেন। শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। মুখের রক্তাভাস চলে গিয়ে আবার পাণ্ডুর বিবর্ণ দেখাতে লাগল ধীরে ধীরে বসে পড়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

নাটকীয় দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত আমি ; তবুও মিলন-মিলির মিলন-বিচ্ছেদের নাটক আমাকে বিস্মিত বিচলিত করল।

কি বলতে চাইলেন তিনি? প্রথমদিকে স্বামীর অভিভাবিকা ছিলেন। পেথিড্রিনের ওপর নির্ভরতা দূর করে তাকে স্ত্রী-নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীন-চেতা বিশ শতকের মধ্যভাগের উইমেন্‌স-লিব-এর ছোটো খাটো এই নেত্রী নিজের পরিবারের এবং যে নার্সিং হোমে চাকরি করতেন, সেখানকার সর্বাধ্যক্ষা কর্ত্রী হিসেবে যৌবনের কয়েকবছর কাটিয়েছেন। পেথিড্রিন নির্ভর নাবালক স্বামীর অভিভাবকত্ব তাঁর ভাল লেগেছিল। তখন তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হতে তার কোনো সঙ্কোচ বা গ্লানি বোধ হয়নি! কিন্তু যখন ড্রাগের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামী কিছুটা স্বয়ংভর হলেন, তখন থেকে তাকে ভয় পেতে লাগলেন 'উইমেন্‌স্ লিব'-এর নেত্রী। মাইল মিটার চেক্ করে তেল-ডিজেল সরবরাহ করার কর্তৃত্ব

থাকা সত্ত্বেও তার মনে হতে লাগল যে, আর তিনি অভিভাবক নন। খনির মালিকের আর পাঁচটা ম্যানেজারের মতো তিনিও একজন কর্মচারী। বেতনভুক নন, পুরো স্বাধীনতা আছে পরিবারের পরিচালনার ব্যাপারে। তা সত্ত্বেও তাঁর মনে হচ্ছিল যে, এসব মিঃ মিত্রের বদান্যতা, উদারতা। তিনি আসলে এই কৌশলেই পারিবারিক শান্তি তথা সামাজিক স্থিতাবস্থা, তার খনির শ্রমিক কর্মচারীদের ভুয়ো স্বায়ত্তশাসন দিয়ে, মেকি আত্মীয়তা স্থাপন করে, তাদের শোষণ করছেন। পিতৃতন্ত্র তথা পুরুষতন্ত্র বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উপকারী গার্জিয়ান সেজেছেন, হাঁকডাকের শাসন প্রতিপত্তি বজায় রেখে চলেছেন। স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণের অভিনয় করে তার শ্রম ও দেহ উপভোগের আনন্দ পেতে চাইছেন। দানব বলতে তিনি তাকে স্বাধীনতা-লুণ্ঠনকারী ভেকধারী একসপ্লয়টর বোঝাতে চেয়েছেন।

Ann Foreman-এর Femnity as Alienation বইটি আমার হাতের কাছে ছিল। মিসেস মিত্রের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে ঘণ্টাখানেক করে নারী মুক্তি নিয়ে আলোচনা চলল। পরে আলোচনায় মিঃ মিত্রও অংশগ্রহণ করলেন। অনেক ঝাপসা জিনিস পরিষ্কার হলো। সেই সময়ে পৃথিবী ব্যাপী ছাত্র আন্দোলন, নারীমুক্তি আন্দোলনের বন্যার জল নামতে শুরু করেছে। মানসিক ভীতি, প্রেমের শিকলে বাঁধা পড়ে আত্ম-অবলুপ্তির ভয় কেমন করে মিসেস মিত্রের দেহমনে 'ডিপ্রেসন' এনে দিয়েছে, তাকে যৌনশীতলও করেছে—এটা আলোচনার ফলে স্পষ্ট হলো।

মিঃ মিত্রের হেড অফিস কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হলো। মিসেস মিত্র তাঁর পুরনো চাকরিতে যোগ দিয়ে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ বোধ করলেন। মিঃ মিত্রের সপ্তাহে তিনদিন 'স্পোর্টস কার'-এ কর্মস্থলে যাতায়াত চলল। তাঁর ভ্রমণবিলাসের স্বাধীনতা বাড়ল। মাইল মিটার চেক করার প্রথার ঘটল বিলুপ্তি।

১২

কামনার বিকৃতি

—'আমি ভালবাসতে জানি না, ভালবাসতে শিখিনি। আমি কোনোদিনই আমার স্ত্রীকে ভালবাসিনি। না, আমি ভালবাসতে চাই না। ভালবাসতে শিখতে হয়, এই বয়সে নতুন কিছু শেখবার আমার ক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই। আমি জানি জ্ঞানীগুণীরাই শুধু ভালবাসতে পারে। আমি অপদার্থ, আমি কোনোদিন আমার স্ত্রীকে ভালবাসতে পারব না। তবে আপনার কাছে কেন এসেছি? আমি 'ভয়েস' শুনছি আমাকে কারা সব শাসাচ্ছে, ভয়ে আমি সারা রাত জেগে থাকি। সকাল বেলায় ট্রামবাসের শব্দে ওদের কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়লেও, একেবারে থেমে যায় না। আমার অফিস যাওয়া বন্ধ, লেখাপড়ার কাজ বন্ধ। এ-বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করুন—এই আমার অনুরোধ।

দীপকবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ, রোগা-পাতলা চেহারা, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। ছোটভাই আমার কাছে এনেছেন। কয়েকদিন হল অফিসে যাচ্ছেন না, বাড়ীর বাইরে যেতে চান না, কারুর সঙ্গে কথাও বলেন না। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে বিছানায় উৎকণ্ঠিতভাবে বসে থাকেন। অনেক সাধ্যসাধনা, জোরজবরদস্তি করে ঘর থেকে বের করা হয়েছে। ভদ্রলোকের লেখায় হাত আছে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক। তাঁদেরই একজন আমাকে ওঁর ইতিহাস কিছুদিন আগে জানান। সংক্ষেপে তাঁর কথাতেই এখানে বিবৃত করছি।

—দীপকের বিয়ে হয়েছে বছর দশেক আগে। স্ত্রী বরুণাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। দীপক বছর দুয়েক আগে এম-এ পাশ করে তখন চাকরীর চেষ্টা করছে। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের দায়দায়িত্ব ওঁর ওপর পড়েছে। মা আগেই গত হয়েছিলেন। আমার দূরসম্পর্কের ভাইঝি বরুণা সেবার বি-এ পরীক্ষা দেবে। তার কোচিং-এর কাজে দীপককে লাগিয়ে দিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই প্রেমে পড়ে দীপক কয়েকটা ভাল কবিতা লিখে ফেলল। আমাকে সব কথাই ও খোলাখুলি বলল, আর বিশেষভাবে অনুরোধ করল দাদাকে বলে বরুণার সঙ্গে ওর বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে। বরুণার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তার বিশেষ অমত নেই। দাদা-বউদি প্রথমটায় একটু-আধটু আপত্তি জানালেন।

কিছু দিনের মধ্যেই দীপকের চাকরী হল, কাজেই তাঁদের আপত্তির কারণ রইল না। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর প্রথম বছর কয়েক দীপক খুব উৎসাহ সহকারে চাকরী ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করল। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। এরপর সাহিত্যচর্চার উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল। বরুণার সঙ্গে দেখা হলে শুনতাম অফিস থেকে এসে অনেক রাত অবধি পড়াশুনো করে দীপক। আলো জ্বলা থাকায় বরুণার ভালো ঘুম হয় না। বেশির ভাগই মনস্তত্ত্বের কেতাব পড়ে, বই থেকে খাতায় কি সব লিখে রাখে। আর এই সব নোট সন্তর্পণে ফাইলবন্দী করে নিজের ড্রয়ারে চাবিবন্ধ করে রাখে। বরুণা দেখতে চাইলে দেখায় না। এ নিয়ে কোনো আলোচনাও করতে চায় না। নিজের কাজে বছর দুয়েক বাইরে থাকার পর কলকাতায় এসে দীপকের খোঁজ নিতে গিয়ে ব্যাপারটা প্রথম জানলাম। মাস ছয়েক হল চার বছরের বাচ্চা নিয়ে বরুণা বর্ধমানে তার বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে। বলা উচিত, দীপক তাকে যেতে বাধ্য করেছে। দীপকের সঙ্গে কথা বলে কোনো কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে হল, ওর মাথায় গোলমাল ঘটেছে। বর্ধমানে গিয়ে বরুণার কাছে শুনলাম যে, দীপক স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছে যে ওদের আর একসঙ্গে থাকা চলবে না। দীপক ওকে ভালবাসতে পারছে না, পারবেও না। বরুণার বাবা খুবই অর্থকষ্টে আছেন, সব জেনেও দীপক নিজের ছেলে-বৌ এর খোরপোষ বাবদ এক পয়সাও দিতে রাজী নয়।

বন্ধুর চাপে আর ভাই-এর সাধ্যসাধনায় দীপক আমার কাছে এসেছেন। স্ত্রীর কথা উঠতেই তিনি আমাকে জানালেন, তিনি ভালবাসতে জানেন না, স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবেন না। তবে নির্যাতনমূলক 'হ্যালুসিনেশন' নির্যাতন থেকে তিনি মুক্ত হতে চান, আমার চিকিৎসাধীন হতে তাঁর আপত্তি নেই!

এবার বরুণার কথা শুনুন: উনি যে বদলে যাচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছিলাম। খোকনের জন্মের পর থেকে আমার ওপর ওঁর বিতৃষ্ণা বেড়ে গেল। ঘুম ওঁর অনেক দিন ধরেই হচ্ছিল না, অনেক বলে কয়ে ডাক্তার দেখাতে পারিনি। অফিসে নিয়মিত যেতেন, গাদাগাদা বই নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। সব বইই 'লাভ' আর সেক্স' সম্পর্কিত। হ্যাঁ, 'উইমেনস লিব' সম্পর্কে কিছু কিছু বই ওঁর টেবিলে দেখতাম। আমেরিকার বড় বড় সমাজ তাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকদের লেখা ঐ সব বই থেকে প্রায় সারা রাত জেগে নোট নিতেন। ওঁর নোটগুলো ড্রয়ারে চাবিবন্ধ থাকত। শেষের দিকে উনি প্রায়ই ড্রয়ারে চাবি দিতে ভুলে যেতেন। সেই সুযোগে আমি ওঁর কিছু কিছু নোট দেখার সুযোগ পাই। বেশির ভাগ নোটই দুজন লেখকের রিপোর্ট থেকে নেওয়া। না, নাম আমার মনে পড়ছে না।…ওঁর পরিবর্তন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমার ওপর বিতৃষ্ণা ক্রমে সন্দেহ অবিশ্বাসে পরিণত হতে লাগল।

বাচ্চাটাকে কোনোদিন আদর করেননি, একটা মিষ্টি কথাও বলেননি, একটা জিনিস কিনে দেননি। মাঝে মাঝে দেখতাম ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। এক রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখি একটা টর্চের আলো পড়েছে খোকনের মুখে, আর উনি নীচু হয়ে খোকনকে দেখছেন। আমি ভয়ে অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মুখে আলো ফেলে বুঝতে পারলেন যে আমি জেগে আছি। তক্ষুনি টর্চ নিভিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি পরদিনই বাবাকে চিঠি লিখলাম আমাকে দিন কয়েকের জন্য নিয়ে যেতে। কয়েক দিনের মধ্যেই বর্ধমানে এলাম। না, ওঁর কাছে ফিরে যাবার আমার ইচ্ছে নেই আর খোরপোষের দাবিতে মামলা দায়ের করতেও চাই না। একটা মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছি, যেমন করে হোক খোকনকে আমি মানুষ করে তুলব।

বরুণা মেয়েটি স্থির ধীর বুদ্ধিমতী। নিজের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বলতে গিয়ে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না, খুব অল্প কথায় স্বাভাবিক গলায় আমাকে স্বামীর সন্দেহবাতিকের কথা শোনাল।

—আমার স্বামীর ভালবাসার প্রথম প্রথম উচ্ছ্বাস ছিল অতিরিক্ত; একটি রাতও আমাকে ছাড়া ওর চলত না। আমি কোনরকম ওজর আপত্তি না জানিয়ে ওঁর দাবি মেটাতাম। উনি তাতেও যেন তৃপ্ত হতেন না, ওঁর ক্ষুধা কিছুতেই যেন মিটত না। মায়ের অসুখ করলে একবার কয়েক দিনের জন্য ওঁকে সঙ্গ দিতে পারিনি। তার জন্যে ওঁর অভিযোগের অন্ত ছিল না। অবশ্য সে অভিযোগে কোনো তিক্ততা বা সন্দেহের ছোঁয়া থাকত না। হ্যাঁ আমি ওঁকে ভালোবেসেছিলাম, উনি আমাকে তখনই নানান ধরনের বই থেকে গল্প পড়ে শোনাতেন আর বলতেন, বেশির ভাগ স্বামী-স্ত্রী বিয়ের পর বছর দুয়েকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আর আকর্ষণ অনুভব করে না, আমাদের যেন সে-রকম না হয়, সে-রকম আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমিও স্বামীর মতে মত দিয়ে তাঁর নির্দেশমত নিত্য নতুন মিলনোৎসবে সহযোগিতা করতাম। তখনও বুঝিনি উনি 'মরবিড'; ওঁর ভালবাসা অসুস্থ পুরুষের দেহলিপ্সা মাত্র। যখন প্রথম জানলেন যে আগন্তুকের আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন থেকেই ওঁর ভাবান্তর। প্রথমটা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন—এত সব নিরোধের ব্যবস্থার পর ওসব হতে পারে না, তুমি ভুল সন্দেহ করেছ। ডাক্তারী পরীক্ষায় যখন সন্দেহের অবকাশ রইল না, তখন থেকেই ওর যৌন মনস্তত্ত্বে আগ্রহ ও সন্দেহ। শেষ পাঁচ বছর যে অপমান সইতে হয়েছে, সে-কথা কাউকে বলা যায় না, বলতে চাইও না। …এই প্রথম ওঁকে সামান্য উত্তেজিত দেখলাম।

কয়েক দিনের মধ্যে দীপকবাবুর কাছ থেকে তাঁর সন্দেহ অবিশ্বাসের বিস্তারিত বিবরণ শোনা গেল।

বরুণার সঙ্গে দেখা হবার আগেও দীপকবাবু প্রেমে পড়েছেন দু'একবার। তবে সে নেহাতই রোমান্টিক ধরনের প্রেম ; কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা মাত্র। সহপাঠিনীর সঙ্গে অথবা পাশের বাড়ীর জানালায় দাঁড়ানো মেয়ের সঙ্গে মনে মনে প্রেমে পড়তেন আর তাদের নিয়ে কবিতা লিখতেন। তারা সে-সব কিছু জানত না। তাদের সঙ্গে মিলনের স্পৃহা, তাদের কাছে পাবার ইচ্ছে পর্যন্ত ওর কোনো দিন মনে জাগেনি। বরুণার সান্নিধ্যে তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন প্রেমের তীব্র আকর্ষণ। মনে হল এই মেয়েটিকে তাঁর চাইই নইলে জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। বিবাহের কিছু আগে থেকে কিছু কিছু যৌনশাস্ত্রের বই পড়ে স্ত্রী-পুরুষের মিলন রহস্য জানতেন। আগে তাঁর যৌন মিলনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রথম রাত থেকেই তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। বন্ধুরা বলেছিল এবং পুঁথিপুস্তকেও নাকি পড়েছিলেন, মেয়েদের মনে কামনা ঘুমিয়ে থাকে, কামনা জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব পুরুষের। সময়মত না জাগালে কামনার ফুল না ফুটে অঙ্কুরেই শুকিয়ে যেতে পারে। পুরুষের দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। কবিরাজী ও হাকিমী দাওয়াই এবং কিছু কিছু মাদকদ্রব্যের সাহায্যে দায়িত্ব পালনের কর্তব্য ঠিক মতই সমাধান করে করে চলছিলেন। গোলমাল বাধল শেষের দিকে, যখন জানলেন স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা। সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও কি করে এটা সম্ভব হল ? তিনজন ডাক্তারের অভিমত নিলেন ; তাঁরা সবাই বললেন এরকম হতে পারে। তবু তাঁর বিশ্বাস হল না। হঠাৎ একদিন মনে হল বরুণাকে তিনি বোধহয় অতিমাত্রায় কামাতুরা করে তুলেছেন। ও বোধহয় ওর প্রেমতৃষ্ণা মেটাবার অন্য কোন সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। তাই বা কি করে হবে ? বরুণাতো আজকালকার মেয়েদের মতো বাইরে বাইরে ঘোরে না, এমন কি সিনেমা বা মার্কেটেও দীপকের সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে যায় না। পুরুষ বন্ধু কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। তবে ? বিশ্বখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকদের বই পড়তে আর নোট নিতে লাগলেন। একজন বলেছেন—যৌনপ্রবৃত্তি বলে কিছু নেই—সবটাই কল্পনা ; অন্যজন লিখেছেন—যৌনবোধ মস্তিষ্কের ধর্ম, সহজাত প্রবৃত্তি নয়, সুতরাং যৌনাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে। তবে তিনি এবং বরুণা নিয়ন্ত্রণ করেননি কেন ? এরপর কিনসে এবং মাষ্টারস ও জনসনের পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন নিয়ে মেতে উঠলেন দীপকবাবু। তাঁরা এ যুগের বাৎস্যায়ন। হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের ইণ্টারভিউ নিয়ে তাঁরা প্রতিবেদন তৈরী করেছেন। এই প্রতিবেদনের প্রতিটি অক্ষর ধ্রুবসত্য বলে ভাবলেন দীপকবাবু। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না যে মিলনের তৃপ্তি ছাড়া কোনো বিবাহই সুখের হতে পারে না। মোট বিবাহ-বিচ্ছেদের চার ভাগের তিনভাগ ঘটে অসমন্বিত মিলনের দরুন। এ-সবই তাঁর ধারণার সঙ্গে মিলে যেতে লাগল, কিন্তু তিনি আর আগের মত বরুণার দেহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব

করলেন না। কেন? ঐসব রিপোর্টই তাঁর এই বিতৃষ্ণার কারণ। তাঁর ড্রয়ারে বন্দী নোট বই থেকে তিনি আমাকে অনেক কিছু পড়ে শোনালেন। কিছু কিছু উদ্ধৃতি তাঁর প্রায় মুখস্থ। ঐ দুটি প্রতিবেদনে এবং এ্যালবার্ট এলিস জুলিয়া শারম্যান প্রমুখের লেখা থেকে তিনি জানলেন যে মেয়েরা স্বভাবত যৌনমিলনে অনীহ, পুরুষের তুলনায় তাদের দেহের ক্ষুধা অনেক কম। অনেক সাধ্যসাধনার পর প্রথম মিলনে মেয়েদের রাজী করানো যায়। প্রথম মিলনের কথা তাঁর বেশ মনে আছে। বরুণাকে রাজী করাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তাহলে? তাহলে কি বিয়ের আগেই ওর অভিজ্ঞতা ঘটেছে?—এই চিন্তা ভদ্রলোকের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তাঁর মিলনের ডাকে সব সময় সাড়া দিয়েছে বরুণা। তাহলে নিশ্চয়ই বরুণা স্বাভাবিক মেয়েদের দলে পড়ে না। দীপকবাবু যতই পড়তে লাগলেন ততই তাঁর মনে সন্দেহ অবিশ্বাস দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। প্রথম যৌবনে যখন অন্যান্য বন্ধুদের প্রেমের গল্প শুনতেন, তখন থেকেই তাঁর ধারণা যে তাঁর মধ্যে পৌরুষের অভাব আছে। তা না হলে কোন মেয়ে তাঁকে প্রেম জানায়নি কেন? তাঁর একবারও মনে হয়নি যে, বন্ধুরা বানিয়ে গল্প বলছে। অথবা ছোট একটা ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করছে। নিজের এই দৈন্যবোধ দূর করার জন্য তিনি বিবাহের পর থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পর্ণোগ্রাফি ও মাদকদ্রব্যের সাহায্যে বরুণার কাছে নিজের পৌরুষ জাহির করতে চেয়েছেন। ক্রমশঃ তিনি নিঃসংশয় হলেন যে তিনি বরুণাকে তৃপ্তি দিতে পারেননি সে নিশ্চয়ই অন্যভাবে তার দেহের ক্ষুধা মিটিয়েছে। বরুণার দেহে তিনি অন্য পুরুষের গন্ধ পেতে লাগলেন। সন্তান যে ওঁর নয়, এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। এর পর সেনেকার লেখা পড়লেন Only a wise man knows how to love.

তখন থেকে 'ভয়েস' শোনা সুরু হল। জলদগম্ভীর স্বরে অনেক দূর থেকে মনে হয় হিমালয়ের কোনো গুহা থেকে কে যেন তাঁকে ডাকছে। ক্লিন্ন জীবন ছেড়ে চলে আয়। সংসারের মোহ ত্যাগ করে বেরিয়ে আয়। নারীদেহের আসক্তি থেকে মুক্ত করে তোকে ভালবাসতে শেখাব, চলে আয়, বরুণার দেহের প্রতি আকর্ষণ কাটল। ছেলেটার প্রতি ঘৃণা বাড়ল। দীপকবাবু ঠিক করলেন বরুণাকে বনবাসে পাঠাতে হবে; না হলে তাঁর মুক্তি নেই। এমনি সময় বরুণা নিজেই বর্ধমানে চলে গেল। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বরুণার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তার গর্ভজাত সন্তানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তিনি স্বীকার করেন না। এর পর থেকে তাঁর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। 'ভয়েস' শুনে আগে তাঁর রোমাঞ্চ হত, নিজেকে অন্যলোকের উচ্চতর জীব কল্পনা করে দেহমন পুলকিত হত। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাচ্ছেন না, সে-সব কথাও কানে আসছে না। এখন কর্কশ কণ্ঠে সব সময়

কে যেন তাঁকে শাসাচ্ছে। কী যে তাঁর অপরাধ তা বলছে না, অথচ শাস্তি দেবে বলছে। এবার মনে হচ্ছে বাড়ীর পাশের অন্ধকার বাগানটা থেকে যেন কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কর্কশ রূঢ় স্বরে তাঁকে তিরস্কার করছে, গালমন্দ দিচ্ছে। দরজা-জানালা বন্ধ করেও নিস্তার নেই, ঐ কর্কশ স্বর কানে আসবেই। সারা রাত ধরে তিনি ঐ ভয়েস শোনেন। দিনের বেলায় ট্রাম-বাসের শব্দে, মানুষের কোলাহলে কণ্ঠস্বরটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু একটু স্থির হয়ে যখনই কোন কিছুতে মন বসাতে যান তখনই শুনতে পান—'সাবধান। পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, শাস্তি তোকে পেতেই হবে।' আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন দীপকবাবু এই ভয়েস শোনার যন্ত্রণা থেকে তাঁকে বাঁচাতে।

ঐসব প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা চলল অনেকদিন ধরে। ঐসব অভিমত যে অভ্রান্ত সত্য নয়, এইটে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। অন্য দলের দু-চারজন পণ্ডিতদের লেখা তাঁকে পড়ে শোনালাম। যৌনতৃপ্তি না হলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবেই একথা ঠিক নয়। ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছাড়া দৈহিক মিলনে তৃপ্তি আসতে পারে না। স্ত্রীকেও মানবিক মর্যাদা দিতে হবে, তবেই স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে আনন্দ পাবেন। বরুণা তাঁকে সুখী করবার জন্য তাঁর অসুস্থ কামনার বহ্নিতে ইন্ধন জুগিয়েছে, এতে তার অন্তরের সায় ছিল না। সে আর পাঁচটা ভাল মেয়ের মতই স্বামীকে ভালবাসতে, সুখী করতে চেয়েছিল। তবে তাঁর 'মরবিডিটি'কে প্রশ্রয় দিয়ে সে মারাত্মক ভুল করেছে—একথাও জানালাম। ক্রমশ তাঁর সন্দেহ অবিশ্বাসের তীব্রতা কমতে থাকল। একজন নামকরা মনোবিদের কথা উদ্ধৃত করে বললাম :

"Bad marriage leads to bad sex adjustment.

এই কথাটাই ঠিক। উল্টোটা অর্থাৎ Bad sex adjustment leads to bad marriage—এই কথাটা ঠিক নয়।

১৩

অলৌকিক প্রেম

'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মেয়েটির ঠোঁট কাঁপল, কথা বেরুল না, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু চাপা কান্নার মত একটা আওয়াজ. মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সে চেতনা হারাল। মিসেস রায় সঙ্গীর সাহায্যে কন্যাকে নিয়ে পাশের ঘরের সোফায় শুইয়ে দিলেন।

মিসেস রায় মফঃস্বল শহরের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। স্বামী ছিলেন ডাক্তার। বছর দশেক আগে সন্ন্যাস রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। ছেলের বয়স তখন কুড়ি, মেয়ের বারো। ছেলে মেয়েকে তিনি বাপের অভাব বুঝতে দেন নি। অনেক দুঃখ কষ্ট, ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি পুরুষালী হয়ে পড়েছেন। ছেলে ডাক্তারী পাশ করে এখন আমেরিকার এক হাসপাতালে কাজ করছে। মেয়ে গত বছর কলকাতার এক বনেদী পরিবারের ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ার সময় বীথির সঙ্গে বিক্রমের পরিচয় হয়। বিক্রম একটা বড় ব্যাঙ্কে কাজ করে। দাদার পাঠানো একটা ড্রাফট ভাঙ্গাতে গিয়ে বীথি বেশ মুস্কিলে পড়েছিল, সেই সময় বিক্রম তাকে সাহায্য করে। প্রথম পরিচয়ের তিন মাসের মধ্যেই বীথি মাকে জানায় যে সে বিক্রমকে বিয়ে করতে চায়; মা যেন কলকাতায় বিক্রমের মায়ের সঙ্গে দেখা করে বিয়ের প্রস্তাব জানান। মিসেস রায় চিঠি পেয়ে হন্ত দন্ত হয়ে কলকাতায় ছুটে আসেন। মেয়েকে অনেক বুঝিয়েও নিরস্ত করতে না পেরে অগত্যা বিক্রমের মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন। জাতকুলের কোনো অমিল ছিল না, বীথিকে দেখে কোনো ছেলের বাপ-মায়ের অপছন্দ হবার কথা নয়। তাকে সুন্দরী বলা চলে। তাছাড়া একমাত্র পুত্রের ধনুর্ভঙ্গ পণ এই বিয়ে না দিলে সে আর কোনো দিন বিয়েই করবে না। অনেক সাধ্য সাধনা করে এতদিন তাঁরা ছেলেকে বিয়ের ব্যাপারে রাজী করাতে পারেন নি, কাজেই তাঁরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন; বিয়ে হয়ে গেল। বীথি মেয়ে হস্টেল ছেড়ে সিমলের শ্বশুরবাড়ী থেকে ক্লাস করতে লাগল। মিসেস রায় কিন্তু এই বিয়েতে সুখী হতে পারলেন না। বিক্রমকে প্রথম দর্শনেই তাঁর অপছন্দ হয়েছে। চেহারার দিক থেকে বীথির উপযুক্ত না হলেও বিক্রম স্বাস্থ্যবান ও বিত্তবান। চাকরী এমন কিছু খারাপ করে না; তাছাড়া এক সময় তাদের পরিবারের এই নগরীতে খুব নামডাক ছিল। তবু কেন যে তিনি মেয়ের পছন্দ করা স্বামীকে অপছন্দ

করলেন, তা তিনিই জানেন না। আজকালকার এই ধরণের বিয়েতে কি তাঁর সায় নেই? না, তা বলা চলে না। এদিক থেকে তাঁর কোনো সংস্কার নেই। ছেলে তো ভিনরাজ্যের এক মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে, তিনি পুত্রবধূকে খুশীমনেই গ্রহণ করতে পেরেছেন। পুত্রবধূ বিদেশে বেশ সুখেই আছে। বিয়ের সময়েই তাঁর মনে হয়েছিল যে বীথি ভুল করছে। আজ তাঁর অনুমান সত্য হচ্ছে চলেছে। জামাতাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছেন না।

মেয়েকে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে মিসেস রায় সংক্ষেপে এই ভূমিকা সেরে বললেন: আমাকে চিঠিতে বরাবর জানাচ্ছে যে সে ভাল আছে। বোর্ডের পরীক্ষার খাতা নিয়ে কলকাতায় এসে ওকে দেখে চমকে উঠলাম। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর স্বীকার করল যে বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই ফিট হচ্ছে, এ অসুখ তার কোনো দিনই ছিল না। তাছাড়া, খিদে নেই, ঘুম নেই, যা খায় তা হজম হয় না, ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বেয়ান বললেন—এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই; গুরুদেব হোম করেছেন, গ্রহশান্তি করা হয়েছে, কালীঘাটে তারকেশ্বরে মানত করা হয়েছে। একজন দৈবজ্ঞ বলেছেন আরও তিন মাস গ্রহের কোপ থাকবে, ততদিন ভুগতেই হবে। বেয়াই ও জামাই বাড়ী ছিলেন না। ওকে একরকম জোর-জবরদস্তি করেই কলকাতা থেকে আমার বাড়ী নিয়ে যাই। মেয়ে কিছুতেই যাবে না, আমিও ছাড়ব না। সে প্রায় আজ দশ দিন হল। আমার কাছে এসে ওর অসুখ আরো বেড়ে গেছে। রোজই এই রকম ফিট হচ্ছে দিনে ৪।৫ বার। স্থানীয় ডাক্তাররা সকলেই ওকে চেনেন, ওকে ভাল বাসেন। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেন নি। তাঁদের পরামর্শ মত আবার কলকাতায় আসতে হয়েছে। তাঁরা বলেছেন বটে ভয়ের কিছু নেই—হিষ্টিরিয়া; কিন্তু আমি একটুও ভরসা পাচ্ছি না। মেয়েকে আমি শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে পারব না। ওদের এই ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথম দু-তিন দিন ও সিমলের বাড়ীতে ফিরে যাবে বলে জেদ ধরেছিল, এখন আর সেসব কথা বলছে না।

স্বামী এর মধ্যে দেখতে যায়নি? আপনি জোর করে আনার জন্যে তারা রাগ করে নি?

—গত রবিবার দুই বন্ধু নিয়ে বিক্রম ওকে দেখতে আসে, নিয়ে যেতেও চায়। কিন্তু সেই সময়ে ওর ঘন ঘন ফিট হতে থাকে। ঘণ্টা পাঁচেক থেকে ওরা ফিরে যায়। সেই থেকে মেয়ে আর শ্বশুরবাড়ী যেতে চাইছে না। রাগ ওদের নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু আমি মা হয়ে মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারি না। ওদের রাগের চেয়ে আমার কাছে আমার মেয়ের প্রাণের দাম বেশী।

—মেয়ে আপনাকে কোন কিছু বলে নি? স্বামী অথবা শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কে? আপনার কাছে অসুখের খবর গোপন করেছে কেন? কি বলছে?

—কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর হয় অজ্ঞান হয়ে যায়, না হয় অঝোরে কাঁদতে থাকে। দেখুন আপনি যদি কিছু জানতে পারেন। বিয়ে করে ভুল করেছে—একথা আমার কাছে কিছুতেই স্বীকার করবে না; আমি ওকে অনেক মানা করেছিলাম। সব ব্যাপারেই ছোটবেলা থেকে ও একগুঁয়ে আর জেদী।

আমার কাছে বীথি মুখ খুলল। কয়েকদিন ধরে অল্প অল্প করে ওর প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত অনেক কথা বলে গেল। বলার সময় প্রথম দিকে কয়েকবার খুব জোরালো ফিট হয়েছিল, ক্রমশ ফিট কমে এল, মুখ চোখের ভাব অনেকটা স্বভাবিক মনে হল। ওর কাহিনী যতটা সম্ভব ওর কথাতেই বলছি।

—'লভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট্?' হ্যাঁ তাই তো বলা উচিত। কেন ওকে ভাল লাগল? বলতে পারব না। কৃতজ্ঞতা বলা চলে না। ড্রাফটটা ক্যাশ করার ব্যাপারে আমাকে যে সাহায্য করেছিল, তার জন্যে ধন্যবাদ জানানোই যথেষ্ট। তবে যেচে আমাকে সাহায্য করেছিল, আমি ওর কাছে সাহায্য চাই নি। হয়তো সেই জন্যে ওকে অন্যান্য ছেলেদের থেকে একটু স্বতন্ত্র মনে হয়েছিল, এর বেশি কিছু নয়। কিছু দিন ধরে ক্লাসের একটি মেয়ে তার প্রেমের গল্প শুনিয়ে আমার কান একেবারে ঝালাপালা করে দিচ্ছিল। তাই কি আমার মনে প্রেমে পড়ার ইচ্ছে জেগেছিল? 'আইডিয়াটা' বেশ 'সিলি'—তাই না? মায়ের অমতে এত বড় ঝুঁকি নিতে গেলাম কেন? আপনি জিজ্ঞাসা করার আগেও এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, উত্তর খুঁজে পাইনি। বিয়ের পর প্রথম মাস একরকম ভালই কাটল। আপনাকে বলতে লজ্জা করছে না, কিন্তু মাকে কিছুতেই বলতে পারি নি। বিয়ের পর ওর বাবা দেশে চলে গেলেন, উদ্দেশ্য বোধ হয় আমাদের কলকাতাতেই মধুচন্দ্রিমা যাপনের সুযোগ দেওয়া। বিয়ের আগে যা যা বলেছিল, বিয়ের পর এক মাস ঠিক সেইসব করল, সেই মত চলল। রোজ রাতে ওদের ফুলবাগানে আমাকে ফুলের সাজে সাজিয়ে আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকত। বিরাট বাড়ী ওদের ছাতটাও মস্ত বড়। তার একপাশে লতা-পাতায় ঘেরা কুঞ্জবনের মত একটা জায়গা, সেখানে রোজ আমাদের ফুলশয্যা নয়, ফুলের বাসর বসত। লতাপাতার মধ্যে বিদ্যুতের জোনাকি জ্বলত, উঁচুতে জালের ফাঁক দিয়ে তারারা উঁকি মারত, মাঝে মাঝে সুইচ টিপে ছাতের আর এক প্রান্ত থেকে চাঁদের আলো আমদানি করত। ভক্তের বিহ্বল দৃষ্টির সামনে আমি ধীরে ধীরে স্বর্গের দেবী হয়ে যেতাম। মনে হত, আমার দেহ শুধু ফুলে তৈরী; আমার দেহে রক্তমাংস নেই, আছে শুধু ফুলের গন্ধ আর তারার আলো। কোনো রাতে আমাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেনি, কোনো সময় আমারও মনে হয়নি আমার আর কিছু চাই। সারা রাত ধরে আমার মালঞ্চের মালাকারের স্তুতি শুনতাম। ভোরের আলো ফুটে

উঠতেই আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হত, হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ শুনতে পেতাম, ঘুমন্ত বিক্রমের দিকে না তাকিয়ে দেবীত্ব বজায় রাখতে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তাম। জেগে শুনতাম, ও অফিসে চলে গেছে। আমার ক্লাসে যাওয়া হত না। ওর সঙ্গে আবার দেখা হত সন্ধ্যার পর সেই ফুলের বাসরে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি শুধু স্বপ্ন দেখতাম, একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে সময়টা কাটত। ফিট কবে থেকে শুরু? হ্যাঁ, আমার মনে আছে। সব বলব। একটা কথা এখনও বলা হয়নি। সেটা আগেই বলা উচিত ছিল। ঠিক সময়ে মনে পড়েনি, তাই বলা হয়নি। ব্যাঙ্কে যখন ড্রাফট ভাঙ্গানোর ব্যাপারে ও আমাকে সাহায্য করল, আমি যথারীতি ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসছিলাম। ও আমাকে ডেকে কি বলেছিল জানেন? বলেছিল—ধন্যবাদ চাই না, আমি আরো অনেকবার আপনার সেবায় লাগতে চাই। আমি বোধ হয় অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, হয়তো আমার মুখে চোখে সেবা-তৃষ্ণা ফুটে উঠেছিল। তাইতো ও বলতে পেরেছিল, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটু অপেক্ষা করলে আপনাকে আপনার হস্টেল অবধি একটা লিফট দিতে পারি।' তারপর থেকে রোজ দেখা হত, কোন দিন গঙ্গার ধারে, কোন দিন সল্ট লেকে, কোন দিন ফুটবলের মাঠে। একদিন 'প্রোপোজ' করল। সাদামাঠা কথায় নয়, কাব্য করে জানাল ও আমার মালঞ্চের মালাকর হতে চায়। প্রায়ই ও ঐ কবিতাটার লাইনগুলো আওড়াতো। আমার বুকে দোলা লাগত, চোখ কান গরম হয়ে উঠত, সারা দেহে শিহরন জাগতো। সুন্দর আবৃত্তি করে 'অশোকের কিশলয় গাঁথি দিব হার। প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে/চিত্রি পদতল চরণ-অঙ্গুলি প্রান্তে/লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব/এই পুরস্কার।' বিয়ের পর ও কথা রেখেছিল। একমাস আমি ছিলাম মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী, আর ও ছিল দীন-ভৃত্য। কিন্তু একদিন নাটকের দৃশ্য পাল্টালো। সেদিন থেকেই আমার ফিট শুরু হল।

আমরা অনেক ধরনের মানুষ দেখি; অনেক অদ্ভুত, অস্বাভাবিক মানসিকতার মোকাবিলা করি। তাই চমক লাগানোর মত ঘটনার সামনাসামনি হতে হয় খুব কমই, অতি অদ্ভুত চরিত্রের দেখা মেলে কদাচিৎ। সেই অতিবিরল চরিত্রের একজন এই বীথি। কর্তব্যপরায়ণ, নিয়মনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা প্রধান শিক্ষিকা মিসেস রায়ের কন্যার এই বিচিত্র মানসিকতার জন্য মায়ের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও বাস্তবানুগামিতা কতখানি দায়ী বলা কঠিন। তবে মাতা ও কন্যার আপাত বিপরীতধর্মী মানসিকতা যে একটা বিশেষ ধরণের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফল একথা অনায়াসে বলা চলে। হয়তো এই বিরোধী চরিত্রের দরুনই তাঁরা একে অপরের কমপ্লিমেণ্টারী হতে পেরেছেন। এবার বীথির মুখেই তার ফিটের ইতিবৃত্ত শুনুন।

—সেদিন সন্ধ্যার আগেই বিক্রম আমাকে নিয়ে ছাতে উঠল। গিয়ে দেখি ওর আরো দুই বন্ধু উপস্থিত। এরা সাধারণত বাইরের ঘরেই বসে থাকে। আমাদের মিলন মন্দিরে ওদের দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল, কথাবার্তায় তাল কেটে যেতে লাগল। ওরা তখন 'রম'-এর বোতল খুলেছে। এক-আধ পেগ মাঝে মাঝে বারে ঢুকে খেলেও বিক্রম কোনদিন বাড়ীতে মদের বোতল আনে নি। শ্বশুরশাশুড়ী নেই বলে ওর সাহস বেড়ে গেছে। কিন্তু আমি তো রয়েছি। আমি তো রাজরাজেশ্বরী। কিন্তু কিছুতেই ওর বন্ধু দুজনের সামনে আমি নিজেকে ফুলরাণী বা রাজেন্দ্রাণী ভাবতে পারছিলাম না। ওদের কথাবার্তা ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে উঠছিল, ওদিকে আমার মন ছিল না। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে উঠে আসব ভাবছি। এমনি সময়ে ওদের একটা কথা কানে ঢুকতেই চমকে উঠলাম। ইংরেজীতে কথা বলছিল, মদের নেশায় ভেবেছিল আমি ইংরেজী বুঝি না। ওদের একজন ডাক্তার, সেই ছিল প্রধান বক্তা। জড়িয়ে জড়িয়ে ভুল ইংরেজীতে সে বিক্রমকে আশ্বাস দিচ্ছিল। বলছিল—বিক্রম দুর্বল নয়, তার যথেষ্ট শক্তি আছে, সে 'কনসামেশনে' (বিবাহকে সহবাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা) সক্ষম। বিক্রমের বোধহয় একটু কম নেশা হয়েছিল, সে কথাবার্তার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করছিল ; কিন্তু ওরা বিক্রমের মৃদু আপত্তি ও ইঙ্গিত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। অন্য বন্ধুটি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল, বিক্রমের শৌর্যবীর্যের প্রমাণ দাখিল করতে গিয়ে এমন সব অশালীন উক্তি করে বসল, যা শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগল ; ওদের সঙ্গ এড়িয়ে পালিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। বুকের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম, চোখের সামনের আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে যেন দপ করে নিভে গেল। পায়ের তলার মাটি যেন দুলে উঠল। সেই আমার প্রথম ফিট।

যে অশালীন উক্তি শুনে বীথি চেতনা হারাল, সেই উক্তি বীথির মুখ দিয়ে কিছুতেই বের করা গেল না। এইটুকু মাত্র জানাল যে, সেই সন্ধ্যায় তাকে ফুলসাজে সাজিয়ে বন্ধুদের চমক লাগিয়ে দেবে বলে বিক্রম ডেকেছিল বীথিকে। তার আগেই 'রমের' প্রসাদে তারা বেসামাল হয়ে এমন কোন রূঢ় গুপ্ত কথা ফাঁস করে ফেলেছিল, যার আঘাত কল্পনাবিলাসী স্বপ্নলোকবাসী বীথি সহ্য করতে পারে নি। এইরকম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পার্টি অর্থাৎ স্বামীর সহযোগিতা বিশেষ দরকার। মিসেস রায় কিছুতেই বিক্রমকে খবর দিতে রাজী হলেন না। বীথিও এই সময়ে সম্পূর্ণভাবে মায়ের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিক্রমকে খবর দিতে চাইল না। তাদের বাড়ী ফিরে যাবার কোন রকম ইচ্ছাও প্রকাশ করল না। অথচ, প্রথমটায় শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে মায়ের সঙ্গে আসতে রীতিমত আপত্তি জানিয়েছিল। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই গোলমেলে, রহস্যময় মনে হল। সমস্যার সমাধান ঘটল অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে। গল্প উপন্যাসে

সাধারণত এরকম ঘটে থাকে। অফিস ডাক্তারের নির্দেশে বিক্রমই রোগী হয়ে মাস দেড়েকের মধ্যে আমার কাছে হাজির হল। তিনি জানালেন, ছেলেটি 'মাইসোফোবিয়া'তে (ময়লা লাগার ভয়) ভুগছে।

দিন তিনেকের মধ্যে রহস্য যবনিকা উঠে গেল। নিজের 'মাইসোফোবিয়া' প্রসঙ্গে বিক্রম জানাল যে বছর তিনেক ধরে অল্প অল্প করে ময়লা লাগার ভয় তার মনে জাগছিল। বিয়ের পর থেকে ভয়টা বাড়তে থাকে; গত কয়েক দিনে ভয় একেবারে চরমে উঠেছে। এখন ব্যাঙ্কে গিয়ে কোন ফাইল কোন কাগজপত্র, এমনকি কলিংবেল পর্যন্ত সে ছুঁতে পারছে না।

বিয়ের প্রসঙ্গে বলল: ময়লা ছোঁবার ভয়েই তিরিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে করিনি। বয়ঃসন্ধিকালে কতকগুলো কু-অভ্যাস আয়ত্ত করেছিলাম। তা থেকে মনে নানা রকমের ভয় ঢোকে। মনে হয় বিয়ে করলে আমি স্ত্রীকে সুখী করতে পারব না। চিকিৎসা? হ্যাঁ, তা প্রায় সব রকমই হয়েছে। ডাক্তাররা অনেকবার বলেছেন আমার ভয়ের কোন ভিত্তি নেই; ওটা সাইকোলজিকাল। বিয়ে করলেই ভয় কেটে যাবে। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ময়লার ভয়টা পরে এসেছে। এক বন্ধু আমার প্রাথমিক ভয় কাটাবার জন্যে আমাকে খারাপ পল্লীর এক বর্ষীয়সী রমণীর কাছে নিয়ে যায়। আসল ভয় কাটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হই। সেই দিন থেকে ময়লার ভয় আমাকে পেয়ে বসে। সেই থেকে নারীদেহের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। তবে বিয়ে করলাম কেন? পিছনে একটু ইতিহাস আছে। একজন হোমিওপ্যাথ বন্ধু আমাকে বোঝান যে 'প্লেটোনিক লভ'-এর মাধ্যমে আমার ইন্দ্রিয়জ ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। এখন কোথায় এমন মেয়ে পাওয়া যাবে যে 'প্লেটোনিক লভ' পেয়ে তৃপ্ত থাকবে? দৈবক্রমে ব্যাঙ্কে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। যাকে দেখেই মনে হল এতদিনে বোধ হয় সেইরকম মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। কয়েক দিন মেলামেশার পর বুঝলাম বীথি অন্য জাতের মেয়ে। মনে হল বাস্তব জগতের বাসিন্দা নয়, কল্পলোকে বিচরণ করাই ওর স্বভাব। ঠিক আমি যা চাই সব কিছু পেলাম ওর মধ্যে। বিয়ের মাধ্যমে শুধু আত্মিক মিলন ঘটবে কোনোদিন আমাদের সম্পর্ক ক্লেদসিক্ত কলুষিত হবে না—এই শর্তে আমাদের বিয়ে হল। মাসখানেক আমি ঠিক ঠিক শর্ত মেনে চললাম। কিন্তু এর মধ্যেই আমার 'প্লেটোনিক লভ'-এর মধ্যে ইন্দ্রিয় লালসা অনুভব করতে লাগলাম। ফলে 'মাইসোফোবিয়া' বাড়তে লাগল। স্ত্রীকে কিছুই জানাইনি। ডাক্তার বন্ধু বললেন 'কনসামেশনের' সময় এসেছে 'বি বোল্ড এ্যাণ্ড এ্যাসর্ট ইয়োরসেলফ'। ময়লার ভয়ের সঙ্গে তখন আর এক নতুন ভয় দেখা দিল বীথির কাছে সম্মান হারাবার ভয়। মনে হল বীথিকে ফুলরাণীর বেশে দেখলে বন্ধুরা আমাকে আর 'কনসামেশনের' ব্যাপারে উত্তেজিত করবে না। তাই একদিন ওকে আমাদের ফুলের বাসরে নেমন্তন্ন করি। সঙ্গে এল আর একজন বন্ধু, সেই

পতিতালয়ে নিয়ে গিয়ে আমার মনে ময়লার ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় আমাদের পানের মাত্রাটা একটু বেড়ে যায়, আমরা বেশ বেচাল হয়ে পড়ি। ডাক্তার বন্ধু আমাকে 'কনসামেশন'-এর ব্যাপারে উৎসাহিত করতে থাকে। আর অন্য বন্ধুটি আমার একরাতের সেই ভুলের কাহিনী ফলাও করে বলতে থাকে, তার বক্তব্য আমি সে-রাতে আমার বীর্যবত্তার প্রমাণ দিতে পেরেছিলাম। তারও উদ্দেশ্য ছিল আমাকে উৎসাহিত করা আমার হীনমন্যতার ভার দূর করা। তারা বোধ হয় খেয়াল করেনি যে আমাদের আলোচনা বীথি শুনছে বা বুঝতে পারছে। সেই থেকে তার ফিটের অসুখ দেখা দিয়েছে। এ অসুখের কোনো ডাক্তারী চিকিৎসা নেই মনে করে মা দৈব চিকিৎসা করাচ্ছিলেন! আর বীথিও আমাদের বাড়ীর ডাক্তারের কাছে যেতে রাজী হয়নি। পাছে সব ফাঁস হয়ে যায়—এই ভয়ে বাড়ীর ডাক্তারবাবুর কাছে আমি যাই নি। ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি, সব কিছু খুলে বলতে চেয়েছি। —ও কিছু শুনবে না আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করবে না। আবার নিজের মায়ের কাছেও যাবে না। ওর ভয় তাহলে সেই পতিতালয়ের মেয়েটি আমাকে পুরোপুরি অধিকার করে বসবে। সেই কালসন্ধ্যা থেকে আমাদের ফুলের বাসর উঠে গেছে। আমি কাজে গেলে ও চিৎকার করে ওঠে, তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায়। কিছুদিন আগে ওর মা এসে ওকে দেশে নিয়ে গেছেন। আমার মায়ের পীড়াপীড়িতে ওকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমাকে দেখেই ওর ফিট হতে থাকে। ওর মা আমাকে অপমান করেই ওদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। 'প্লেটোনিক লভ' 'সেক্সুয়াল লভ' দুই হারিয়ে এখন আমি দেউলে হয়ে গেছি।

প্রেম ও কাম সম্পর্কে ছোটখাট একটা বক্তৃতার পর বিক্রমকে বিদায় দিলাম। মিসেস রায় বিক্রমের আগমনবার্তা শুনে খুশী হলেন না। বীথির অসুখ সারাতে বিক্রমের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করলেন না। বাদী প্রতিবাদী দুইপক্ষেরই মামলা এক উকিল করতে পারে না—এই কথার উল্লেখ করে আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে আমার পক্ষে বিক্রমের চিকিৎসার ভার নেওয়া নীতিবিরুদ্ধ। আমি অবশ্য তাঁর সঙ্গে একমত হলাম না। ইতিমধ্যে বীথির ফিট বারে ও তীব্রতায় অনেক কমেছে। শান্তভাবে সে আমার কথা শুনতে ও বুঝতে পারছে, প্রেম বিবাহ দেহের মিলন ইত্যাদি সম্পর্কে তার বাস্তব জ্ঞান কিছুটা বেড়েছে। অপরিণত মন কল্পলোক থেকে বাস্তবজগতে বিচরণের উপযুক্ত হয়ে উঠছে। বিক্রমের অসুখের কথা ও তার আগের ইতিহাস ধীরভাবে শুনল এবং মনে হল বিশ্বাসও করল। বিক্রমের 'মাইসোফোবিয়া' সারবে কিনা জানতে চাইল। আমি উত্তরে জানালাম, তারা দুজনে যদি পরস্পরকে ঠিক মত বুঝতে পারে ও অন্তত কিছুটা বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে তবে দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

১৪

নারীত্বের মূল্যবোধ

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি
নৈনং দহতি পাবকঃ'

—মন অশুচি হলে সারা দেহটাই অশুচি হয়ে যায়, কিন্তু দেহ অশুচি হলেই মন অশুচি হবে—এমন কোনো কথা নেই। আর আত্মা? আত্মা তো দেহ মনের অতীত—পরমাত্মায় লীন হবার জন্যে উদগ্রীব আত্মার বিনাশ নেই। পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, ভালমন্দ শুধু এই দেহ ঘিরে—তাই না? আপনি তো অনেক কিছু জানেন? বলুন না। অশুচি দেহ নিয়ে ঠাকুরকে ডাকা যায় না, ঠাকুরের পুজো দেওয়া যায় না। ঠাকুরকে না ডেকে, ঠাকুরকে না খেতে দিয়ে আমার তো খাবার উপায় নেই। অশুচি দেহের খাঁচা থেকে আত্মাকে মুক্তি দেওয়া পাপ নয়। তাই নয় কি?—এই বলে আয়ত চোখ তুলে দেবলা আমার মুখের দিকে তাকাল।

তিরিশ বছরের মেয়ে দেবলা প্রায় চারদিন কিছু না খেয়ে আছে। তার দিদি ভগ্নীপতি অনেক সাধ্যসাধনা করে তাকে জল ছাড়া আর কিছু খাওয়াতে পারেন নি। কয়েকদিন ধরেই দেবলার ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল ওরা। কিন্তু সেটা এমন কিছু বড় দরের নয়। দেবলার স্বামী বিজয়েশ কয়েক সপ্তাহ হল দিল্লীতে। অনেকদিন বেকার থাকার পর নতুন চাকরী পেয়ে বিজয়েশ দিল্লী গেল। অনেকদিন পরে অবস্থার বদল হতে চলেছে। নতুন উৎসাহ, নতুন আনন্দ নিয়ে দেবলা কাজকর্ম করবে—সকলে এই আশা করছিল। কিন্তু দেখা গেল, দূরসম্পর্কের দেবরের আমদানি রপ্তানি সংস্থায় মোটা মাইনেতে স্বামীর নিয়োগের পর থেকেই দেবলার ভাবান্তর ঘটেছে। প্রায় সব সময়েই কি যেন ভাবছে, দুতিনবার না ডাকলে সাড়া দেয় না, কাজকর্মে মন বসে না। গত কয়েক দিন হল তার নিত্যকর্ম গৃহদেবতার সেবা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে, নিজেও অন্ন বর্জন করেছে। তার খুড়তুতো দিদি ইরা ও তার স্বামী নিখিল বিদেশে থাকে, ছুটিতে কলকাতায় এসে একটা হোটেলে উঠেছে। প্রায় বছর পনেরোর পর বোনের সঙ্গে দেখা হতেই তার মনে হয়েছে দেবলা যেন অন্য জগতের মানুষ। গীতা ভাগবত পড়া এবং গৃহদেবতার পূজো আরাধনা ছাড়া আর সব কিছুতেই তার অনীহা। দুই বোনের মধ্যে এক বছর কোনো যোগাযোগ ছিল না। ইরা বিদেশে থাকতে শুনেছে বিপত্নীক জ্যাঠামশায় দেবলাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে

সন্ন্যাস নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। এর বেশি আর কোনো খবর ইরা জানত না। কলকাতায় এসে চেনাজানা সবার সঙ্গে দেখা করার কর্তব্য সারতে গিয়ে অনেক খুঁজে নারকেলডাঙ্গার এক বস্তীর পাশে জীর্ণ এক চুনবালিখসা বাড়ীর একটা ঘরে দেবলাকে আবিষ্কার করে। মাত্র কয়েক দিন আগে বিজয়েশ নতুন চাকরী নিয়ে দিল্লী গেছে। সে ফিরে এলেই ওরা নিউ আলিপুরের একটা আধুনিক ফ্ল্যাটে উঠে যাবে। বিজয়েশের দূরসম্পর্কের ভাই রঞ্জন সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। বর্তমানে বস্তির এক বৃদ্ধা দেবলার বাইরের কাজকর্ম করে দিচ্ছে। প্রত্যেক দিন রঞ্জন এসে খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছে।

গতকাল দেখা করতে গিয়ে ইরা জানতে পারে যে চারদিন ধরে দেবলা উনুন ধরায়নি, দাঁতে কিছু কাটেনি। ওর কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে, অস্বাভাবিকতার গন্ধ পেয়ে ওরা ওখানেই রাত কাটায়। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ওকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। তারপর প্রায় জোরজবরদস্তি করে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। ইরা সমাজবিদ্যা নিয়ে চর্চা করে, ওর দু'চারটে লেখা আমার পড়া ছিল, পত্রযোগে পরিচয়ও ঘটেছিল। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ইরা বোনকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল।

দেবলার প্রশ্নের জবাবে বললাম: আত্মহত্যা গর্হিত পাপ। তুমি নাকি অনেক ধর্মশাস্ত্র পড়েছ: কোথাও কি আত্মহত্যার অনুমোদন আছে?

—আত্মহত্যা করতে যাব কেন? উপোষ করে পাপ দূর করছি। আজকাল ডাক্তাররাও বলেন উপোষ করলে অনেক অসুখ সেরে যায়। আপনি নিশ্চয়ই সে কথা জানেন।

—ডাক্তারের নির্দেশে উপোষ করলে তোমাকে আমরা বাধা দিতাম না। কিন্তু তুমি তো নিজের খেয়ালে উপোষ করছ; আর এইতো একটু আগেই বললে, অশুচি দেহের খাঁচা থেকে আত্মাকে মুক্তি দেবার জন্য তুমি না খেয়ে থাকার পণ করেছ। নিজের দেহকে অশুচি ভাবছ কেন?

—শুধু দেহ নয় মনটাও অশুচি হয়ে গেছে। তাইতো আত্মশুদ্ধি করছি। যিনি ডাক্তারের ডাক্তার আমার সেই ঠাকুর আমাকে উপোষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বলে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে গীতা আওড়াতে লাগল—ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং / ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো / ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

ইংরেজীতে ইরাকে জানালাম যে আমার কিছু করবার নেই। এখনই হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে পাঠাবার ব্যবস্থা করা দরকার। ইরা আমাকে ওর ছোটবেলার কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিল যে দেবলা ইংরেজী জানে না। ওর বাবা ওকে ইস্কুলে পাঠাননি, ইংরেজী শেখাননি; শুধু বাড়ীতে রেখে নিজে বাংলা ও

সংস্কৃত শিখিয়েছেন। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের বিশেষ কারণ ছিল। ইরার কাছে যা জেনেছিলাম তা পরে বলছি।

হঠাৎ শ্লোক আওড়ানো বন্ধ করে দেবলা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চোখে মুখে উৎকণ্ঠাফুটিয়ে বলে উঠল : আমাকে এখুনি যেতে হবে, এতক্ষণে বোধহয় দীনুদা এসে গেছে, গোপাল আমার চারদিন না খেয়ে রয়েছে। দীনুদা নিশ্চয়ই বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।

কথাগুলোর মানে ঠিকমত বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইরার দিকে তাকাতে ও বুঝিয়ে দিল। দীনুদা পাশের বস্তিতে থাকে, যে মেয়েটি দেবলার বাজারহাট করে, তার স্বামী, আর 'গোপাল' ওর গৃহদেবতা। ইরা দেবলার কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করল।

—সে ব্যবস্থা আমি তো করে এসেছি। দীনুদা পুরুতমশাইকে নিয়ে আসবেন, তিনি তোমার গোপালের সেবার ভার নিতে রাজী হয়েছেন। এতক্ষণে হয়তো তোমার গোপালকে নিয়ে তিনি নিজের মন্দিরে চলে গেছেন।

আরো বেশী অস্থির হয়ে উঠল দেবলা। সে তখুনি ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল। শুধু গোপালকে নিলেই তো হবে না ; তার কাপড়-চোপড়, গয়না-পত্তর ওকে বের করে দিতে হবে। শীত আসছে। গরম কাপড় গায়ে না দিলে গোপালের কী কষ্ট হয়—তা পুরুতমশাই জানবেন কি করে ? তাছাড়া কখন গোপাল কী খাবে, কি চাইবে, সব তো পুরুতমশাইকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। গোপাল তো অন্যের কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইবে না।

—সে ব্যবস্থাও করে এসেছি। আমরা ফিরে না গেলে পুরুতমশাই গোপালকে নিয়ে যাবেন না। তোমার কোনো চিন্তা নেই। স্থির হয়ে বসে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বল। উনি তোমার অনেক কথার জবাব দিতে পারবেন —যা আমরা পারিনি। তারপর তোমার জামাইবাবু গাড়ী নিয়ে এলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

আমার নির্দেশমত নিখিল তখন পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোনে একটা নার্সিং হোমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিল। দিদির কথায় বোধহয় দেবলা একটু আশ্বস্ত হল। শান্ত হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল : খুব বড় দরের পাপ না করলে আত্মার সদগতি হয় না। তাই না ? আমার স্বামী দিল্লী থেকে তাই লিখেছেন। অনেক কিছু লিখেছেন। দিল্লীটা তরাইয়ের জঙ্গল। বাঘ ভল্লুকরা সব লড়াই করছে। সবাই পাপচক্রের এজেন্ট। আমরা রেসের ঘোড়া, রঞ্জনরা জকি। আরো লিখেছেন, তাঁকে আমাকে এগিয়ে চলতে হবে, আরো জোরে ছুটতে হবে, ঐ রঞ্জনদের সওয়ার করে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে হবে। এ যুগের অন্য সকলের মত আমাদেরও আরো চাইতে হবে, আরো পেতে হবে। থেমে থাকলে চলবে না। সব কথা আমার মনে পড়ছে

না! ওঁর বন্ধু কৃষ্ণমূর্তি লাইসেন্স পারমিটের ব্যবসা করেন। তিনি নাকি সুন্দর সুন্দর অনেক কথা বলেছেন। সেসব কথা আমি বুঝি না, আমার গোপালও বোঝে না। রঞ্জনের কথা তবু বোঝা যায়, কৃষ্ণমূর্তি একেবারে দুর্বোধ্য ঃ শুনবেন?

এ-সব ক্ষেত্রে সব চিকিৎসকের যা করতে হয়, আমাকেও তাই করতে হল। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। হাত-ব্যাগ থেকে একটা দলাপাকানো চিঠি বের করে দেবলা পড়ে চলল।

—আমলাধানী, রাজধানী—ইত্যাদি অনেক কিছু নাম আছে দিল্লীর। আমার মনে হচ্ছে দিল্লা কাশী মক্কা জেরুসালেমের মত এক মহান তীর্থক্ষেত্র।··· তীর্থক্ষেত্রে পাপ খণ্ডাতে মানুষ সব থেকে প্রিয় জিনিসটি উৎসর্গ করে, এখানেও তাই চলেছে। অনেক পাপ করার পর আমলা ঠিকাদাররা নিজেদের স্ত্রীকন্যা উৎসর্গ করেছেন। আমাকেও করতে হবে, তারপর আমার পাপের জন্য আমার সব থেকে প্রিয় জিনিসটি উৎসর্গ করতে হবে। কৃষ্ণমূর্তি বলল, হ্যাঁ পাপ। কিন্তু এ পাপ তো আমরা করছি না। আমরা তো এজেন্ট, রবার ষ্ট্যাম্প। আর বলল, সব থেকে দামী জিনিস বলি না দিলে মোক্ষলাভ হয় না।

চিঠির অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করলাম। দীর্ঘ চিঠি পড়ার পর হঠাৎ ওর চোখদুটো সজল হয়ে উঠল। চোখ বন্ধ করে নিজের মনে বলতে লাগল: আমার দেহে বাইরের ময়লা লেগেছে, আমার দেহ অপবিত্র। কিন্তু অন্তরের শুচিতা তো নষ্ট হয়নি। তবে কেন তোমাকে ছুঁতে পারছি না, গোপাল? তোমাকে খাওয়াতে পারছি না, নাওয়াতে পারছি না, তোমার আরতি করতে পারছি না। না, আমার মনেও বোধহয় পাপ ঢুকেছে। এরপর আবার উঠে বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত হল। আবার ইরা বুঝিয়ে শুঝিয়ে চেয়ারে বসাল।

নিখিল ঘরে ঢুকে ইংরেজীতে জানাল যে আজ সন্ধ্যায় একটা বেড খালি হবে, কাল ওরা ভরতি করে নেবে বলেছে।

চোখ মেলে ইরার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে তোমরা হাসপাতালে পাঠাচ্ছ। ভেবেছ, তারা আমাকে খাওয়াতে পারবে। আমার গোপালের খাওয়া হয়েছে না জানলে কেউই আমাকে খাওয়াতে পারবে না।

—হাসপাতালে যেতে হবে কেন? যত সব আজগুবি কল্পনা।

—দুচারটে ইংরেজী কথা আমি বুঝি ইরাদি। তোমরা আমাকে হাসপাতাল কি নার্সিং হোমে পাঠাবে। আমি তোমাদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছি।

আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল: তুমি যদি খাওয়াদাওয়া কর—অন্তত শরবত, কমলালেবু কিছুটা মুখে দাও তবে আর কোথাও পাঠাতে হবে না।

—গোপালের পেটে কিছু না পড়লে আমার খাওয়ার উপায় নেই।

গোপালের ভোগ দেওয়া হবে, আরতি হবে, ঠাকুর জানবেন যে আমার মনে ময়লা লাগেনি, তবে আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে। তার আগে জোর করে আমাকে কিছু খাওয়ালে কোন ফল হবে না, সব খাবার বমি হয়ে যাবে। আমাকে তোমরা খাওয়াতেও পারবে না, হাসপাতালেও পাঠাতে পারবে না। বুঝলে ইরাদি।

—বেশ, তাই হবে। এখন বাড়ী চল। গাড়ী এসে গেছে। কেউ জোর জবরদস্তি করবে না। ইরার কাঁধে দেহের ভার রেখে ধীরে ধীরে দেবলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাত্তিরটা ওর ওপর বিশেষ নজর রাখা দরকার—এই কথাটা ইরাকে বারবার বুঝিয়ে দিলাম।

শেষের কথা বলার আগে রোগিনীর পারিবারিক ইতিহাস কিছু জানাচ্ছি। এ ইতিহাসের কিছুটা ইরার জানা ছিল, আর বিজয়েশের কথা ইরা বিজয়েশের পিতৃবন্ধু ডাক্তার পালের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল।

দেবলার পিতা এক কলেজে সংস্কৃত পড়াতেন। ছোট ভাই ইরার বাবা ছিলেন সরকারী আমলা। দেবলার দিদি দেবযানীর বিয়ে নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মতান্তর ঘটে, সেই থেকে তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে বাস করতে থাকেন। ইরার বয়স তখন সতেরো; কলেজে পড়ছে, আর দেবলা বছর আটেকের মেয়ে। দেবযানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী এক আহমেদকে বিয়ে করতে চায়। বাবা মত দিলেন না। বাবার অমতে বিয়ে করে দুজনে বিদেশে চলে যায়। দেবযানী ও দেবলা দুই বোনই ছিল অপরূপ সুন্দরী, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেবলার মায়ের মৃত্যু হয়। দেবলার বাবা তাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বাড়ীতে শিক্ষা দিতে লাগলেন। সংস্কৃত, কাব্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে যেন তার আগ্রহ না জন্মায়, এদিকে কড়া নজর রাখলেন। নিজের সব ইংরেজী বই একঘরে আলমারী বন্দী করে ঘরটায় তালাচাবি দিলেন। কয়েক বছর পরে খবর পাওয়া গেল দেবযানী আহমেদকে ত্যাগ করে একটি ফরাসী ছেলেকে বিয়ে করেছে। মাসখানেকের মধ্যে!

দেবলাকে বিজয়েশের হাতে তুলে দিয়ে বিষয় সম্পত্তি কোন এক মঠের নামে উইল করে প্রায় এক বস্ত্রে বাবা তীর্থ ভ্রমণে বেরুলেন। সেই থেকে তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। এর পরের খবর ইরা জেনেছে ডাঃ পালের কাছে। বিজয়েশের বাবা-মা তার বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই মারা যান। আদর্শবাদী বিজয়েশ পিতৃসম্পত্তি ও শ্বশুরের দেওয়া টাকায় নদীয়া জেলায় কিছু জমি কিনে ক্ষেত মজুরদের অংশীদার করে নতুন পদ্ধতিতে চাষবাস ও হাঁসমুরগী পালন আরম্ভ করে। তিন বছরের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে স্কুল মাষ্টারী করতে থাকে। সেখানে তার আদর্শের সঙ্গে প্রবীণ শিক্ষকের আদর্শের সংঘাত বাধে, ফলে চাকরী ছাড়তে হয়। এরপর স্ত্রীর গয়নাগাঁটি বেচে নিজে একটা

আদর্শ শিশু-বিদ্যালয় খোলে। শিশুদের অভিভাবকরা কিছুতেই তার আদর্শ পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য বুঝে উঠতে না পারায় ছাত্রাভাবে স্কুল উঠে যায়।

কয়েক বছর চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কোনোমতে বেঁচে থাকে। এমনি সময় কালীঘাটে দূর সম্পর্কের এক ভাই রঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রথম দর্শনেই রঞ্জন বৌদি দেবলার একান্ত ভক্ত ও বিজয়েশের অকৃত্রিম সুহৃদ হয়ে ওঠে। দুঃখ কষ্ট-দারিদ্র্যে দেবলার রূপলাবণ্য বিশেষ ম্লান হয়নি। নিঃসন্তান দেবলার যৌবনশ্রী রঞ্জনকে আকৃষ্ট করেছে—দেবলা বুঝতে পারে। রঞ্জনের ফার্মে চাকরী নেবার কথা উঠলে স্বামীর উৎসাহে সাড়া দিতে পারেনি। আদর্শবাদী বিজয়েশ কয়েকদিন নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে পরে রঞ্জনের কাছে আত্মসমর্পণ করল। দারিদ্র্য, দৈন্য, বিশেষ করে দেবলার দুঃখ-কষ্ট তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিজয়েশ বুঝতে পেরেছিল আমদানি-রপ্তানী ফার্মের সাইনবোর্ডের আড়ালে রঞ্জন নানা ধরনের কালো টাকার কারবার চালায়। সেই কারবারের দেবতার পূজার নৈবেদ্যে সুন্দরী নারী অতি-প্রয়োজনীয় উপচার। রঞ্জন দেবলার দেহ তার ফার্মের কাজে নিয়োগ করতে পারে—এ ভয় স্বামী স্ত্রী দু'জনের মনেই জেগেছিল। কিন্তু দুজনেই দুজনের মনের কথা মনে চেপে রেখেছিল, একে অপরকে জানায় নি। বিজয়েশকে দিল্লী পাঠিয়ে রঞ্জন একরকম খোলাখুলিই তার মতলব প্রকাশ করল।

এই অংশ দেবলার অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে বুঝতে পেরে ইরা আমাকে জানায়। এ ছাড়া ডাক্তার পাল বলেন যে, সন্তান না হবার কারণ অনুসন্ধানের ফলে বোঝা যায় যে বিজয়েশই এর জন্য দায়ী, দেবলার দিক থেকে কোনো ত্রুটি নেই। এ খবর খুব সম্ভব দেবলা জানত না। তার অন্তরের বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি ঘটেছিল বালগোপালের মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে।

রঞ্জনের আবেদন-নিবেদনে অস্থির অতিষ্ঠ উদভ্রান্ত দেবলা দিল্লীতে স্বামীর কাছে খোলাখুলি কিছু জানাতে সাহস পেল না। রঞ্জন শক্তিশালী, রঞ্জন মরিয়া হয়ে বিজয়েশকে পোকার মত টিপে মারতে ইতস্তত করবে না। মদের ঘোরে রঞ্জনের বেপরোয়া কথাবার্তা থেকে ও বুঝতে পারে বিদেশী কোনো এক বিশেষ গুপ্তচর চক্রের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। একদিন রঞ্জনের দৃঢ় আলিঙ্গন পাশ থেকে কোনমতে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় যে তার গোপালকে অন্য কোথাও রাখার বন্দোবস্ত করে সে রঞ্জনের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করবে, গোপালের সামনে—ছিঃ। গোপাল যে ওর সন্তান। সেইদিন থেকে ওর খাওয়া বন্ধ হয়েছে আর মনোবিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

এ-সব কথা পরে জানা যায় ইরার হোটেলের ঠিকানায় লেখা দেবলার একখানা চিঠি থেকে।

শেষ অংশ ইরার:মুখে শুনুন।

—আপনার এখান থেকে যাবার পর দেবলা দীনুদার পুরুতমশায়ের হাতে গোপালকে সমর্পণ করল সঙ্গে গোপালের জন্যে ওর নিজের হাতে তৈরী জামা কাপড় মালা গয়না।

পুরুতমশাইকে বারবার বুঝিয়ে দিল কোন পার্বণে কি ভোগ দিতে হবে কোন তিথিতে কোন ফুলের মালা দিতে হবে, কোন ভজনটি শুনতে গোপাল সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তারপর ওকে অনেকটা শান্ত মনে হল। আমার নামে একটা চিঠি পাঠিয়েছে জানাল। আপনার দেওয়া ঘুমের ওষুধটা খেতে আপত্তি জানাল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। দু'চারবার ডাকতেও সাড়া দিল না। গায়ে নাড়া দিয়ে মনে হল গভীরভাবে ঘুমুচ্ছে। আমরা আলো নিভিয়ে, দরোজায় তালা লাগিয়ে দীনুদাকে দরোজায় পাহারা রেখে কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে যা কিছু হোক দুটো পেটে দেবার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লাম। রাত বেশি হয়েছিল, ও দিকটায় দোকান-পাটও কম। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে আমাদের ফিরে আসতে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক লেগেছিল। ফিরে এসে দীনুদাকে বাড়ী পাঠিয়ে সন্তর্পণে দরোজা খুলে দেখি দেবলা তখনও ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আমরা মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোধহয় একটা ইঁদুরের কামড়ে তন্দ্রাটা চট করে ভেঙে গেল। আলোর সুইচ টিপলাম। দেবলার দিকে নজর পড়তে মনে হল ওর মুখ দিয়ে যেন লালা পড়ছে। ওকে নাড়া দিতেই সব বুঝতে পারলাম।

—বিষ কোথায় পেল ?

—বাড়ীতেই ছিল। ফলিডল। হাতের মুঠোতে একটুকরো কাগজ পেলাম। তাতে লেখা ছিল :

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক :।
নঃ চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

আমার মনে হয় ডাক্তারবাবু, বিজয়েশের চিঠিটা না পেলে হয়তো ও এইভাবে মরত না! চার্মিং রোগ ঐ রঞ্জনকে ও ঠিক ঠেকিয়ে রাখতে পারত। চিঠিটাতে স্বামীর পরোক্ষ সম্মতির ইংগিত আছে মনে করেছিল দেবলা।

১৫

বিষণ্ণতা : ১

"But hail thou goddess sage
and holy,
Hail, divinest Melancholy"
—Milton

মিসেস হাজারী বিষণ্ণতা রোগে ভুগছেন। বছর তিনেক ধরে তিনি কোনো কাজকর্মে মন বসাতে পারছেন না। গৃহস্থালীর কাজ ভাল লাগে না, বই পড়তে ভাল লাগে না, রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে না, গল্প করতে বা শুনতে আগ্রহ নেই। অনেক রাত অবধি জেগে থাকেন, সকালে বিছানা থেকে উঠতে চান না, সবরকম খাদ্যে অরুচি, সব ব্যাপারে অনীহা। এখন তাঁর বয়স ৪৮। ডাক্তাররা বলেছেন, এসব রজঃরোধের (মেনোপোজ) আনুষঙ্গিক উপসর্গ ; এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই ; কিছুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। ট্রাংকুলাইজার, ভিটামিন, আয়রন টনিক অনেক খেয়েছেন। ওষুধ খেতেও আর ভাল লাগে না। ছোট মেয়েটির বিয়ের পর থেকে বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু উপসর্গও দেখা দিয়েছিল আরো বছর সাতেক আগে, সেই সময় তাঁরা আলাদা বাড়ী করে কলকাতার বাসা ছেড়ে গড়িয়াতে উঠে যান। বড় মেয়ের বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে অসুখটা বেশ কিছুটা বাড়ে। কলকাতায় বাসায় হাজারীরা তিন ভাই একত্র থাকতেন। বড় ভাই সওদাগরী অফিসে চাকরী করেন, ছোট ভাই শিক্ষকতা করেন, আর মেজ ভাই শ্যামলবাবু একজন করিৎকর্মা ঠিকাদার। লেখাপড়া তিন ভাই-এর মধ্যে সব থেকে কম শিখলেও রোজ-গারের দিক থেকে শ্যামলবাবু সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রধানত তাঁর রোজ-গারেই সংসার চলত। বড় ভাই অফিস আর ক্লাব নিয়ে থাকতেন, ছোট ভাই-এর কাজ ছিল বাজার করা আর সংসারের কখন কি দরকার তার খোঁজ রাখা ও জোগান দেওয়া। শ্যামলবাবুর কাজ ছিল ছোট ভাই-এর চাহিদামত টাকা দিয়ে যাওয়া। এইরকম করে মিসেস কমলা হাজারীর বিয়ের পর আঠারো-উনিশ বছর পর্যন্ত যৌথ পরিবার বেশ ভালভাবেই চলছিল। কোনো ঝগড়াঝাঁটি মতবিরোধ দেখা যায়নি। মেজবৌ কমলা অন্দরমহলের কর্ত্রী ছিলেন, তাঁরই নির্দেশে ও ব্যবস্থাপনায় সংসার চলত। বড়বৌ চিররুগ্ন, হাঁড়িহেঁসেলের দিকে ঘেঁষতেন না। ছোট ভাই বিয়ে করেনি, বাড়ীর কাজ আর মাস্টারী টিউশানী

নিয়েই তার দিন কেটে যায়। মায়ের অনুরোধ উপরোধে হেসে বলত যে তার পুষ্যি বাড়ানোর মত ক্ষমতা নেই। বড ভাইয়ের চারটি ছেলে ও মেজর তিনটি মেয়ে নিয়ে প্রায় ১০।১২ জনের সংসারে সব ঝক্কি সামলাতেন মেজবৌ। সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকত না। কিন্তু তার জন্যে তাঁকে কোনোদিন অনুযোগ করতে কেউ শোনেনি। কাজের চাপের মধ্যেও নিজের শরীরের যত্ন নিতে তাঁর ভুল হত না। নিয়মিত প্রসাধন করতেন। দেহশ্রী বজায় রাখতে ছোটবেলায় শেখা যোগব্যায়াম রোজই অভ্যাস করতেন। স্বাস্থ্যশ্রীতে তাঁর দেহ ঝলমল করত, তৃপ্তির হাসি তাঁর মুখে সব সময়েই লেগে থাকত।

আজকে ওকে দেখে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে সাত বছর আগে ও কেমন ছিল! ওর সে সময়কার ফটো দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে না যে সেটা ওরই ফটো। আমার সময় খুবই কম; বাড়ীতে রাত এগারোটার আগে ফিরতে পারি না, ভোরবেলায় ওর বিছানা থেকে ওঠার আগেই বেরিয়ে যেতে হয়। ওর দিকে ভাল করে তাকাবার সুযোগ আমার কম হয়। কিন্তু যখনই তাকাই চমকে উঠি। আমারই মনে হয় যেন অন্য কোনো মেয়েকে কমলা মনে করছি।

এই বলে শ্যামল হাজারী তাঁর প্রাথমিক বক্তব্য শেষ করলেন।

—নিজের বাড়ীতে উঠে আসার পর থেকেই ওঁর পরিবর্তন শুরু হয়েছে তাই না? এই ব্যাপারে ওঁর কি অমত ছিল?

—না, একেবারেই না। আমিই বরং নানা অজুহাতে দিন পেছিয়ে দিচ্ছিলাম। ওইতো একরকম নিজেই সব ব্যবস্থা করে চলে এসেছিল। মায়ের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে পুরনো বাসা ছাডবার ইচ্ছে আমার ছিল না। তিন মাস যেতে না যেতেই ওর এই চলে আসাটা কেউই ভাল চোখে দেখেনি। আত্মীয়স্বজন মহলে এ নিয়ে আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। না—আমার দাদা বৌদি কিছু বলেননি, কোনো কিছুতে প্রতিবাদ জানাবার মত মানুষ তাঁরা নন। তবে ছোট ভাই আর বাচ্চাগুলো নানারকম বাধার সৃষ্টি করেছিল; তাই ছোট ভাই তো রাগ করে আগের কয়েকদিন বাড়ীতে আসা বন্ধ করেছিল। কমলার সংকল্প থেকে তাকে কেউ টলাতে পারেনি।

—মায়ের মৃত্যুর পর কি জায়ে জায়ে বনিবনাও হচ্ছিল না?

—মনে তো হয় না; তাহলে নিশ্চয়ই আমার কানে আসত। বৌদিতো সংসারের কোনো কিছুতেই থাকতেন না, দাদা তাঁর থিয়েটারের দল নিয়ে ব্যস্ত, অন্য কোনো কিছুতেই নজর দেবার সময় নেই, ছোট ভাই তো যাকে বলে সেই —দেবর লক্ষ্মণ। সংসারে সব ব্যাপারে ওর মতামতই চিরকাল বহাল থেকেছে। বনিবনাও না হবার কোনো কারণ ঘটেছিল বলে মনে হয় না।

—তবে উনি অত উতলা হয়ে উঠলেন কেন?

—সে একমাত্র উনিই বলতে পারেন। ওঁর মনের খবর আমার জানা নেই। মজুর-মিস্ত্রী আর কনট্রাকট-দেনেওয়ালা বড়কর্তাদের মনের খবর রাখতে আর মন জুগিয়ে চলতেই আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি ওঁর মন কেন জগতের আর, কোনো কিছুর খবরই রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি যে ও-বাড়ীর কারুর সঙ্গে ওর ঝগড়াঝাঁটি ও করতেই জানে না। কি বললেন? না তাঁদের আর্থিক কোনো অসুবিধে ঘটেনি। বাড়ী আমার নামে ভাড়া নেওয়া, বাড়ীভাড়া ইলেকট্রিক বিল আগের মত আমিই দিয়ে যাচ্ছি, দাদার বড় ছেলেটাকে কাজ শিখিয়ে চার আনার অংশীদার করে নিয়েছি, রান্নাবান্না কাজের ভার অনেকদিন ধরেই একটি আশ্রিতা মহিলার ওপর ছিল, এখনও আছে। দাদার ছেলেরা সব বড় হয়ে গেছে, তাদের দেখাশোনার দায়-দায়িত্ব নেই। মায়ের অসুখের সময় তাঁর সেবা করতে আমার বিধবা এক মাসী এসেছিলেন। তিনিই কমলার পোষ্টে বহাল হয়েছেন। বৌদির অসুখের জোয়ার-ভাঁটা খেলে না। যখন বড়দরের কোনো কাজকর্মের জন্য বাড়তি টাকা-পয়সার দরকার হয় কমলাই আমাকে তাগিদ দিয়ে আদায় করে ও বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। না অন্য কোনো দিক দিয়ে এখন আর কারুর কোনো অভিযোগ নেই। ছোট ভাই-এর সঙ্গেও কোনো গোলমাল নেই। হ্যাঁ সে মাঝে মাঝেই আমার গড়িয়ার বাড়ীতে আসে। সবই ঠিক আছে, বদলেছে শুধু কমলা। ছোট ভাইয়েরই তাগিদে আমি আপনার কাছে এসেছি। তার মতে এটা অন্য কোন রোগ। রজঃরোধের উপসর্গ হলে এতদিন ধরে চলবে কেন? আপনার কি মনে হয়? সারবে তো? ওকে এইবার আপনি জিজ্ঞাসা করুন কেন ও সব সময় মুখ ভার করে থাকে? বল, ডাক্তারবাবুর কাছে সব খুলে বল। আমি থাকব না যাব? আমি বরং বাইরেই বসছি। তোমার যা বলবার তুমি একান্তেই বল। —স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শেষের কথাগুলো বলে শ্যামলবাবু বেরিয়ে গেলেন।

মুখ তুললেন মিসেস হাজারী। বড় বড় চোখ দুটোতে বিষাদের ছায়া; মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো, ফ্যানের হাওয়ায় সামনের দু-একগাছা চুল উড়ে এসে মাঝে মাঝে কপালে পড়ছে। কালো রঙের শাড়ীর অগোছাল আঁচলটা সামনে নিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামালেন। চোখের পাতা-গুলো বেশ বড়, চোখ নামাতে মনে হল যেন চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছেন। ভাল করে মহিলার দিকে তাকিয়ে মনে হল বুঝি এই রকম কোনো মূর্তি দেখেই মিলটন লিখেছিলেন, কাম পেনসিভ, নান ডিভাউট এ্যাণ্ড পিওর। সত্যিই ধ্যানমগ্না সন্ন্যাসিনীর মত দেখতে। এক শুচিস্নিগ্ধ পবিত্র মূর্তি। মনে হল না এই মহিলার জীবনে কোনো সমস্যা আছে আর যদিও থাকে তবে সে সমস্যার

সমাধান আমাদের মত চিকিৎসকের সাধ্যের বাইরে। কি কথা দিয়ে আলাপ শুরু করব কিছুতেই ভেবে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে মিসেস হাজারীই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। ধীরে ধীরে গম্ভীর গলায় বললেন :

—আমি তো অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই মনে আনন্দ আনতে পারছি না। কিছুতেই কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না। বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলে মনে হয় পা দুটো এত ভারী যে আমি নাড়তেই পারব না, হাত তুলতে গেলে মনে হয় যে হাত দুটো যেন আমার নয়। আমার দেহটা যেন শিসে দিয়ে তৈরী। কথা বলতে কষ্ট হয়, বুকের ভেতরটা ফাঁকা অথচ মাথাটা ভারী। কী আমার দুঃখ কী আমি চাই—আমিই জানি না। মনে হয় আমার ওপর যে দায়িত্বভার ছিল যে তা আমি পালন করতে পারিনি। আমি বোধ হয় কোনো অন্যায় করেছি, ঘোরতর অন্যায়। তাই শাস্তি পাচ্ছি। আমাকে এমন কোনো ওষুধ দিন যাতে আমি কথা বলতে পারি। আমার দেহের সব রক্ত জমে গেছে, তাই বোধ হয় দেহে কোনো সাড় নেই, আমার স্নায়ুগুলো সব শুকিয়ে গেছে—তাই নড়াচড়া করতে গেলে কষ্ট হয়। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আর কিছু বলতে পারছি না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন আমার এই অবস্থার জন্যে আমি দায়ী আর কেউ নয়। আমি বোধহয় আর ভাল হব না, বোধহয় ভাল হতে চাইও না।

সত্যিই ওঁর কষ্ট হচ্ছিল। আমি ওঁকে শবাসনে রিল্যাক্স করার পদ্ধতি শিখিয়ে কিছু ওষুধপত্র দিয়ে সেদিনকার মত বিদায় দিলাম।

পরের দিনই মিসেস হাজারী আবার এলেন। শ্যামলবাবু ছোট ভাইকে বসিয়ে রেখে নিজের কাজে চলে গেলেন। এবার তাঁকে দেখে মনে হল একটু যেন উন্নতি হয়েছে, বোধহয় ওষুধের ফল। কিন্তু ওঁর কথা শুনে আমার ভুল ভাঙল, চমকে উঠলাম।

—আপনার ওষুধে কোনো কাজ হল না। দিনে তিনটে করে খেয়ে কাজ হবে না ভেবে কাল একসঙ্গে সব কটা বড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম। ঘুমতো হলই না সারারাত জেগে রইলাম; গায়ে জ্বালা, মাথায় যন্ত্রণা। সারারাত ছটফট করলাম। অবশ্যি খাওয়ার পরেই বমি হয়ে গেছল, হয়তো বড়িগুলো বমির সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। ওঁদের বাড়ীর ডাক্তারতো তাই বললেন।

শ্যামলবাবুর ছোটভাই—এর দিকে তাকিয়ে বললাম—কী করে উনি ওষুধ পেলেন? আপনার দাদাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম, ওষুধ যেন ওঁর নাগালের মধ্যে না থাকে। তিনি যেন নিয়মিত নিজের হাতে ওঁকে ওষুধ খাওয়ান—আমার প্রেসক্রিপশনেও একথা স্পষ্টভাবে লেখা ছিল।

তিনি কিছু বলার আগেই মিসেস হাজারী বলে উঠলেন: উনি যে ড্রয়ারে ওষুধ রেখেছিলেন তার একটা চাবি আমার কাছে ছিল। ওঁর কোনো দোষ

নেই। তবে একটা উপকার হয়েছে আপনার ওষুধে। আমার বুকের ভারটা কমে গেছে। সারাদেহে অস্থির অস্থির কেমন একটা ভাব দেখা দিয়েছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অনেক কথা বলবার ইচ্ছে। আপনার শোনবার সময় হবে কি? অমল তুমি একটু বাইরে যাবে?

অমল বাইরে যেতেই মিসেস হাজারীর ভাবান্তর ঘটল। তাঁর উৎসাহ নিভে গেল। সোফায় দেহ এলিয়ে চোখ তুলে সিলিং দেখতে লাগলেন।

—কি বলবেন বলুন। আমি প্রস্তুত, সময়ও আমার যথেষ্ট আছে। হ্যাঁ বলুন।

প্রথমটায় কোনো সাড়া দিলেন না কমলা হাজারী। আমার কথা তাঁর কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না। নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন। আবার তাঁকে সম্বোধন করে আগের কথাগুলো উচ্চারণ করলাম। কোনো উত্তর পেলাম না। তারপর তিনি ঐভাবেই আপন মনে বলে যেতে লাগলেন: আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি। ঐতো মঠের সন্ন্যাসিনীরা আমার মৃতদেহটা একটা সৎকার সমিতির গাড়ীতে তুলেছে। গাড়ী চলেছে ওরা আমার শবদাহ করবেন জানি। কিন্তু গঙ্গায় ভাসিয়ে দিচ্ছে না কেন? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। মাথার ওপর অনেকগুলো শকুনি ঘুরপাক খাচ্ছে। ওটাতো ভাগাড়। কেয়াঝোপের মধ্যে কেউটে লুকিয়ে আছে। কেয়া ফুটেছে তাই সাপ এসেছে। শকুনিরা প্রথমে চোখ দুটো তুলে নেবে তারপর বুকের নরম মাংস। না! বুকতো শুকিয়ে গেছে। শকুনিরা খালি চক্রাকারে ঘুরছে। সন্ন্যাসিনীরা কালো আলখাল্লায় মাথা মুখ ঢেকে ফিরে যাচ্ছে। কেয়াফুলটা আমাকে কে এনে দিল? কেউটে নয় গোখরো। ফণা বিস্তার করে শকুনিদের আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাবে। সরাসরি শ্মশানেশ্বরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। শাশুড়ি ঠাকরুনকে আমি মেরে ফেলেছি……

এই অবধি বলে হঠাৎ ওঁর সম্বিত ফিরে এল। ধড়মড় করে উঠে এসে আমার সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন। লক্ষ্য করলাম—আজ ওঁর চুল অবিন্যস্ত ও মুখে যত্নহীন প্রসাধনের চিহ্ন।—ভাবছেন আমি মরতে ভয় পাই? মোটেই না। তবে আমি সুন্দরভাবে মরতে চাই, হাসতে হাসতে মরতে চাই মরে পুড়ে ছাই হতে চাই। সেই ছাই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে চাই। নিজের চিতাভস্ম নিজে ভাসিয়ে দেবার আনন্দ মা কালী আমাকে দেবেন না। আমি যে অনেক পাপ করেছি। —একটু চড়া সুরে কথাগুলো বললেন।

—কি আবার পাপ করলেন? আমি যতদূর জেনেছি আপনি নিষ্পাপ। না কোন পাপ করেননি আপনি।

আবার ভাবান্তর। কণ্ঠস্বরে আর উত্তেজনা নেই। শ্রান্ত ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন:

—আপনি বলেছেন আমি পাপ করিনি! আমার শাশুড়ী আমার জন্যে মরেননি! উনি যে আমাকে বলেছিলেন, উনি যতদিন বেঁচে আছেন আমরা যেন আলাদা বাড়ী না করি। মেজছেলে ওঁর কথা নাও শুনতে পারে তাই ভেবে আমাকে বলেছিলেন। আমি আমার স্বামীকে সেকথা জানাইনি। জানলে স্বামী কিছুতেই বাড়ী করতেন না আর উর্মিরও অমন করে কপাল পুড়ত না।

—উর্মি কে? কি হয়েছে তার?

—উর্মি? আমার বড় মেয়ে উর্মিলা। নতুন বাড়ীতে গিয়েই ওর বিয়ে দিই। খুব ভাল ছেলে খুব ভাল; ইঞ্জিনীয়ার, বিলেতে কাজ করে। ঐ ভাল ছেলের সঙ্গে উর্মির বনিবনাও হল না। সেতো আমার পাপেই। শাশুড়ীর অভিশাপে উর্মির কপাল পুড়েছে। দু-বছরের মধ্যেই স্বামীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বিলেতেই ডাক্তারী করছে উর্মি। কী কষ্টে যে দিন কাটাচ্ছে—আমি ছাড়া কেউ বোঝে না। ওর কথা গোপন করে সুমি, আমার ছোট মেয়ে সুমিতার বিয়ে দিয়েছি। ওরা একদিন সব জেনে যাবে। সেদিন সুমিকে ঠিক বাড়ী থেকে ওরা তাড়িয়ে দেবে। আমারই দোষ। আমি ওদের জ্যাঠা, কাকার সঙ্গে থাকতে দিইনি। তাহলে ওরা এমন হত না এত কষ্ট পেত না। কিন্তু ঐ বাসা না ছেড়েও আমার উপায় ছিল না। শাশুড়ী ঠাকরুণ মরার পর রোজ রাত্রে এসে আমাকে ভয় দেখাতেন। কেন আমি মেজছেলেকে বাড়ী করতে বাধা দিলাম না?

শ্মশানকালীর বেশ ধরে এসে আমাকে ভয় দেখাতেন। আমারতো ইচ্ছে ছিল বাড়ীটা হচ্ছে হোক। বাগান আছে খোলামেলা জায়গা আছে ছুটি-ছাটাতে সবাই মিলে গিয়ে থাকব। বাসা ছাড়বার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। ভয়ে আমাকে পালাতে হল। কোনো লোককে একথা বলিনি, সকলে জানে আমি আরাম চাই বলে আলাদা বাড়ীতে উঠে গেছি। মোটেই না। বরং এখানে এসে কাজ করতে না পেরে ঝক্কিঝামেলা সামাল দেবার দায়িত্ব না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

—ওখানে গিয়ে বুঝি আর ভয়ের স্বপ্ন দেখেন নি।

—প্রথমদিকে দেখিনি। উর্মির কপাল পোড়ার পর থেকে আবার দেখছি। কখনো দেখি উর্মি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, কখনো দেখি উর্মি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করছে, কখনো দেখি মেজমেয়ে কমুকে তার শাশুড়ী বিষ খাইয়েছে। একদিন দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখলাম ঘুষ দেবার অপরাধে আমার স্বামীর ফাঁসির হুকুম হয়েছে।···আমাকে আপনি ভাল করতে পারবেন না। কেউই পারবে না। অসুখ তো নয় পাপ। অসুখ ভাল করা যায়, পাপতো খণ্ডানো যায় না। তবু মরতে ভয় করে। মরলে যমরাজ আমাকে ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দেবে, করাত দিয়ে আমাকে চিরবে। তাই মরতে ভয় করে। আমাকে বরং কোনো মঠে

পাঠিয়ে দিন। সেখানে আমি আতুরের সেবা করব, কুষ্ঠরোগীর পরিচর্যা করব, নিজের খাবার থেকে অর্ধেক রাস্তার ভিখিরীকে খাওয়াব। আমার প্রায়শ্চিত্ত না করে আমি মরতে চাই না। আমি মরবার জন্যে আপনার বড়িগুলো খাইনি তাড়াতাড়ি ভাল হবার জন্য খেয়েছিলাম। আমি একলা থাকতে ভয় পাই। স্বামী দিন-রাত বাইরে বাইরে থাকেন। চাকর-ঝিয়ের ওপর আমার ভরসা নেই, ওরাতো বুঝতে পাবে আমি পাপ করে অনুতাপ করছি। ওরা আমাকে কৃপার চোখে দেখে। আমার একটা উপায় করে দেবেন তো ডাক্তারবাবু? আপনি ছাড়া আমার পাপের কথা কেউ জানে না। কিন্তু আপনার কাছে এত কথা বললাম—তবু তো বুকের ভার নামল না। আবার শরীর ভারী হয়ে আসছে, হাত-পা অবশ হয়েছে, গলার ভেতর কে যেন শিষে ঢেলে দিচ্ছে—বলতে বলতে সহসা থেমে গিয়ে আবার সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে লাগলেন মিসেস হাজারী।

পরে শ্যামলবাবুর কাছে জানলাম বড় মেয়ের ব্যাপার। স্বামী বিলেতে একটি ভিনদেশী মেয়ের সঙ্গে বেশ কিছুদিন একসঙ্গে বাস করছিল। মেয়ে ওখানে গিয়েই বুঝতে পারে বিদেশিনীর সঙ্গে বিয়ে না হলেও তার প্রতিই স্বামীর বেশি আকর্ষণ। তাই বাপ-মাকে জানিয়েই ও আলাদা হয়ে যায়। সে সময় ওর মায়েরও এতে সম্মতি ছিল।

যৌথ পরিবারের ছত্রছায়ায় থাকলে হয়তো কমলার-বিষণ্ণতা রোগ দেখা দিত না। যৌথদায়িত্ববোধ চলে ব্যক্তিগত পাপ-বোধ সহজেই জেগে উঠতে পারে। কমলার এখন প্রথম প্রয়োজন বাড়ীর সকলের সঙ্গে একত্রে থাকা, একথা শ্যামলবাবুকে জানিয়ে দিলাম। তিনি দাদা ও ছোট ভাইকে রাজী করালেন। সকলে একসঙ্গে গড়িয়ায় থাকার ব্যবস্থা হল। কমলার তথাকথিত মেনোপোঁজাল সিনড্রোম রজঃরোধের উপসর্গ ক্রমশ দূর হয়ে যাবে—এই আশ্বাস দিলাম তাঁর স্বামীকে। আর কমলাকে বললাম—তিনি বাড়ীর লোকের সেবার মধ্য দিয়েই শুচি-স্নিগ্ধ পবিত্র হয়ে উঠতে পারবেন।

১৬

বিষণ্ণতা : ২

"There's nought in this life sweet.
If man were wise to see't.
But only Melancholy.
O Sweetest melancholy."···Fletcher

কিছুতেই সত্যকে অফিসে পাঠানো যাচ্ছে না। সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না, ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলেও আবার কিছুক্ষণ শুয়ে বসে কাটায়, তারপর দুপুরের পর থেকে একটু ভাল বোধ করে। এই সময় খাওয়া-দাওয়া করে খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়, বাড়ীর লোকদের দু'একটা কথার জবাব দেয় ওষুধপত্তর খেতে চায়। সন্ধ্যের দিকে মনমেজাজ প্রায় ঠিক হয়ে আসে। কিন্তু আবার রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে অস্বস্তি, কিছুতেই ঘুম আসে না, প্রায় রাত দুটো নাগাদ তন্দ্রা আসে, তন্দ্রার ঘোর কাটতে না কাটতেই সকাল হয়ে যায়। গত চার পাঁচ বছর ধরে বছরে একবার করে এই অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ওষুধপত্রে বিশেষ কাজ হয়নি প্রতিবারই বৈদ্যুতিক শক্ (ই, সি, টি) দিতে হয়েছে। প্রতি বছরই এই অবস্থার জন্য তার প্রায় মাসখানেক করে অফিস কামাই হয়েছে। অন্যবারে চিকিৎসার পর বছরখানেকের মত ভাল থাকত, এবার মাস ছয়েকের মধ্যেই উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন ও বিষাদ রোগে (ডিপ্রেসনে) ভুগছে। এই বিষাদ রোগ কেন হয় ? এ-কি সারবার অসুখ নয় ?

সত্য সেনের বৃদ্ধ পিতা মণিবাবু ছেলের অসুখের বিবরণ শেষ করে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। মণিবাবুকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। দেশ ভাগের পরই পশ্চিমবঙ্গে আসেন। নামকরা একটা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ; এখানে এসে কলকাতার উপকণ্ঠে এক উদ্বাস্তু কলোনীতে একটি স্কুল গড়ে তোলেন। সত্য তখন বছর পাঁচেকের ছেলে। দুটি কিশোরী মেয়ে, সত্য আর স্ত্রী—এই নিয়ে সংসার। মণিবাবুর অনেক কৃতী ছাত্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল। তাদের অর্থ সাহায্যে কয়েক বছরের মধ্যেই মেয়ে দুটিকে পাত্রস্থ করে মণিবাবু স্কুল আর সত্যকে নিয়ে মেতে ওঠেন। তাঁর চেষ্টায় স্কুলটি অনুমোদন লাভ করে এবং ঐ তল্লাটের একটি উচ্চমানের স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই স্কুল থেকে সত্য কৃতিত্বের সঙ্গে যেবার স্কুল ফাইনাল পাশ করল সেবারই উপদলীয় কলহের ফলে মণিবাবুকে স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হল। শুধু তাই নয়

স্কুল-সংক্রান্ত মামলামোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে কোনোমতে সম্মান বজায় রেখে বেরিয়ে আসার পর তিনি মনের অসুখে ভোগেন। সেই সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয়। ভদ্রলোকের নানাবিষয়ে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ আছে সে সময় জেনেছিলাম। তাঁর অসুখের চিকিৎসা প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়েছিল। ছেলের ব্যাপার নিয়ে কেন এতদিন তিনি আমার পরামর্শ নিতে আসেননি জানতে চাইলাম। উত্তরে শুনলাম যে ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি বাতের অসুখে পঙ্গু আর্থিক সঙ্গতি কিছু নেই। ছেলেরও বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না বাপের চেনাজানা চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করার। বাপের ওপর বিশেষ আস্থা নেই। কিন্তু এখন সে শ্বশুরবাড়ীর লোকদেরও আর বিশ্বাস করতে পারছে না। চিকিৎসক বদলে সেই আগ্রহ দেখিয়েছে, তাই মণিবাবুকে অশক্ত দেহ নিয়েও আমার কাছে আসতে হয়েছে।

—ব্যাপারটা আরও বিশদভাবে জানা দরকার, ছেলেকে পরীক্ষা করা দরকার তার সঙ্গে কথাবার্তারও প্রয়োজন আছে। রোগ কেন হয়েছে সারবে কি না—এ সব প্রশ্নের উত্তর তারপর হয়তো দিতে পারব। আবার সব জানার পরও অনেক সময় আমরা রোগের সঠিক কারণ ধরতে পারি না সারবে কিনা ঠিকমত বুঝতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রমানে মস্তিষ্কবিজ্ঞান এখনও অপরিণত।

মণিবাবুর মুখে সত্য সম্পর্কে অনেক কিছু শুনলাম। তার সংক্ষিপ্তসার পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি।

সত্য স্কুল ফাইনালে ভাল রেজাল্ট করে বৃত্তি পেয়ে কলেজে ভর্তি হবার সময়ই মণিবাবু মামলামোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেন। নিজের ঝঞ্ঝাট সামলাতে তিনি এ সময় খুবই ব্যস্ত থাকার দরুন ছেলের পড়াশুনোর ব্যাপারে কোনো নজর দিতে পারেননি।

দারুণ অভাব অনটনের চাপে পড়ে সত্যকে সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পড়ানোর কাজ নিতে হয় এতে তার নিজের পড়াশুনার ক্ষতি হতে থাকে। যে রকম রেজাল্ট আশা করেছিল না হওয়াতে খুব মুষড়ে পড়ে। ওর ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনীয়ার হবে। প্রথম বিভাগেও পাশ করলেও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হবার কোনো চেষ্টা করল না। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ারও খরচ চালাবার ক্ষমতা ওদের নেই ও বুঝতে পেরেছিল। এই সময়ও নাকি সারাদিন ঘরে বসে থাকত, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। বিজ্ঞানে ওর আসক্তি ছিল কিন্তু বিজ্ঞানের লাইন ছেড়ে কমার্স ক্লাসে ভরতি হল। বাপের সঙ্গে এ নিয়ে বেশ কিছু বচসা ও মনো-মালিন্য ঘটে। তবে সে সময় মণিবাবু নিজের মানপ্রতিপত্তি রাখার সংগ্রামে এত ব্যস্ত যে ছেলের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেলেন না। অনেক কষ্টে

মামলার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সত্য তখন কমার্স গ্রাজুয়েট হয়েছে, ফলও বেশ ভাল করেছে। ওদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়, তাই বাধ্য হয়ে সত্যকে চাকরী নিতে হল এবং বাপের চিকিৎসা খরচ চালানোর জন্য মায়ের অনুরোধে বেশ মোটা টাকা পণ নিয়ে বিয়ে করতে হল। এই বিয়েতে ওর একেবারেই মত ছিল না। বিয়ের পর শ্বশুরমশাই ওকে চাকরী ছেড়ে এক বড় অডিটারের ফার্মে শিক্ষানবীশ হতে বললেন। টাকা পয়সার সব দায়িত্ব তিনি নিতে চাইলেন। মণিবাবুর তখন মতামত দেবার মত অবস্থা নয়, তিনি ছেলেকে তার ইচ্ছামত চলার নির্দেশ দিলেন। সত্য শ্বশুরের প্রস্তাবে সাড়া দিল না। স্ত্রীর সঙ্গে ও শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে এর পর ওর সম্পর্ক বেশ তিক্ত হয়ে উঠল। ওর স্ত্রী তার ইচ্ছামত চলাফেরা করত, যখন খুশী বাপের বাড়ী চলে যেত, যখন খুশী আসত। শ্বশুর-শাশুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়েই স্বামীকে তার দুর্বুদ্ধি ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তিরস্কার করত। এ সব কথার জবাব দিত না সত্য। জেদী ও একগুঁয়ে হলেও সত্য খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। মণিবাবুর সঙ্গে সেই কমার্স পড়বার ব্যাপার নিয়ে একবার যা কিছু বাদানুবাদ করেছিল। এইরকমভাবে বছর পাঁচেক চলল। মণিবাবু সুস্থ হয়েছেন, সত্যও চাকরী ও টিউশনি করে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিয়েছে। আগের মত অভাব অশান্তি আর নিত্যসঙ্গী নয়। এমনি সময় একরাতে স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম বচসা করতে শোনা গেল সত্যকে। মা-বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এত উত্তেজিত কণ্ঠে সত্যকে কোনদিন ওঁরা কথা বলতে শোনেননি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজা খুলে সত্য বেরিয়ে এল। কলঘরে গিয়ে মাথায় জল ঢালতে লাগল। ঘরের মধ্যে ওর স্ত্রীর অস্ফুট কান্নার শব্দ শুনলেন মণিবাবু। তার পর দিনই সত্য অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বিষাদ-রোগের এই সূত্রপাতের বিবরণ শোনায় পরদিন সন্ধ্যায় সত্যকে আর তার স্ত্রীকে নিয়ে মণিবাবু আমার কাছে আসেন।

সত্যশরণের স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলেই বুঝলাম মেয়েটি অসহিষ্ণু প্রকৃতির অহঙ্কারী। সেই রাতের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বলল: ও সেদিন আমার গায়ে হাত তুলেছিল। ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কম, কিন্তু ও-যে এরকম অসভ্যের মত ব্যবহার করতে পারে—তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। পরের দিন ও-যদি অসুস্থ হয়ে না পড়ত, তবে আমি ওদের বাড়ীতে কিছুতেই থাকতাম না। শ্বশুর-মশাইকে আমি দোষ দিই না। তিনি ইচ্ছে করে নিজের সর্বনাশ করেননি। ও কিন্তু ইচ্ছে করেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। বাবা ওকে কতরকমভাবে সাহায্য করতে চেয়েছেন ও সাহায্য নেবে না। ওর ধারণা আমার বাবার সাহায্যে কেরিয়ার গড়লে আমার কাছে ও ছোট হয়ে যাবে। কি বোকার মত কথা বলুন তো? সেই রাতে কি হয়েছিল? হ্যাঁ মনে আছে। আমি সেদিন

খবর পাই যে অফিসের ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় ও ফেল করেছে। এই পরীক্ষার কথা আমাকে জানায়নি ওর মা-বাপকেও বলেনি, অফিস সুপার আমার দাদার বন্ধু, তাঁর কাছ থেকে আমরা খবরটা পাই। না, কড়া কথা কিছু বলিনি। শুধু বলেছিলাম যে নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে ওপরে ওঠবার ক্ষমতা যার নেই তার আবার এত অহঙ্কার কিসের? এতেই ও একেবারে ক্ষেপে গেল। রেগে উগ্রমূর্তি ধরল। এর আগে ওকে এত রাগতে কখনো দেখিনি। আমার বাবা ওর উপকার করতেই চেয়েছিলেন; তাঁর সম্পর্কে যা তা বলতে ওর একটুও আটকাল না। আমার বাবা নাকি 'ব্ল্যাক' করে পয়সা করেন, হিসেবের কারচুপি আছে নাকি তাঁর ব্যবসায়! আমি ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নই। তাঁর নামেতো এ পর্যন্ত কোনো জালজুয়াচুরির মামলা হয়নি—হ্যাঁ এই কথা আমি বলেছিলাম। এ তো সত্যি কথা। একশোবার বলব। এই শুনে পাগলের মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলতে ও বোধ হয় খেয়াল ফিরে পেল। দরোজা খুলে বাইরে চলে গেল। তারপর সারারাত বোধ হয় ঘুমোয়নি। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি ওর চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। ও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে; বিড় বিড় করে বলছে আমারই দোষ আমিই অন্যায় করেছি আমার অহঙ্কারের জন্যেই তুমি কষ্ট পাচ্ছ। প্রথম-টায় ভাবলাম বুঝি নিজের ভুল বুঝতে পেরে এতদিন পরে সত্যিই ওঁর অনুশোচনা হয়েছে। কিন্তু চোখমুখের অবস্থা দেখে আমার ভয় হল; আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর মাকে ডেকে আনলাম।

সত্যশরণের স্ত্রী আরো জানাল যে অসুখের সময় সে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ীর অনুগত থাকে, তারা যা বলে সব শোনে ভবিষ্যতে তাদের ব্যবস্থা মত চলবে বলে কথা দেয়। কিন্তু যেই ভাল হয়ে অফিসে যেতে থাকে তখনই আবার অন্য মূর্তি ধারণ করে। সেই আগেকার স্বভাব ফিরে আসে। সেই পুরনো সঙ্কল্প ওর হাবভাবে প্রকাশ পায়। পারে তো নিজের চেষ্টায় বড় হবে! অন্যের সাহায্য নেবে না। নিজের কেরিয়ার গড়বে নিজেই।

এবার সত্যশরণের কথা।

বিষাদক্লিষ্ট রোগীদের বেশির ভাগের চোখে মুখে যে বিষণ্ণতার ছাপ থাকে সত্যশরণের মধ্যে তার অভাব দেখে একটু আশ্চর্য হলাম। ভাবলাম হয়তো বিষাদ পর্ব শেষ হয়ে আসছে। কথাবার্তার মধ্যেও অতিপরিচিত বিষণ্ণতার সুরের অভাব আছে—মনে হল। ছেলেটি সোজাসুজি বলল: আমার অফিস যেতে ভাল লাগে না, কাজ করতে ভাল লাগে না। এক জায়গায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। ক্যাশ লেজার পোষ্টিং—খুব একঘেয়ে লাগে। বলবেন কাজ করাতো দরকার। না হলে বাঁচব কি করে? ঠিক সেইজন্য বারবার ডাক্তারের কাছে যাই। কর্তব্য হিসেবে যাই, নিজের ইচ্ছেয় যাই না।

বেঞ্চে শুয়ে পড়ে মাথাটা যন্ত্রবিদের জিম্মায় ছেড়ে দিই। মগজের বিদ্যুৎ চলাচল ব্যবস্থার ঘাটতি কিম্বা বিশৃঙ্খলা ঘটেছে। কোষগুলি অসাড় হয়ে পড়েছে। তাঁরা বাইরে থেকে এনার্জি চালান দেন, ধাক্কা দিয়ে কোষগুলিকে চালু করে আমাকে অফিসে পাঠান। দৈনন্দিন রুটিনে বাঁধা পড়ে যাই। আবার সেই ক্যাশ-লেজার-পোষ্টিং-রিপোর্ট। আবার সেই মাস কাবারে মাইনে নিয়ে বাড়ী ফেরা। বছরে বছরে এমনি ধাক্কা মেরে মগজটাকে চালু রাখতেই হবে। নইলে জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মাতা উপোষী থাকবেন। তাঁদের প্রতি আমার কর্তব্য, আমার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি না!

এই ধরণের কথা 'ডিপ্রেশনের' রোগীদের মনে থাকলেও তাঁদের প্রকাশ করতে কম শোনা যায়। তাছাড়া ছেলেটির কথার মধ্যে যেন শ্লেষের ছোঁয়া ছিল। কথা বলার ভঙ্গীও 'ডিপ্রেশনের' রোগীর মত নয়। তারা সাধারণত 'হাঁ-না'—এই ধরনের এক অক্ষরের শব্দ দিয়েই কথা সারতে চায়।

—তুমি তো তোমার কাজ নিজে পছন্দ করে বেছে নিয়েছ। তোমার বাবা জানতেন তুমি বিজ্ঞান পছন্দ কর তিনি তো তোমাকে সেই লাইনেই যেতে বলেছিলেন।

—আমরা অনেক সময় যেটা চাইনে সেইটেই পছন্দ করি, যে লাইনে যেতে অনিচ্ছুক সেই লাইনেই চলি। আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছে পছন্দ অপছন্দের দাম কতটুকু? মনে হয়—অনেক পথই খোলা; কিন্তু চলতে গেলে দেখা যায় একটি মাত্র পথ আছে। অন্য পথে কাঁটা। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু নেই।

—অন্য লাইনে গেলে তোমার হয়তো কাজ ভাল লাগত, কাজে মন বসত, এই রকম ধাক্কা দিয়ে, ঠেলেঠুলে তোমাকে চালু রাখতে হত না।

—এখন সে কথা ভেবে কোন লাভ আছে কি? আপনার যদি চালু রাখবার নতুন কোনো জাদু জানা থাকে দয়া করে আমাকে সেটা জানিয়ে দিন। আমি আমার বিষণ্ণতা দূর করতে চাই না, কোনো রকমে চালু থাকতে চাই।

—বিষণ্ণতা দূর করতে চাও না? জীবনে কোন কিছু তোমার ভাল লাগে না?

না। খুব নিরেট বুদ্ধির লোক ছাড়া আর কারুরই এই জীবনটাকে ভাল লাগে না। নিজের ইচ্ছেয় এ জীবন আমি পাইনি, জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য কিছুই আমার জানা নেই, জীবনে ভাল লাগার মত কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। শুধু আমার নয়, সবার জীবনই একরকম ছাঁচে একই ছকে বাঁধা। আমি জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে একথা বলছি না। যুদ্ধ আমি কোনদিন করিনি, করবও না। যারা জয়ী হয়েছে তারাও খুব সুখী হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঁচাটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তাই বেঁচে আছে। তারা হয়তো,

হাসে, তারা গান গায়, কিন্তু তাদেরও জীবনটাকে ভাল লাগে বলে আমার মনে হয় না। আমি বাহবা চাই না, প্রশংসা চাই না, আনন্দ চাই না, শুধু কর্তব্য করতে চাই। আমাকে চালু করার মত কোন মন্ত্র জানা থাকে তো বলুন। আমি বিদ্যুৎ-যন্ত্রের ধাক্কা খেতে খেতে অনেক বছর চললাম আর ও ভাবে চলতে চাই না। দেখি আমার অন্যভাবে চালু থাকার ইচ্ছে সফল হয় কিনা।...মানুষের মনে যদি কোনদিন সুবুদ্ধির উদয় হয় সেদিন সে এই অর্থহীন চলার রেস নিজেরাই সমবেত চেষ্টায় থামিয়ে দেবে। সেই সংকল্প যেদিন মানুষ গ্রহণ করবে, সেদিন সে বুঝতে পারবে জীবনের সব থেকে বরণীয় ও কাম্য দেবতা হচ্ছেন বিষণ্ণতার দেবতা। তিনি সুন্দর, তিনি মধুর।

—তোমার এ-সব কথা মরবিড জীবন-বিদ্বেষী, এ্যান্টি-লাইফ; তুমি সুস্থ হলে, আর এ-সব চিন্তা তোমার মনে আসবে না।

—তাই তো আপনারা যে সুস্থতার কথা বলেন সে সুস্থতা আমি চাই না। আমি শুধু চালু থাকতে চাই, কর্তব্য করতে চাই।

পরের দিন মণিবাবুর সাগ্রহ প্রশ্নের জবাবে বললাম: আপনার পুত্রের প্রায় নাটকীয় সংলাপ শুনে বুঝলাম আপনারা ওষুধপত্র ওর হেফাজতে রেখেছেন। কোনো অতি-উত্তেজক ওষুধ খেয়ে আমাকে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়েছে। ওষুধ ওর মার কাছে রাখবেন, সময়মত যেন ওকে দেওয়া হয়। আর বুঝলাম আপনার ছেলে আধুনিক নাটক-নোভেল পড়েছে অনেক, বোধহয় কিছু দর্শনের মনস্তত্ত্বের কেতাবও পড়বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হয় হজম করতে পারেনি, কিম্বা ওর আজন্ম সংস্কারের বর্ম ভেদ করে কেতাবের বুলিগুলি ওর মন স্পর্শ করতে পারেনি। আপনার অসুখের সঙ্গে ওর অসুখের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। 'ডিপ্রেশনই' বলব, তবে মাত্রা আপনার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ প্রায় একই। আপনি সরল গ্রামীণ ধ্যানধারণা নিয়ে, আদর্শ-অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরাজিত হয়ে আঘাত পেয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। আপনার পুত্র আপনার সংগ্রাম ও পরাজয়ের সাক্ষী। আবার আপনার পরাজয় তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। আপনার মত লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত না হয়ে আগে থেকে পরাজয় স্বীকার করে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। আপনি গীতা পড়েন, পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলাফল মানেন, প্রাক্তন; দৈব ঈশ্বর ইত্যাদিতে বিশ্বাস আপনার অহংকার অনেকখানি স্তিমিত করে রেখেছে। সত্যশরণের বেলায় সেটা ঘটেনি। সে শৈশব থেকে নাগরিক। নাগরিক-দর্শন, নাগরিক মূল্যবোধ, নাগরিক জীবনের সবকিছু আপনার চেয়ে তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে অনেক বেশি। সে দৈবশক্তি, ঈশ্বরের করুণা, গতজন্মের কর্মফল বা ভাগ্যের দোহাই পেড়ে নিজের অসাফল্যের ব্যথাকে দূর করতে পারেনি। এই যুগের নাগরিক 'অহং'

বোধ তার মধ্যে তীব্র। কিন্তু এই সভ্যতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সে অক্ষম। কাজেই তার দায়িত্ব, কর্তব্য, সাফল্য অসাফল্য—সবকিছুকে নিজস্ব বলে মনে করেছে, নিজেকে হীন, অক্ষম, অপদার্থ মনে হচ্ছে, আর তার ফলে বাস্তব-জীবনের সবকিছু এড়িয়ে মাঝে মাঝে পালাতে চাইছে। তখনই তার মধ্যে ডিপ্রেশনের উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। সে যদি অনেকের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ এক করে দেখতে অভ্যস্ত হত, অথবা সমষ্টি ও ব্যষ্টির সম্পর্ক ঠিক মত অনুধাবন করতে পারত, তাহলে বোধহয় এই 'পিরিয়ডিক ডিপ্রেশনে' ভুগত না। এ অসুখ আজকের নাগরিক জীবনের এক প্রধান অভিশাপ। এখানে প্রত্যেকে আমরা একা, একান্ত একা।

—সারবে না? ও কি কোন দিন আনন্দ খুঁজে পাবে না; সুস্থ হবে না?

—পুরো আশা এখুনি আপনাকে দিতে না পারলেও, একেবারে হতাশ হবার কোন কারণ দেখছি না। তবে ওর স্ত্রীর চিকিৎসা দরকার। ওকে কিছুটা অন্তত বদলাতে না পারলে, সত্যশরণের জীবনের প্রতি আকর্ষণ ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে।